তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ১১
রকিব হাসান
কিশোর থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ১১

তিন গোয়েন্দা

৪৩, ৪৪, ৪৫

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

আটত্রিশ টাকা

ISBN 984 - 16 - 1244 - 5

প্রকাশক:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও.বক্স নং ৮৫০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম:
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-11
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan
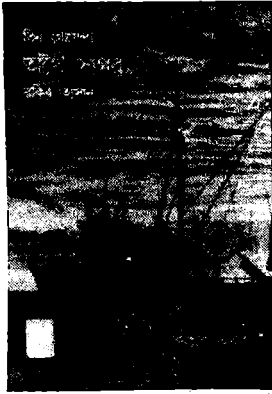
অথৈ সাগর-২

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

কাপড় খুলল কুমালো। লম্বা, শক্ত, বাদামী শরীর, যেন নারকেলের কাণ্ড। দেয়ালের গা থেকে উপসাগরের ওপর বেরিয়ে থাকা একটা পাথরে গিয়ে দাঁড়াল। পরনে সাঁতারের পোশাক বলতে কিছু নেই, হাতে শুধু দস্তানা। ধারাল প্রবাল থেকে তার আঙুল বাঁচাবে ওগুলো। খসখসে খোসাওয়ালা ঝিনুক খামচে ধরে তুলতে সুবিধে হবে।

ডুব দেয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগল সে। ডুবুরিরা এই পদ্ধতিটাকে বলে 'টেকিং দ্য উইণ্ড' বা বাতাস নেয়া। দম নিতে আরম্ভ করল সে, একটা থেকে আরেকটা আরও ভারি, আরও লম্বা। ঠেলে, জোর করে বাতাস ঢোকাচ্ছে ফুসফুসে। সেই বাতাস আটকে রাখতে বাধ্য করল ফুসফুসকে।

তারপর আস্তে করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পানিতে। ঝাঁপ দিল না বলে আলগোছে শরীরটাকে ছেড়ে দিল বলা ভাল। মাথা নিচু করে ডাইভ দেয়নি। সোজা হয়ে পড়েছে। পা নিচের দিকে দিয়ে নেমে যাচ্ছে খাড়া।

এভাবে নেমে গেল দশ ফুট। তারপর ডিগবাজি খেয়ে ঘুরিয়ে ফেলল শরীরটা, এবার মাথা নিচে পা ওপরে। একই সঙ্গে হাত পা নাড়ছে, কাছিমের মত।

পানির নিচে সাঁতারের অনেক দৃশ্য দেখেছে মুসা, সে নিজেও ভাল সাঁতারু। কিন্তু এরকম দৃশ্য কখনও দেখেনি। ডুবুরির পোশাক ছাড়া তিরিশ ফুট নিচে নামতে পারলেই ধন্য হয়ে যায় ইউরোপিয়ান কিংবা আমেরিকান সাঁতারুরা, চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায়। ওই গভীরতায়ই পানির প্রচণ্ড চাপ পড়ে শরীরের ওপর। নিচের পানি ওপরের দিকে ঠেলতে থাকে, পারলে গ্যাসভর্তি বোতলের মুখের কর্কের মত ফটাস করে ছুঁড়ে মারতে চায়।

কিন্তু কুমালো পরোয়াই করল না চাপের। নেমে যাচ্ছে…চল্লিশ ফুট…পঞ্চাশ …ষাট।

'আমার বিশ্বাস, এর ডবল নিচে নামতে পারবে ও,' কিশোর বলল। 'সাঁতার জানে বটে পলিনেশিয়ানরা।'

'হ্যাঁ,' যোগ করল রবিন। 'বয়েস দু'বছর হওয়ার আগেই সাঁতার শিখে ফেলে। হাঁটা শেখার আগে সাঁতার শেখে অনেক পলিনেশিয়ান শিশু। ডাঙা আর

পানি ওদের কাছে সমান। উভচর। সীল, কাছিম, ব্যাঙ, বীবরের মত।'

আবছা দেখতে পাচ্ছে তিন গোয়েন্দা, থেমেছে কুমালো। প্রবাল আঁকড়ে ধরে যেন ঝুলে রয়েছে, পা ওপরের দিকে। হাতের জোরে টেনে শরীরটাকে নামাল খানিকটা, ছেড়ে দিল, তারপর ধরল আরেক জায়গার প্রবাল। এরকম করল কয়েক-বার। মনে হচ্ছে, হাতের ওপর ভর দিয়ে সাগরের তলায় হেঁটে বেড়াচ্ছে সে।

তারপর কালো কিছু একটা আঁকড়ে ধরে মাথা ঘোরাল, তীব্র গতিতে উঠতে শুরু করল ওপরে। ভুস করে ভেসে উঠল তার মাথা, শরীর, কোমর পর্যন্ত, আবার ডুবল, ভাসল, ডুবল, ভাসল, পরিষ্কার করে নিল মাথার ভেতরটা। হাত বাড়িয়ে ধরল পাথরের কিনার, যেটা থেকে লাফ দিয়েছিল।

হিসহিস করে তার ফুসফুস থেকে বেরোচ্ছে চেপে রাখা বাতাস। ব্যবহৃত বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার পর বুক ভরে টেনে নিল বিশুদ্ধ বাতাস। চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ, ছেলেদের কথা যেন কানে ঢুকছে না।

ধীরে ধীরে ঢিল হয়ে এল শরীর। স্বভাবিক হল চেহারা। ওপরের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। তার বাড়ানো হাতটা চেপে ধরে তাকে টেনে ওপরে তুলল ছেলেরা।

হাতের কালো বস্তুটা পাথরে রাখল কুমালো।

আনন্দে চিৎকার করে উঠল মুসা। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল কিশোর, সঠিক দ্বীপটা খুঁজে পাওয়ায়। উপসাগরটা খুঁজে পেয়েছে ওরা, পেয়েছে প্রফেসর ইস্টউডের মুক্তার খামার। নিশ্চিত হওয়ার কারণ আছে। এসব অঞ্চলের ঝিনুক সাধারণত এতবড় হয় না, বাইরে থেকে বীজ আনার ফলেই হয়েছে।

'এরকম আর আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল কুমালো। 'বিছিয়ে আছে তলায়। সে-জন্যেই ওপর থেকে কালো লাগে। একটার গায়ে আরেকটা লেগে রয়েছে। শ'য়ে শ'য়ে।'

উত্তেজনায় প্রায় নাচতে শুরু করল মুসা। 'তারমানে শত শত মুক্তা!'

'না,' শান্তকণ্ঠে বলল কুমালো। 'সব ঝিনুকে মুক্তা থাকে না। একটা মুক্তার জন্যেই হয়ত একশো ঝিনুক খুলতে হবে।'

'হ্যাঁ, সে-রকমই হবার কথা,' একমত হল রবিন। 'তবে এখানে একটু অন্য রকম হতে পারে। বিশেষ ব্যবস্থায় ঝিনুকের চাষ করেছেন প্রফেসর।'

'দেখা যাক তাহলে এটাতে কিছু আছে কিনা,' বলতে বলতে কোমর থেকে ছুরি খুলল মুসা। ঝিনুকটা নিয়ে চাড় মেরে খোলা দুটো খোলার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করল, ঘামতে শুরু করল সে, কিন্তু ঝিনুক আর খুলতে পারল না।

'এভাবে পারবে না, কায়দা আছে,' কুমালো হাত বাড়াল। 'দেখি, দাও আমার কাছে।' চাড় দিয়ে ডালা খোলার বদলে ছুরির ফলাটা সে ঢুকিয়ে দিল দুই ডালার মাঝের ফাঁক দিয়ে, যতখানি যায়, কেটে ফেলল খোলাকে চাপ দিয়ে বন্ধ করে রাখে যে মাংসপেশি, সেটা। পেশি কেটে যেতেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ডানা দুটো।

মুসার হাতে ঝিনুকটা দিল কুমালো। 'নাও, এবার খুঁজে দেখ। থাকলে কিনারের মাংসের ভেতরেই থাকবে।'

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে, কাঁপা হাতে মুক্তা খুঁজল মুসা। পেল না। হতাশ হল খুব। কিন্তু হাল ছাড়ল না। আরও ভেতরেও থাকতে পারে, কে জানে। অনেক খুঁজল সে। ঝিনুকের আঠাল পিচ্ছিল মাংস আর দেহযন্ত্রের কোনা কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু মুক্তা মিলল না।

'ধুত্তোর, খামোকা ঘাঁটলাম!' বিরক্ত হয়ে প্রবালের একটা স্তূপের ওপাশে ঝিনুকটা ছুঁড়ে মারল মুসা। অন্য পাশে গিয়ে শক্ত কিছুতে লাগার বদলে লাগল নরম কিছুতে, বিচিত্র একটা শব্দ শোনা গেল। লাফ দিয়ে উঠে স্তূপের কাছে দৌড়ে এল মুসা। আবিষ্কার করল রেভারেণ্ড হেনরি রাইডার ভিশনকে। মুখ থেকে ঝিনুকের রস আর মাংস মুছছে লোকটা।

গর্জে উঠে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল ভিশন। মনে পড়ল, মিশনারির ওরকম রাগ করা উচিত না, মুখ খারাপ তো দূরের কথা। মুখের ভাব স্বাভাবিক রেখে হাসার চেষ্টা করল।

'আপনি এখানে কি করছেন?' মুসা জানতে চাইল।

প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না ভিশন। বেরিয়ে এল স্তূপের ওপাশ থেকে। কিশোর, রবিন আর কুমালোও এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে চেয়ে হাসল। কান থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঝিনুকের রস।

'তোমাদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম,' বলল সে। 'তাই আর থাকতে না পেরে দেখতে এসেছি কি করছ।'

'আপনি আমাদের ওপর স্পাইগিরি করছিলেন!' গরম হয়ে বলল মুসা।

শান্ত দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকাল ভিশন। 'মাই বয়, তোমার মনে রাখা উচিত, ভদ্র আচরণ ঈশ্বর পছন্দ করেন।'

'পাক-পবিত্র থাকাও ঈশ্বর পছন্দ করেন,' মুসা বলল। 'যান, মুখ ধুয়ে পাক-সাফ হোন।'

কিশোরের দিকে চেয়ে অভিযোগের সুরে বলল ভিশন, 'দেখ, তোমার বন্ধু দুর্ব্যবহার করছে। তোমার কিছু বলা উচিত।'

'নিশ্চয় বলব, তবে আপনাকে। ও ভুল বলেনি, আপনি সত্যি স্পাইগিরি করছিলেন আমাদের ওপর। আড়ালে থেকে চোখ রাখছিলেন।'

'ভুল করছ, মাই সান, ভুল করছ। আর তোমাদেরই বা দোষ দিই কিভাবে? রক্ত গরম, মাথা গরম করার বয়েস তো এটাই। যাকগে, আমি কিছু মনে করিনি তোমাদের কথায়। মিশনারি যখন হয়েছি, মাপ করতেই হবে মানুষকে,' বলতে বলতে কিশোরের কাঁধে হাত রাখল ভিশন।

ঝাড়া দিয়ে হাতটা কাঁধ থেকে ফেলে দিল কিশোর। 'হয়েছে, ওসব ভণিতা রাখুন। আপনি মিশনারি নন। বেঈমান, দু'মুখো সাপ।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি, রেগেছ,' ধৈর্য হারাল না মিশনারি। 'কিন্তু কেন এই ক্ষোভ জানতে পারি? সব খুলে বল আমাকে, বুঝে দেখি ভুল বোঝাবুঝিটা কোত্থেকে হল?'

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। ভুল করেনি তো? লোকটা কি সত্যিই মিশনারি? ধৈর্য তো সে-রকমই, শান্তও রয়েছে। রেগে না গিয়ে বরং বোঝানর চেষ্টা করছে।

ফাঁদে ফেলার জন্যে হঠাৎ বলল কিশোর, 'প্রফেসর ইস্টউডের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?'

সামান্যতম চমকাল না ভিশন। মনে করার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন। 'ইস্টউড··· ইস্টউড···' মাথা নাড়ল। 'না, মনে পড়ছে না। বোধহয় শুনিনি।'

'অ, তাহলে তো তাঁর ল্যাবরেটরিতে বাগও আপনি লুকাননি। তাঁর সঙ্গে আমাদের কি কি কথা হয়েছে শোনেননি। জানেন না আমাদের এই দ্বীপে আসার কারণ। কালো সেডানে করে আমাদের পিছু নেননি। স্যালভিজ ইয়ার্ডটাও চেনেন না, তাই না?'

'কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না,' গলার জোর কিছুটা হারিয়েছে ভিশন। ঝিনুকের একটুকরো মাংস খসে পড়ল লম্বা নাক থেকে।

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। জামবুকে আপনিই শুকতারায় তুলে দিয়েছিলেন পার্ল ল্যাগুনের অবস্থান জানার জন্যে। আপনার নির্দেশেই আমার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে সে। মিশনারির ছদ্মবেশে আমাদের ভুলিয়ে বোটে উঠেছেন জামবু যে কাজ করতে পারেনি, সেটা করার জন্যে। লগবুক থেকে রিডিং নকল করেছেন। পথে এত দ্বীপ পড়ল কোনটাতেই নামেননি, পছন্দ হয়নি আপনার। হবে কি ভাবে? নামার উদ্দেশ্যে তো আসেননি। মানুষের ভালবাসা না ছাই, আসলে এসেছেন মুক্তোর খোঁজে।'

ধপ করে একটা নারকেলের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল মিশনারি। হতাশ

ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়াল। সামনে ঝুঁকল চওড়া কাঁধ। রাগে কালো হয়ে গেছে মুখ। তবে সামলে নিল।

'বেশ,' বলল সে। 'বুঝতে পারছি, খেলা খতম। অতিরিক্ত চালাক তুমি। ফাঁকি দিয়ে আর লাভ হবে না, গিলবে না তুমি।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'হ্যাঁ,' আবার বলল ভিশন। 'তোমাকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। বড় বেশি চালাক। তোমার বিরুদ্ধে না গিয়ে পক্ষেই থাকতে চাই।'

'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন নয়? স্বীকার করছি, আমি মিশনারি নই। ছদ্মবেশ নিয়েছি, অভিনয় করেছি। তার মানে এই নয় যে তোমাদের ক্ষতি করতে চেয়েছি।'

'কি চেয়েছেন তাহলে? মুক্তো চুরি করতে?'

'চুরি বলছ কেন?' শব্দটা পছন্দ হল না ভিশনের। 'এই মুক্তোর খেত কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এই দ্বীপটার মালিকও প্রফেসর নয়। এমনকি আমেরিকান সরকারও এটার মালিকানা দাবি করতে পারবে না। এটা কারও জায়গা নয়, তারমানে সবার। আমি সেই সবার একজন। তোমরাও। এই ল্যাগুন, যা যা আছে এখানে, সব কিছুর মালিক সবাই। আমাদের সবারই অধিকার রয়েছে এতে।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, এত খাটাখাটনি করে, টাকা খরচ করে, প্রফেসর যে মুক্তোর খামার করেছেন...'

'প্রফেসরটা একটা গাধা। মানুষকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করে। নিজের ভাল বোঝার অধিকার রয়েছে মানুষের এটা যেন জানেই না। আমি তার মত বোকা নই। কাজেই নিজের ভালমন্দ অবশ্যই বুঝব। তোমাদের কাছে আর লুকিয়ে লাভ নেই, আমার নাম ভিশন নয়, ডেংগু পারভি। আমি মুক্তা ব্যবসায়ী। দক্ষিণ সাগরে খুচরা মুক্তা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে যাই নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিসে। বিক্রি করি। মুক্তা চিনি আমি। আমার সাহায্য নিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না তোমাদের। আমি যে দামে বিক্রি করতে পারব, তার চার ভাগের এক ভাগ দামেও তোমরা পারবে না। একটা রফায় আসতে পারি আমরা, ফিফটি-ফিফটি শেয়ার। কি, রাজি?'

'আপনার কথা শেষ হয়েছে? তাহলে যেতে পারেন।'

হাসি ফুটল ডেংগুর ঠোঁটে। কাঁধের হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করল। 'আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছ তোমরা,' ভারি গলায় বলল সে। 'আরও একটা কথা জেনে রাখতে পার, মুক্তো অনেক দামি জিনিস। এরচে অনেক কম দামি জিনিসের জন্যে মানুষ খুন করেছি আমি।'

'কিশোর,' মুসা বলে উঠল, 'ভয় দেখাচ্ছে ব্যাটা। রাজি হয়ো না। কচুটাও করতে পারবে না।'

জ্বলে উঠল ডেংগুর চোখ। 'এই নিগ্রোর বাচ্চা, চুপ! আরেকটা কথা বললে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। তোকে কথা বলতে কে বলেছে? চুপ করে বোস ওখানে। জলদি! এই, তোমরাও বস।'

'শুনো না, কিশোর, ওর কথা শুনো না,' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'দেখি হারামজাদা কি করে...'

গর্জে উঠল রিভলভার। দু'বার গুলি করল ডেংগু। একটা বুলেট মুসার প্রায় কান ছুঁয়ে গেল। আরেকটা গেল কিশোরের মাথার ওপর দিয়ে। পাথরে লেগে পিছলে গেল বুলেট, শিস কেটে চলে গেল পানির ওপর দিয়ে। প্রতিধ্বনি তুলল ল্যাগুনের অন্যপাশে প্রবালের দেয়ালে। চিৎকার করে নারকেলের কাণ্ড থেকে উড়ে গেল একটা নিঃসঙ্গ গাংচিল।

মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না লোকটা, বুঝতে পারল কিশোর। যেখানে বসতে বলা হয়েছে, বসে পড়ল। হাত ধরে টেনে বসাল মুসাকে। রবিনকে কিছু বলতে হল না, আপনাআপনি বসে পড়ল।

'নিরস্ত্র কয়েকজন মানুষকে রিভলভারের ভয় দেখাচ্ছেন,' রবিন বলল। 'লজ্জা করে না আপনার?'

'মানুষ কোথায়? কয়েকটা পুঁচকে বাচাল ছোঁড়া, হাহ্ হা। আর তোমাদের কাবু করতে অস্ত্র লাগে নাকি? খালি হাতেই টেনে টেনে ছিঁড়তে পারি ইচ্ছে করলে। কিন্তু কে কষ্ট করতে যায়? আর রিভলভার তোমাদের ভয়ে বের করিনি, করেছি ওই দানবটার জন্যে। এই দানব, কানাকার বাচ্চা কানাকা, এদিকে আয়। বোস।' রিভলভার নেড়ে কুমালোকে ডাকল ডেংগু।

'কুমালোকে দলে টানার কথা ভাবছেন নাকি?' কিশোর বলল। 'অযথা মুখ খরচ করবেন। লাভ হবে না।'

টেনে টেনে হাসল ডেংগু। 'এমন কোন কানাকা দেখিনি আমি, টাকা দিয়ে যাকে গোলাম বানানো যায় না। কুমালো, আমার চাকরি করবি তুই। ডুবুরি। অনেক টাকা দেব তোকে। জীবনে এত টাকা চোখেও দেখিসনি। যা, কাজ শুরু করে দে। পানিতে নাম।'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল কুমালোর সুন্দর মুখে। 'ভুল করছেন, মিস্টার ডেংগু,' মোলায়েম স্বরে বলল সে। 'নাম শুনেই বুঝতে পারছি অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউ গিনির কোন জঙ্গলে আপনার বাড়ি। টাকা দিয়ে স্বদেশী কোন জংলী ভাইকে গিয়ে কিনুন। রায়াটিয়ার মানুষ গোলাম হয় না।'

'যা বলছি কর!' খেঁকিয়ে উঠল ডেংগু। 'নইলে মগজ বের করে দেব!'

কিশোরের দিকে তাকাল কুমালো। আবার ফিরল ডেংগুর দিকে। 'বেশ। কত দেবেন?'

'এই তো পথে আসছিস। গোলাম আবার হবি না। তোদের চিনি না আমি? যা তুলবি তার পাঁচ ভাগের একভাগ।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কুমালো। 'আমার দস্তানা। আপনার পেছনের ওই পাথরের কাছে...'

পেছনে ফিরল ডেংগু।

বসা থেকে উঠে পড়ল মুসা।

ঝট করে আবার এদিকে ফিরল ডেংগু। কুমালোর দিকে রিভলভার নেড়ে বলল, 'যা, তুই নিয়ে আয়।'

পাশ দিয়ে চলে গেল কুমালো। সামান্য পাশে ঘুরে একসঙ্গে তিন কিশোর আর তার ওপর নজর রাখল ডেংগু।

নড়ে উঠল কিশোর। মুহূর্তের জন্যে শুধু নজর ফেরাল ডেংগু, এটুকুই যথেষ্ট। বাঘের মত লাফিয়ে এসে তার ওপর পড়ল কুমালো। বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল গলা। আরেক হাতে কব্জি চেপে ধরে রিভলভারটা হাত থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল।

এগিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ডেংগুর গায়ে মোষের জোর। হাত থেকে রিভলভার ছাড়ল না। কিশোরকে নিশানা করল।

'সর, সরে যাও!' চিৎকার করে বলল কুমালো। কিছুতেই পিস্তলের নল ঘোরাতে পারছে না।

গর্জে উঠল রিভলভার। আগেরবার গুলি করেছিল সাবধান করার জন্যে। এবার করেছে মারার জন্যে। শেষ মুহূর্তে কুমালোর হ্যাঁচকা টানে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল গুলি।

সামনে চলে এল মুসা। ঘুসি মারল ডেংগুর মুখে।

ভীষণ শক্তিশালী থাবার ভেতর থেকে রিভলভারটা বের করার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে কুমালো। পারছে না। নলের মুখ আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে মুসার পেটের দিকে। এখন একটাই কাজ করার আছে কুমালোর, মুসাকে বাঁচাতে হলে। সামনে চলে আসা। নিজের শরীর দিয়ে মুসাকে আড়াল করা। ঠিক তা-ই করল সে। ডেংগুও ট্রিগারে চাপ দিল, সে-ও চলে এল নলের সামনে। গুলি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

হাঁটু গেড়ে বন্ধুর পাশে বসে পড়ল মুসা। মনে পড়ল বিকিনির সেই রাতের কথা। সৈকতে বসে কথা দিয়েছিল ওরা, একে অন্যের জন্যে জীবন দিয়ে দেবে। নাম বদল করেছিল। কুমালো বন্ধুত্বের মান রেখেছে।

ডেংগুর সোলার প্লেক্সাসে ঘুসি মারছিল কিশোর। কিছুই হয়নি দানবটার। বরং কিশোরই হাতে ব্যথা পেয়েছে। তার মনে হয়েছে, ঘুসি মেরেছে একতাল রবারের ওপর। ঘুসাঘুসি বাদ দিয়ে বসল কুমালোর পাশে।

এই সুযোগে ছুটে চলে গেল ডেংগু।

পিছু নিতে যাচ্ছিল মুসা, হাত ধরে তাকে থামাল কিশোর। 'পরে। ওর কথা পরে ভাবা যাবে। আগে কুমালোর ব্যবস্থা করা দরকার।'

'কি করব?' নাড়ি দেখছে রবিন। চলছে এখনও। কুমালোর ডান হাঁটুর ইঞ্চি দশেক ওপর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

চোখ বুজে পড়ে আছে কুমালো।

ক্ষতটা পরীক্ষা করল কিশোর। দুটো গর্ত। বুলেট ঢোকার একটা, অন্যটা বেরোনোর। যেটা দিয়ে ঢুকেছে, ওটার মুখের চারপাশে পুড়ে গেছে চামড়া। খুব কাছে থেকে গুলি করলে হয় এরকম, বারুদের আগুনে পুড়ে যায়।

বুলেটটা বোধহয় হাড়ে লাগেনি, মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ভাগ্য ভাল, শিরা ছেঁড়েনি। রক্ত বেরোচ্ছে, তবে কম।

শার্টের কাপড় ছিঁড়ে ল্যাগুন থেকে ভিজিয়ে আনল রবিন। মুছে দিতে লাগল ক্ষত।

'পেনিসিলিন দরকার,' কিশোর বলল। 'কিংবা সালফা পাউডার।'

'দুটোই আছে বোটে,' বলল রবিন। 'নিয়ে আসব গিয়ে?'

'না। ওকেই নিয়ে যেতে হবে বোটে। বাংকে শুইয়ে দিতে হবে। কিন্তু, নেয়াই হয়ে যাবে মুশকিল। মুসা, তুমি বরং গিয়ে বোটটা কাছে নিয়ে এস। দাঁড়াও দাঁড়াও, ইঞ্জিনের শব্দ...'

ঠিকই শুনেছে সে। চালু হয়েছে বোটের ইঞ্জিন।

'ডেংগুই বোধহয় নিয়ে আসছে,' রবিন বলল। 'অনুশোচনা হয়েছে তাহলে।'

প্রাচীরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বোটটা। ল্যাগুন পেরিয়ে এসে ঢুকল উপসাগরে। ইতিমধ্যে নিজের শার্ট দিয়ে পেঁচিয়ে কুমালোর জখমের ওপরে টর্নিকেট বেঁধে ফেলেছে কিশোর। তার জানা আছে পনেরো মিনিট পর পর ঢিল দিয়ে আবার বাঁধতে হবে।

ডেংগু বোটটা নিয়ে আসছে বলে তার ওপর থেকে রাগ অনেকখানি কমল কিশোরের। 'মুসা, ওকে দেখিয়ে দাও কোন জায়গায় বোট রাখবে।'

ইঞ্জিন থেমে গেছে। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। অবাক হল। তীর থেকে এখনও একশো ফুট দূরে রয়েছে বোটটা।

'এই-ই, আরেকটু সামনে আনতে হবে,' চেঁচিয়ে হাত নেড়ে বলল মুসা।

জবাবে খিকখিক হাসি শোনা গেল। হুইল ঘোরাল ডেংগু। বোটের নাক ঘুরে গেল আরেক দিকে।

'ভুল করছ, বাবা,' হেসে বলল ডেংগু। 'তীরে ভেড়ানর জন্যে আনিনি। যাবার আগে শুধু কয়েকটা কথা বলতে এলাম তোমাদের সঙ্গে।'

বোকা হয়ে গেল কিশোর।

হাঁ করে ডেংগুর দিকে তাকিয়ে আছে তিনজনে।

'যাবার আগে মানে?' কিশোর বলল। 'কি বলতে চাইছেন?' গলা কাঁপছে তার।

'বুঝলে না? একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, মানতে পারনি। কাজেই একাই যেতে হচ্ছে আমাকে। সোজা পোনাপেতে চলে যাব। একটা জাহাজ আর ডুবুরি ভাড়া করে নিয়ে ফিরে আসব।'

'পারবেন না। নেভিগেশনের কিচ্ছু জানেন না।'

'তাতে কি? পোনাপে অনেক বড় দ্বীপ। সোজা দক্ষিণে চলতে থাকব। এক সময় না এক সময় পেয়েই যাব দ্বীপটা।'

'কিন্তু কুমালোকে ডাক্তার দেখানো দরকার। এখানে থাকলে ও মরে যাবে। এভাবে একজন মানুষ মরবে, ভাবছেন না সে কথা?'

'কেন ভাবব? ও তো একটা কানাকা।'

'বলেন কি! এরকম একটা জায়গায়...,' হারিক্যানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দ্বীপটার ওপর চোখ বুলিয়ে আতঙ্কিত হল কিশোর। 'এখানে ফেলে যেতে পারেন না আমাদেরকে। আপনি ফেরা পর্যন্ত বাঁচব না। কোন খাবার নেই। একটা কাঁকড়াও দেখিনি এতক্ষণে। ছায়া নেই, কুঁড়ে যে বানাব তারও উপায় দেখি না। পানি নেই। পিপাসায়ই মরে যাব। আর এতগুলো খুনের দায়ে সারা জীবন জেল খাটতে হবে আপনাকে।'

'একবার খেটেছি,' ডেংগু বলল। 'আর ঢোকার ইচ্ছে নেই ওখানে। এ-জন্যেই গুলি করে মারলাম না তোমাদের। যদি কেউ তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করে—করবে বলে মনে হয় না—যদি করেই, বলব আমি না ফেরাতক দ্বীপে থাকবে ঠিক করেছিলে তোমরা। বাঁচতে পারনি, কোন কারণে মরে গেছ, তার আমি কি করব?'

থ্রটলের দিকে হাত বাড়াল ডেংগু।

'দাঁড়ান!' মরিয়া হয়ে বলল কিশোর। 'একটা কথা অন্তত রাখুন। ফার্স্ট এইড

কিট থেকে পেনিসিলিনের টিউব আর সালফার কৌটাটা দিয়ে যান। কাছে আসার দরকার নেই। ছুঁড়ে মারুন।'

হেসে উঠল ডেংগু। 'ওগুলো আমারও দরকার হতে পারে, খোকা। দূর যাত্রায় যাচ্ছি তো। কখন কি ঘটে যায়, বলা যায় না। তখন পাব কোথায়? চলি। গুড বাই।'

হালকা বাতাস ঠেলে বোটটাকে অনেকটা কাছে নিয়ে এসেছে। হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল মুসা। জোরে সাঁতরে চলল বোটের দিকে। দেখাদেখি কিশোরও গিয়ে পানিতে পড়ল। প্রথমবারের চেষ্টায় ইঞ্জিন স্টার্ট না নিলে হয়ত বোটটাকে ধরে ফেলতে পারবে ওরা। খালি হাতে পারবে না ডেংগুর সঙ্গে, পারেনি চারজনে মিলেও, তার ওপর ওর কাছে রয়েছে রিভলভার। কি করে কাবু করবে এত শক্তিশালী শত্রুকে, একবারও ভাবল না ওরা।

চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। ঘুরতে শুরু করল প্রপেলার। খুব ধীরে গতি নিতে লাগল ভারি বোটটা। একসময় আশা হল ছেলেদের, ধরে ফেলতে পারবে। কিন্তু পরক্ষণেই গতি বাড়ল, ওদের চেয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল ওটা।

আর চেষ্টা করে লাভ নেই, থেমে গেল কিশোর আর মুসা। তাকিয়ে রয়েছে বোটের দিকে।

ল্যাগুনের প্রবেশমুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওটা। দেয়ালের কাঁধের ওপাশে হারিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে ওদের দিকে ফিরে হাত নাড়ল ডেংগু।

আর কিছু দেখার নেই। শুধু বোটের রেখে যাওয়া ঢেউ ছাড়া। চিৎকার করে উঠল সেই গাংচিলটা। ওই একটা পাখি ছাড়া জীবন্ত আর কোন প্রাণী যেন রেখে যায়নি হারিক্যান।

'আর কি করব! চল,' বলে তীরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল কিশোর।

আস্তে আস্তে সাঁতরে তীরে ফিরে এল ওরা। ডাঙায় উঠে এসে ধপ করে প্রায় গড়িয়ে পড়ল কুমালোর পাশে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। যা ঘটে গেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও। রুক্ষ প্রবালের স্তূপের ওপর ঘুরে এল ওদের দৃষ্টি।

হঠাৎ হাসতে শুরু করল মুসা। হতাশার দুর্বল হাসি। 'রবিনসন ক্রুসো পড়ার পর কতবার ভেবেছি, ইস, ওরকম কোন দ্বীপে গিয়ে যদি থাকতে পারতাম, কি মজা হত! কিন্তু মরুভূমির চেয়ে খারাপ এরকম একটা জাগায় আটকা পড়ব, কল্পনাও করিনি কোনদিন!'

দুই

নড়েচড়ে গুঙিয়ে উঠল কুমালো। যন্ত্রণার ছাপ চেহারায়, ভাঁজ পড়ল কপালে। চোখ মেলল সে। একে একে দেখল কিশোর, রবিন আর মুসার মুখ। কি ঘটেছিল, মনে পড়ল সব।

'সরি, বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম,' উঠে বসার চেষ্টা করল কুমালো। পারল না। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। বিকৃত করে ফেলেছে চেহারা।

'চুপচাপ শুয়ে থাক,' কিশোর বলল।

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল কুমালো। 'কি কি ঘটেছে আমি ঘুমানোর সময়? দারুণ কিছু মিস করেছি?'

'না, তেমন কিছু না। শুধু ডেংগুকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়েছি আমরা।'

'বিদায়?'

'চলে গেছে, বোট নিয়ে। পোনাপে থেকে জাহাজ আর ডুবুরি নিয়ে আসবে।'

বড় বড় হয়ে গেল কুমালোর চোখ। 'বিশ্বাস করেছ ওর কথা? ফাঁকি দিয়েছে সে, ধাপ্পা দিয়েছে। ভয় দেখিয়ে তোমাদেরকে দিয়ে কাজ আদায় করতে চেয়েছে। দেখ, রাতের আগেই ফিরে আসবে আবার। আমাদেরকে এই অবস্থায় এখানে ফেলে যেতে পারে না সে।'

'আল্লাহ করুক, তাই যেন হয়,' আশা করল মুসা।

'কিন্তু যদি সত্যিই চলে গিয়ে থাকে, তাহলে পোনাপেতে পৌঁছতে অন্তত তিন দিন লেগে যাবে তার। জাহাজ আর ডুবুরি জোগাড় করতে কম করে হলেও এক হপ্তা। ভাল ডুবুরি মেলানো খুব কঠিন। দুই তিন হপ্তাও লাগতে পারে। তারপর আরও তিন-চার দিন লাগবে এখানে আসতে। তিন হপ্তায় এখানে আমাদের কি হবে বুঝতে পারছে না সে?'

'না পারার কোন কারণ নেই,' কিশোর বলল। 'তবে ও-ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই তার।'

'এক হপ্তাও যদি লাগে আসতে,' নিঃসঙ্গ পাথরগুলোর দিকে তাকাল কুমালো, কড়া রোদে যেন ঝলসাচ্ছে ওগুলো। 'গেছি আমরা। জানো কেন মানুষ নেই এটাতে?'

'না। কেন?'

'কারণ এখানে মানুষ বাস কতে পারবে না। কেউ কখনও চেষ্টা করেছে বলেও মনে হয় না। জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিস এখানে নেই। যা-ও

বা কিছু ছিল, সব ধ্বংস হয়ে গেছে হারিক্যানে। এমনকি এখন পাখি পর্যন্ত থাকতে পারবে না এখানে। ল্যাগুনে মাছ দেখিনি। মুসা যে নাম রেখেছে, মরা দ্বীপ, ঠিকই রেখেছে। এখানে থাকলে ক্ষুধায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।'

চোখ বুজে চুপচাপ যন্ত্রণা সহ্য করল কিছুক্ষণ কুমালো। তারপর আবার চেয়ে, হাসল। 'ওভাবে বলা উচিত হয়নি আমার। আসলে দুর্বল হয়ে পড়েছি তো, আবোলতাবোল···ভেব না, উপায় বের করেই ফেলব আমরা। বেঁচে যাব। কষ্ট করতে হবে আরকি, অনেক খাটতে হবে। এভাবে এখন শুয়ে থাকলে চলবে না আমার,' জোর করে উঠে বসল কুমালো।

শুয়ে থাক!' তীক্ষ্ণ হল কিশোরের কণ্ঠ। 'এই দেখ, কি কাণ্ড করেছ! আবার রক্ত বোরোতে শুরু করেছে। কোন ওষুধ নেই আমাদের কাছে।'

'কে বলল নেই?' দুর্বল কণ্ঠে বলল কুমালো। 'ওষুধের বাক্সের ওপরই তো শুয়ে আছি।' একটা নারকেলের কাণ্ডে মাথা রেখেছে সে।

'এটা দিয়ে কি হবে?'

'ছুরি দিয়ে বাকলটা চাঁছো। পাউডারের মত বেরোবে। ওগুলো জখমে লাগিয়ে দাও। অ্যাসট্রিনজেন্ট, রক্ত পড়া বন্ধ করবে।'

'পচন ধরাবে না তো আবার?'

'আরে না না, যে কড়া রোদ। স্টেরিলাইজ করে দিয়েছে। একেবারে জীবাণুমুক্ত।'

পলিনেশিয়ানদের ভেষজ জ্ঞানের কথা শুনেছে কিশোর। লতাপাতা, ঘাস, শেকড়, আর গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরি করতে নাকি ওরা ওস্তাদ। অনেক জটিল রোগের সার্থক চিকিৎসা করে ফেলে। কিন্তু শুকনো নারকেলের কাণ্ডও যে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়, ভাবতে পারেনি।

তর্ক করল না সে। ছুরি দিয়ে চাঁছতে আরম্ভ করল। পাউডার জমল। ওগুলো নিয়ে জখমে রেখে শার্ট ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

কুমালোর কপালে হাত দিয়ে দেখল রবিন। গরম। জ্বর উঠছে। অল্পক্ষণেই অস্থির হয়ে গেল কুমালো।

'ছায়া দরকার,' মুসাকে বলল কিশোর। 'ছায়ায় নিয়ে রাখতে হবে এখন ওকে।'

যতদূর চোখ যায়, পুরো রীফটায় চোখ বোলাল ওরা। ছায়া নেই কোথাও। ওদের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করছে যেন শুধু রুক্ষ পাথর।

এক জায়গায় কাছাকাছি হয়ে জন্মেছিল কিছু নারকেল গাছ, কাণ্ডগুলো দাঁড়িয়ে

রয়েছে এখন। সামান্য ছায়া আছে ওখানে। সেখানেই কুমালোকে শুইয়ে দিল ওরা। এমন কিছু ছায়া নয়, রোদের আঁচ ঠেকাতে পারছে না, তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। সূর্য সরার সাথে সাথে ছায়া সরছে, কুমালোকেও সরাতে হচ্ছে।

'এভাবে হবে না,' কিশোর বলল। 'ছাউনি-টাউনি একটা কিছু তৈরি করতেই হবে।'

তিক্ত হাসল মুসা। 'কোন ভরসা নেই।'

কিন্তু 'নেই' বলে বসে থাকল না। পুরো দ্বীপটায় খুঁজে দেখতে চলল ছাউনি বানানর মত কিছু পাওয়া যায় কিনা।

বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল কুমালো। শোনার জন্যে প্রায় তার মুখের কাছে কান নিয়ে যেতে হল কিশোর আর রবিনকে।

কুমালো বলছে, 'কিশোর, আমার কথায় দুশ্চিন্তা কোরো না। বাড়িয়েই বলেছি। কোন না কোনভাবে টিকে যাবই আমরা। বেশিদিন তো নয়। এক কি দু'হপ্তা, বড়জোর তিন। ডেংগু আসবে। আসতেই হবে তাকে। মুক্তার লোভে। সে না এলে অবশ্য আশা নেই আমাদের, কোন জাহাজ আসে না এদিকে। অসুবিধে নেই। ডেংগুই আসবে। আর আসতে কষ্ট হবে না তার, দ্বীপটার অবস্থান তো জানাই আছে।'

'হ্যাঁ, কুমালো,' কিশোর বলল। 'এখন ঘুমানর চেষ্টা কর তো একটু।'

ওদেরকে ভয় পাওয়াতে চাইল না কিশোর। সে কেবল একলা জানে, ডেংগু কখনও ফিরে আসবে না। আসতে পারবে না।

বোটে লগবুক আছে। সেটার রীডিং অনুসরণ করবে ডেংগু। তাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল কিশোর। কিন্তু নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই পড়েছে এখন। শুধু সে একা নয়, আরও তিনজনকে নিয়ে পড়েছে।

লগবুকের রীডিং অনুসরণ করে একশো মাইল দূরে চলে যাবে ডেংগু। কিছুতেই বুঝতে পারবে না পার্ল ল্যাগুন কোথায় আছে। হয়ত খুঁজবে। যথাসাধ্য চেষ্টা করবে দ্বীপটা খুঁজে বের করার। পাওয়ার সম্ভাবনা হাজারে এক, হয়ত বা লাখে। মাসের পর মাস, সারা বছর ধরে খুঁজলেও হয়ত বের করতে পারবে না। কয়েক মাইলের মধ্যে চলে এলেও চোখে পড়বে না, কারণ দ্বীপটা সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র দশ ফুট উঁচু, তা-ও যেখানটায় সব চেয়ে বেশি। গাছপালা নেই। পানি থেকে আলাদা করে দ্বীপটাকে চেনা খুব কঠিন। সঠিক রীডিং জানা থাকলেই শুধু খুঁজে বের করা সম্ভব।

আর যদিও বা অলৌকিক ভাবে বছরখানেক পরে ডেংগু খুঁজে পায় দ্বীপটা, ওদের লাভ কি তাতে? সে এসে দেখবে, চারটে ঝকঝকে কঙ্কাল পড়ে রয়েছে

প্রবাল পাথরের মাঝে, অবশ্যই যদি ঝড়ের সময় পানিতে ভাসিয়ে না নিয়ে যায় লাশগুলো।

ডেংগু হয়ত ওদেরকে মরার জন্যে রেখে যায়নি। খানিকটা শাস্তি দিতে চেয়েছে। এটা ভেবেই ফেলে গেছে, আবার তো আসছেই, ততদিন মরবে না ওরা। কিন্তু কিশোর যা করে রেখেছে, সময় মত কিছুতেই আসতে পারবে না ডেংগু।

রবিন আর মুসা জানলে কি বলবে? কুমালোও কি তাকেই দোষারোপ করবে তাদের মৃত্যুর জন্যে? মুখে হয়ত কেউই কিছু বলবে না, কিশোরের মানসিক যন্ত্রণা বাড়াতে চাইবে না, কিন্তু মনে মনে? না খেয়ে মরার জন্যে কি দোষ দেবে না তাকে? আচ্ছা, না খেয়ে, পিপাসায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে কতটা কষ্ট হবে? খুব বেশি?

আপাতত কাউকে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। শুনলে মনমরা হয়ে পড়বে মুসা আর রবিন, একেবারে নিরাশ হয়ে যাবে। কুমালোর সেবাযত্নের দিকে আর মন দেয়ার প্রয়োজন বোধ করবে না।

ভয়ঙ্কর ভাবনাগুলো জোর করে মন থেকে বিদেয় করল কিশোর। কুমালোর সেবায় মন দিল। রক্তপাত বন্ধ হয়েছে। কাজ করেছে টোটকা ওষুধ। সাবধানে টর্নিকেটটা খুলতে লাগল কিশোর। বেশিক্ষণ বেঁধে রাখা ঠিক না, গ্যাংগ্রিন হয়ে যেতে পারে। টর্নিকেটটা খোলার পরেও রক্ত বেরোল না। নারকেল-বাকলের পাউডারের ওপর শ্রদ্ধা জন্মাল কিশোরের। এত ভাল অ্যাসট্রিনজেন্ট এই জিনিস, কল্পনাই করতে পারবে না অনেকে।

ছেঁড়া শার্টটা নিয়ে গিয়ে পানিতে ভেজাল কিশোর। চিপে বাতাসে ছড়িয়ে নাড়ল, যাতে ঠাণ্ডা হয়। তারপর এনে রাখল কুমালোর কপালে। ভীষণ জ্বর। কি হচ্ছে না হচ্ছে জানতেই পারল না বেচারা।

রবিন সাহায্য করছে কিশোরকে।

মুসা বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। এসব দ্বীপে ছাউনির চালা বলতে একমাত্র নারকেল পাতা। একসময় অনেকই ছিল, এখন একটাও নেই। ঝড়ে ছিঁড়ে যেগুলো পড়েছিল, সেগুলোকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ঢেউ।

পাথরের খাঁজে খাঁজে আটকে রয়েছে কিছু ভাঙা কাণ্ড। কয়েকটা মাথা আছে। তাতে ডালও রয়েছে, তবে একটাও পাতা নেই। যেন ছুরি দিয়ে চেঁছে নিয়ে গেছে বাতাস। হারিক্যানের এই প্রচণ্ড ক্ষমতা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

নারকেল পাতা পাওয়া যাবে না, নিশ্চিত হয়ে গেল সে। তাহলে আর কি আছে? কি দিয়ে ছাউনি হবে? চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল। ভাবনার একাগ্রতার জন্যে চোখের পাতা বোজেনি, বুজেছে রোদের মধ্যে চোখ মেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে বলে। প্যানডানাস পাতা দিয়ে ছাউনি বানায় দ্বীপবাসীরা, ট্যারো পাতা দিয়েও

হয়। কলাপাতা পেলেও সাময়িক কাজ চালানো যায়। জাহাজডুবি হয়ে নির্জন দ্বীপে উঠে খুব আরামে থাকে নাবিকেরা, এরকম অনেক গল্প পড়েছে সে। তবে ওদের কেউই কোন মরা দ্বীপে ওঠে না। নানারকম রসাল ফলের গাছ থাকে, সুন্দর পাখি থাকে, হরিণ থাকে, মিষ্টি পানির ঝর্না থাকে ওসব দ্বীপে। বাঁচতে অসুবিধে হয় না মানুষের।

ওরকম একটা দ্বীপে আটকে গেলে কিছুই মনে করত না মুসা। হাত বাড়ালেই পেয়ে যেত পাকা কলা, ছিঁড়ে নিতে পারত রুটিফল, বুনো কমলা, আম, পেঁপে, পেয়ারা, আঙুর। ল্যাগুন থাকত মাছে বোঝাই। সৈকত থাকত সাদা বালির, জোয়ারের পানি তাতে এনে ফেলত মোটা মোটা চিংড়ি। আর এত বেশি পাখি থাকত, খালি হাতেই ধরে ফেলা যেত ওগুলো, কারণ মানুষকে ভয় পায় না ওরা, আগে মানুষ দেখেনি তো কখনও। দ্বীপের কিনারে পাহাড়ে থাকত অগণিত পাখির বাসা, তাতে ডিম। পাহাড়ি ঝর্নায় আশ মিটিয়ে গোসল করত, নারকেলের মিষ্টি পানি খেত, থাকত বাঁশের তৈরি সুন্দর কুঁড়েতে। রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মাথা দোলাত নারকেল গাছ, রহস্যময় সরসর শব্দ তুলত বাঁশের কঞ্চি, সবুজ বন থেকে ভেসে আসত নিশাচর পাখির ঘুমপাড়ানি ডাক···

চোখ মেলতে বাধ্য হল মুসা। ঘাড়ের চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে রোদে। সাদা পাথরে রোদ প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে লাগতে গুঙিয়ে উঠল সে। তাকানই যায় না।

পাথরের দিক থেকে চোখ সরাতেই চোখে পড়ল ওটা। মস্ত দুটো পাথরের খাঁজে কি যেন একটা পড়ে আছে, পানির কিনারে। ধড়াস করে উঠল তার বুক। নৌকা না তো! দেখে তো মনে হয় নৌকাই উল্টে পড়ে আছে। হয়ত ঝড়ে ভেসে এসে ঠেকেছে ওখানে!

উত্তেজনায় বুকের খাঁচায় দাপাদাপি শুরু করে দিল হৃৎপিণ্ডটা। আশার আলো জ্বলল মনে। নৌকা হলে এই মৃত্যুদ্বীপ থেকে বেরোতে পারবে। প্রবালের চোখা, ধারাল বাধা অমান্য করে দৌড় দিল সে।

নাহ্, নৌকা নয়! বিশাল এক মাছ। পেট আকাশের দিকে, মরে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। পুরো তিরিশ ফুট লম্বা।

চামড়ার রঙ বাদামী, তাতে সাদা ফুটকি। কুৎসিত মুখ, ব্যাঙের মুখের মত অনেকটা। মুখের তুলনায় ছোট দুটো চোখ।

তিরিশ ফুট শরীরের তুলনায়ও মুখের হাঁ বিশাল। চার ফুট চওড়া। দুই কশ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে এখনও, যেন্ শ্যাওলা লেগে আছে।

এত বড় আর কুৎসিত মাছ দেখলে প্রথমেই মনে হবে ওটা মানুষখেকো।

ভয়ঙ্কর হিংস্রজীব। কিন্তু মুসা জানে, এই মাছ একেবারেই নিরীহ, যদিও হিংস্রতম প্রজাতিরই বংশধর এটা। মাছের মধ্যে সব চেয়ে বড় মাছ, নাম হোয়েল শার্ক বা তিমি-হাঙর। এখানে যেটা পড়ে আছে সেটা ছোট, এর দ্বিগুণ বড়ও হয় এ মাছ। হাঙর গোষ্ঠির প্রাণী, অথচ ছোট জাতভাইদের মত রক্তলোলুপ নয়। খুব ছোট ছোট জলজ জীব খেয়ে বেঁচে থাকে। ওসব জীবের কোন কোনটা এত ছোট, খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগে।

নিরাশ হয়ে ফিরে এল মুসা। বন্ধুদের জানাল, ঘর বানানর মত কিছুই পাওয়া যায়নি। মাছটার কথাও বলল।

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' হাত তুলল রবিন। 'বইয়ে পড়েছি, সাইবেরিয়ার আমুর নদীর ধারেও মানুষ বাস করে। এমন কোন গাছপালা নেই ওখানে, যা দিয়ে ঘর বানানো যায়। তাই মাছের চামড়া দিয়ে ঘর বানায় লোকে।'

হেসে উঠল মুসা। 'ওসব সীল-টীলের চামড়া দিয়ে বানায় আরকি। হাঙরের চামড়া দিয়ে কে বানাতে যাবে?'

'দোষ কি?' বলল কিশোর। 'চল তো দেখি। আমার মনে হয় ব্যবস্থা একটা হয়ে গেল।'

দানব মাছটাকে দেখতে এল ওরা।

'আহা, কি সুন্দর মুখ,' মুখ বাঁকিয়ে কিশোর বলল। 'সারা প্রশান্ত মহাসাগরে এত সরল মুখ আর নেই।' মাছটার চামড়ায় হাত বোলাল সে। সিরিসের মত খসখসে। 'কাটা সহজ হবে না। তবে ছুরিটুরি ভালই আছে আমাদের। পেটের চামড়াটা তুলে নেব আমরা। মুসা, তুমি গলার কাছ থেকে শুরু কর। রবিন, তুমি লেজের কাছে, পাখনার ওপর থেকে। আমি পেটের দুই পাশ থেকে চিরছি।'

ভীষণ শক্ত চামড়া। এমন সব জায়গা আছে, ছুরিই বসতে চায় না। সেসব জায়গায় প্রবাল পাথর দিয়ে ছুরির বাঁটে বাড়ি মেরে ফলা ঢোকাতে হচ্ছে।

দরদর করে ঘামছে কিশোর। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'কেটে ছাড়াতে পারলে ভালই হবে। যা শক্ত, নারকেল পাতার চেয়ে অনেক বেশি টেকসই হবে, একেবারে ক্যানভাস। অ্যাসবেসটসের চেয়েও বেশি টেকসই হবে।'

'অত টেকার দরকার নেই আমাদের,' রবিন বলল। 'আরও অনেক কম টিকলেও চলবে। দু'তিন হপ্তার বেশি তো থাকছি না আমরা এই দ্বীপে।'

খচ করে কাঁটা বিঁধল যেন কিশোরের মনে। ওরা এখনও জানে না, কোনদিনই আর ফিরবে না ডেংগু। বলে দেবে? জানাতেই যখন হবে, দেরি করে লাভ কি? শুনে আগে থেকেই মনকে শক্ত করুক।

'নিশ্চয়!' হালকা গলায় বলল কিশোর। 'কিন্তু ধর, আর ফিরল না। তাহলে?'
থেমে গেল মুসার ছুরি। 'আমাদের তাহলে কি হবে ভেবেছ?'
'কি আর হবে,' বলল রবিন। 'মরব।'
'না, এত সহজে মরছি না,' কিশোর বলল। 'বেঁচে যাবই। কোন না কোন উপায় নিশ্চয় হয়ে যাবে। চুপ করে না থেকে এখন যা করছি করি। এই, মুসা, ওই কোনাটা ভালমত ছাড়াও। বাপরে বাপ, কি মোটা চামড়া!'
হাসল মুসা। 'গণ্ডারেরও এত মোটা কিনা সন্দেহ।'
দুই ঘন্টা কঠোর পরিশ্রমের পর দম নেয়ার জন্যে থামল ওরা। চামড়া অর্ধেক ছাড়িয়েছে। এমনিতেই সাংঘাতিক দুর্গন্ধ ছিল, চামড়া ছাড়ানর পর অসহ্য হয়ে উঠেছে। মাথায় যেন গরম হাতুড়ি পিটছে সূর্য। রোদের তেজ এড়ানর জন্যে চোখের পাতা প্রায় বুজে রেখেছে ওরা। শার্টের হাতা দিয়ে মুখ মুছল মুসা। টর্নিকেট, ব্যাণ্ডেজ, আর কপালে পট্টি দিতেই শেষ হয়েছে কিশোরের শার্ট। মুসারটার ঝুল দিয়েই মুখ মুছল।
'এক গ্লাস পানি যদি পেতাম,' মুসা বলল।
'তাই তো!' চমকে উঠল কিশোর। 'একবারও মনে হয়নি ও-কথা! ছাউনির চেয়েও বেশি দরকার পানি, খাবারের চেয়েও। থাক, কাজকর্ম এখন বাদ। বাকিটা কালও সারতে পারব। এখন চল, কুমালো কেমন আছে, দেখে, পানির খোঁজ করি।'
ঘুমিয়ে আছে কুমালো। গায়ের ওপর থেকে সরে গেছে গাছের ছায়া। ধরাধরি করে তাকে সরাল কিশোর আর মুসা। পট্টি শুকিয়ে গেছে, ভিজিয়ে এনে আবার ওটা কপালে রাখল রবিন।
তারপর শুরু হল পানির খোঁজ। পানি পাওয়া যাবেই, জোর গলায় একথা একে অন্যকে শুনিয়ে রওনা হল ওরা। কিন্তু মনে মনে প্রত্যেকেই জানে, পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। রুক্ষ এই রোদেপোড়া প্রবালদ্বীপে কোথায় থাকবে মিষ্টি পানি?
'হারিক্যানের সময় প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে,' কিশোর বলল। 'পাথরের মাঝে বড় গর্তটর্ত থাকলে আটকে থাকার কথা। রোদে নিশ্চয় সব শুকিয়ে যায়নি এখনও।'
তীরের কাছে পাওয়া গেল একটা গর্ত, বেশ বড় গামলার মত। তাতে কিছু পানি আটকে রয়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আঁজলা ভরে তুলে মুখে দিল মুসা। থু থু করে ফেলে দিল পরক্ষণেই।
'দূর! লবণ!'
বৃষ্টির পানি নয়, ঝড়ের সময় সাগরের পানিই উঠেছিল এখানে। আরও কিছু গর্ত পাওয়া গেল, তাতে পানির দাগ আছে, পানি নেই। শুকিয়ে গেছে অনেক

আগেই।

নারকেল গাছের গোড়াগুলোয় খুঁজে দেখল কিশোর।

'নিশ্চয় ফল ছিল গাছে,' রবিন বলল।

'এক আধটা নারকেল পেলেও আপাতত চলত,' বলল মুসা।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'পানি তো হতই। খাবারও।'

নারকেলের মিষ্টি পানি আর শাঁসের কথা ভেবে জিভে জল এল তিনজনেরই।

অনেক খুঁজল ওরা। কিন্তু একটা নারকেলও মিলল না।

'মুশকিল হয়েছে কি,' কিশোর বলল। 'নারকেল পানিতে ভাসে। ঝড়ের সময় যা পড়েছিল সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ঢেউ।'

'তাহলে?' ভুরু নাচাল মুসা। 'এবার কি করব?'

'খুঁড়ব,' বলে সৈকতের দিকে রওনা হল কিশোর। 'ভাটার সময় ল্যাগুনের পানি নেমে গেলে নাকি অনেক সময় কিনারে মাটির তলায় মিষ্টি পানি পাওয়া যায়। আচ্ছা, এই জায়গাটা কেমন মনে হয় তোমাদের?' পা দিয়ে দেখাল সে, 'ঠিক এই পর্যন্ত ওঠে পানি।' পা আরেকটু নিচের দিকে সরাল, 'এখানটায়?'

'আমার কাছে পাগলামি মনে হচ্ছে,' বলল মুসা। 'নোনা পানির নিচে আবার মিষ্টি পানি থাকে কি করে?'

'কি করে থাকে, জানি না,' রবিন বলল। 'তবে আমিও পড়েছি। আমার মনে হয় বিচিত্র কোন প্রাকৃতিক কারণে বৃষ্টির পানি জমেটমে থাকে আরকি।'

'বেশ, খুঁড়ি তাহলে,' বলে চ্যাপ্টা একটা পাথর তুলে নিয়ে ওটাকে বেলচা বানিয়ে বালি খুঁড়তে শুরু করল মুসা।

তিন ফুট খোঁড়ার পর কিশোর বলল, 'এবার থাম। দেখা যাক কি ঘটে?'

চুঁইয়ে পানি উঠতে শুরু করল গর্তে। দেখতে দেখতে ভরে গেল তিন চার ইঞ্চি।

'মিষ্টি পানি?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'কি জানি,' বলল কিশোর। 'আশা করছি। অনেক অ্যাটলেই ঘটে এটা। জাহাজডুবি হয়ে নাবিকেরা দ্বীপে ওঠার পর এমনি করে পানি বের করেই খেয়ে বেঁচেছে, শুনেছি।'

'দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলেও?'

'তা বলতে পারব না।'

'আমি পড়েছি,' রবিন বলল। 'বৃষ্টি না হলেও পাওয়া যায়। সাগরের পানিই বালির স্তর ভেদ করে ওঠার সময় ফিলটার হয়ে যায়। লবণ অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তাতে। আর বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। পাথর আর বালির ফাঁকফোকর দিয়ে

চলে যায় তলায়, জমা হয়ে থাকে।...হ্যাঁ, যথেষ্ট উঠেছে। এবার খেয়ে দেখ। সাবধান, বেশি নেড় না। নোনা পানির চেয়ে মিষ্টি পানি হালকা, থাকলে ওপরেই থাকবে।'

খানিকটা পানি তুলে মুখে দিল মুসা। তারপর আরও দুই আঁজলা তুলে গিলে ফেলল। মাথা দুলিয়ে বলল, 'লবণ আছে, তবে ততটা নয়। সাগরের পানির চেয়ে কম।'

খানিকটা তুলে কিশোরও মুখে দিল। হতাশ মনে হল তাকে। মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বলল, 'খেয়ো না আর, ভাল না। পেটে সহ্য হবে না।'

কিশোরের না বললেও চলত। কপাল টিপে ধরল মুসা। ওয়াক ওয়াক শুরু করল। মোচড় দিচ্ছে পেট। হড়হড় করে বমি করে ফেলল। সকালে নাস্তা যা খেয়েছিল বেরিয়ে গেল সব।

রাগ করে কিশোর আর রবিনের দিকে তাকাল। 'ধেত্তের তোমাদের মিষ্টি পানি! বইয়ে কি সত্যি কথা লেখে নাকি? ব্যাটারা জানে না শোনে না...মরা দ্বীপে কখনও আটকা পড়েছিল ওরা যে জানবে?'

'তা হয়ত পড়েনি,' স্বীকার করল কিশোর। 'কিন্তু ইউ এস নেভির সারভাইভাল বুক-এও একথাই লিখেছে, আমরা যা করলাম ওরকম করেই পানি বের করতে বলেছে।'

'তাহলে বেরোল না কেন?'

'হয়ত এখানকার বালি মোটা বেশি, লবণ ঠিকমত ফিল্টার করতে পারে না। কিংবা হয়ত খুব বেশি বৃষ্টি হয়নি এখানে। আর হলেও হয়ত ফাঁকফোকর দিয়ে অনেক নিচে নেমে গেছে।'

'অত সব হয়ত হয়ত শুনে তো লাভ নেই। সত্যি সত্যি হয় ওরকম কিছু কর।'

'মুসা,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, এই দ্বীপে তুমি শুধু একাই তৃষ্ণার্ত নও।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

থেমে থাকল না ওরা। চলল পানির ক্লান্তিকর খোঁজে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল প্রাচীরের সব চেয়ে সরু জায়গাটায়, এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যাবার সেতু তৈরি করেছে যেটা। দেয়ালের একপাশে সারাক্ষণ আছড়ে পড়ে সাদা ফেনা সৃষ্টি করছে সাগরের ঢেউ, আরেক পাশে নীল ল্যাগুনের সাদা সৈকত ঢালু হয়ে নেমে গেছে পানিতে। কাঁচের মত মসৃণ ল্যাগুনের পানি। এখানটায় গভীরতা বারো ফুটের বেশি নয়। নিচে যেন গজিয়ে উঠেছে এক পরীর শহর, তাতে গাঢ় লাল প্রাসাদ, স্তম্ভ, প্যাগোডা, মিনার, সবই রয়েছে, তৈরি করেছে খুদে প্রবাল-কীট।

অতি চমৎকার দৃশ্য, মন ভরে যেত যদি গরম, ক্লান্তি, চোখ জ্বলা, এবং খাবার আর পানির ভাবনা ভুলে থাকা যেত। কিন্তু তা থাকা সম্ভব নয়।

সেতুর ওপাশেই আবার চওড়া হতে শুরু করেছে দেয়াল। ঘন্টাখানেক ধরে অন্য দ্বীপটায় খোঁজাখুঁজি করল ওরা। পানি পাওয়া গেল না। পাথরের খাঁজে, গর্তে পানি জমে রয়েছে, সবই নোনা। নারকেলের গোড়া আছে, কাণ্ড আছে, কোনটারই মাথা নেই, ফলে পাতা বা ফলও নেই। কোন কোন গুঁড়ির মাঝে গর্ত হয়ে আছে, ওগুলোতেও জমে-থাকা পানির খোঁজ করল ওরা। পেল না। শুকিয়ে গেছে।

অবশেষে পাওয়া গেল একটা নারকেল! আটকে রয়েছে পাথরের খাঁজে। ঢেউও ভাসিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ছোবড়া ছাড়াল ওরা। মাথার ওপরের দিকে ফাটা। ফাঁকের ভেতরে ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে ওপরের অংশটা তুলে ফেলল কিশোর। ভেতরের জিনিস দেখে গুঙিয়ে উঠল তিনজনেই।

'খাইছে!' বিলাপ শুরু করবে যেন মুসা। 'এক্কেবারে পচা!'

ফাটা দিয়ে মালার ভেতরে নোনা পানি ঢুকে নারকেলের পানি আর শাঁসের সর্বনাশ করে দিয়েছে।

ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে শাঁস ফেলে মালা পরিষ্কার করতে করতে কিশোর বলল, 'যাক, একটা কাপ পাওয়া গেল।'

'লাভ কি?' বলল রবিন, 'কি রাখব এটাতে?'

'দেখা যাক। কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।'

খোঁজ চালিয়েই গেল ওরা। পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে সূর্য। খাবার লাগবে, জানান দিল ওদের পেট, পানির তাগাদা দিতে শুরু করল।

'এই যে পানি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

কি পেয়েছে দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে এল রবিন আর মুসা। পাথরের ফাঁকে মাটিতে শেকড় গেড়ে আছে চ্যাপ্টা এক ধরনের উদ্ভিদ।

'হুঁহ্, পানি!' হতাশ হল মুসা।

মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। নরম একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল। ঠাণ্ডা রসে ভরা পাতাটা। শুকনো মুখ আর খসখসে জিভে ভিজে পরশ বোলাল। হাসি ফুটল তার মুখে।

একটা পাতা ছিঁড়ে মুসাও মুখে পুরল। বলল, 'হুঁ, ভালই।' কিন্তু আর ছেঁড়ার জন্যে হাত বাড়াল না।

রবিনও ছিঁড়ল একটা। বেশি না।

তিনজনের মনেই এক ভাবনা। গাছটা তুলে নিয়ে যেতে হবে তাদের দ্বীপে।

ওদেরই যখন এত পিপাসা, আহত কুমালোর নিশ্চয় আরও অনেক বেশি।

ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছে কুমালো। চোখ মেলল। জ্বরে লাল টকটকে।

'সামান্য পানি নিয়ে এসেছি, কুমালো,' কিশোর বলল। 'তবে এই পানি গিলতে পারবে না, চিবাতে হবে। তোমরা একে কি বল, জানি না, বইয়ে এর নাম পড়েছি পিগউইড।'

'পার্সলেইনও বলে অনেকে,' রবিন বলল।

নাম যা-ই হোক খুব আগ্রহের সঙ্গে গাছটা নিল কুমালো। পাতাগুলো চিবিয়ে শেষ করল। তারপর একে একে শেষ করল কাণ্ড আর শেকড়ের রস।

'দারুণ,' বলল সে। 'নিশ্চয় আরও অনেক আছে। খেয়েছ তো?'

মাথা কাত করল মুসা।

'সরি,' কিশোর বলল। 'আর কোন খাবার-টাবার দিতে পারব না তোমাকে।'

কুমালো হাসল। 'পানিই দরকার ছিল আমার। পেয়েছি। এখন ঘুমাতে পারব,' বলেই চোখ মুদল সে।

আরও পিগউইডের সন্ধান করল কিশোর। পেল না। পাতার দু'এক ফোঁটা রস পিপাসা না কমিয়ে বরং বাড়িয়েই দিয়েছে। খুনী সূর্যটাকে দিগন্তের ওপাশে হারিয়ে যেতে দেখে আন্তরিক খুশি হল সে। স্বাগত জানাল রাতকে। ভেবে শঙ্কিত হল, ভয়ঙ্কর দিন আসবে কয়েক ঘন্টা পরেই, আরেকটা, তারপর আরেকটা...আসতেই থাকবে একের পর এক, যতক্ষণ না ক্ষুধায় পিপাসায় মারা যাচ্ছে ওরা...

এভাবে মরতে চায় না কিশোর। কিন্তু বাঁচতে হলে পানি চাই। এক নম্বর সমস্যা এখন পানি। কোথায় পাওয়া যাবে? ভাবতে বসল সে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে ঘন ঘন। হঠাৎ পাথরে হাত পড়তে চমকে উঠল। ভেজা ভেজা!

শিশির! শিশির পড়ছে। সন্ধ্যার ছায়া নামতেই হালকা বাষ্প জমেছে ল্যাগুনের ওপরে। যদি কোনভাবে ধরা যেত ওই শিশির...

শুনেছে, পলিনেশিয়ানরা শিশির ধরার কায়দা জানে। মনে করতে পারছে না কিভাবে। কুমালো হয়ত জানে, কিন্তু ও ঘুমাচ্ছে, এখন জাগানো উচিত হবে না।

ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোরের চোখে ঘুম এল না। শুয়ে গড়াগড়ি করল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে পড়ল। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

ল্যাগুনের সৈকতে চলে এল সে। বালিতে একটা ছোট গর্ত করল। তলায় রাখল নারকেলের মালাটা। গর্তের মুখ ঢেকে দিল কাপড় দিয়ে, শার্ট ছেঁড়া কাপড়, যেটা দিয়ে কুমালোর মাথায় পট্টি দিয়েছিল। ঠাণ্ডা এখন বাতাস, পট্টির আর দরকার নেই। নারকেলের মালার মুখে কাপড়টার যে গোল অংশটুকু পড়েছে, তার

ঠিক মাঝখানে একটা ফুটো করল। তারপর গর্তটা ঢেকে দিতে লাগল পাথর দিয়ে। ছোট ছোট পাথরের তিন ফুট উঁচু একটা পিরামিড তৈরি করে ফেলল গর্তের ওপরে।

উদ্দেশ্যঃ পাথরে ধরা পড়বে শিশির। ভিজবে। তারপর আরও শিশির পড়ে পাথরের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামবে নিচে, শার্টের কাপড়ে জমা হবে, সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়বে মালায়। সকাল নাগাদ একমালা পরিষ্কার পানি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ফিরে এসে দেখল সে, রবিন আর মুসা কুমালোর পাশে মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। কিশোরও শুয়ে পড়ল আবার, মাথার নিচে দিল প্রবালের বালিশ।

কিন্তু ঘুমাতে পারল না। জীবন বাঁচানোর জন্যে অতি প্রয়োজনীয় তিনটে শব্দ শুধু ঘুরছে মাথায়—পানি, খাবার, ছাউনি।

বাড়িতে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন জাপনের কথা ভাবল সে। নরম বিছানা, মাথার ওপরে ছাত। পানির ভাবনা নেই। বিছানা থেকে নেমে কয়েক পা গিয়ে ট্যাপের মুখ ঘোরালেই হল। খিদে পেলে শুধু ফ্রিজের ডালা খোলা, ব্যস···

বাড়িতে জীবন এত সহজ, যারা থাকে ধরে নেয় এত সহজেই কাটে জীবন, সব জায়গায়। কষ্ট যে করতে হয় অনেক জায়গায়, বোঝেই না যেন। তাই অচেনা সঙ্কটময় কোন জায়গায় গিয়ে পড়লে ভাবে, এই বুঝি মরলাম! ওখানেও যে বাঁচা সম্ভব, বিশ্বাসই করতে চায় না।

ওর গলা শুকিয়ে খসখসে সিরিশ কাগজ হয়ে গেছে। পেট যেন শূন্য একটা ড্রাম। তন্দ্রা নামল চোখে। স্বপ্নে দেখল বৃষ্টি। চমকে জেগে গেল সে। তাকাল আকাশের দিকে।

মেঘশূন্য আকাশ। বড়বড় একেকটা উজ্জ্বল তারা যেন খুদে খুদে সূর্য, কিশোরের মনে হল ওগুলোর তাপ এসে লাগছে তার গায়ে। ছায়াপথটাকে দেখে মনে হচ্ছে লম্বা পথের ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে কাঁচের গুঁড়ো।

এরকম রাত বিকিনিতেও কাটিয়েছে। রাতের বেলা ছোট জীবের হুটোপুটি শুনেছে ঝোপের ভেতরে। এখানে এই মৃত্যুদ্বীপে ওরকম কিচ্ছু নেই, একেবারে নীরব, শুধু দেয়ালে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের বিচিত্র গুমরানি ছাড়া। বাতাসে ভেসে আসছে মৃত্যুর গন্ধ, দ্বীপের ওপাশ থেকে, পচা হাঙরের।

আবার অস্থির ঘুম নামল কিশোরের চোখে।

তিন

কাক-ভোরের ফ্যাকাসে আলোয় ঘুম ভাঙল তাঁর। পিঠে আর শরীরের এখানে

ওখানে ব্যথা। চোখা প্রবালের খোঁচা যেখানে যেখানে লেগেছে সবখানে। বাতাস খুব ঠাণ্ডা, পরিস্কার। ঘুমানর আগে যতটা ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ছিল, ততটা নেই। খারাপ লক্ষণ। তারমানে দেহের যন্ত্রপাতিগুলো অবশ হয়ে আসছে।

তবে তাজা বাতাস নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করল তার মধ্যে। যেভাবেই হোক, যে-কোন উপায়েই হোক, এই মৃত্যুদ্বীপকে পরাজিত করবে ওরা, সেই সাথে পরাজিত করবে ডেংগু পারভিকে। মনে পড়ল একটা কবিতার দুটো চরণঃ

দি মরনিং'স ডিউ পার্লড,
অল'স রাইট উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড।

খুশি মনে উঠে সৈকতে চলল সে। দেখার জন্যে, তার শিশির-ধরা-ফাঁদে কতখানি শিশির আটকা পড়েছে।

পানি জমেছে মালার অর্ধেকের কম। আরও বেশি পড়বে আশা করেছিল সে। শিশির বোধহয় হালকা ছিল। যাকগে, যা পড়েছে তাই লাভ। অতি মূল্যবান তরলটুকু নিয়ে ক্যাম্পে ফিরল সে।

কুমালো নড়াচড়া করছে। চোখ মেলে তাকাচ্ছে ও, তবে কেমন যেন হতবুদ্ধি একটা ভাব। তার মাথাটা তুলে ধরে অর্ধেকটা পানি গলায় ঢেলে দিল কিশোর। বাকি অর্ধেক মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'তোমরা দু'জনে ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেল।'

হাই তুলতে তুলতে উঠে বসেছে রবিন।

মালাটা মুসার হাতে ধরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। চলে এল মরা হাঙরটার কাছে। চামড়া ছিলতে শুরু করল। আর খানিক পরেই উঠবে মারাত্মক রোদ, তার আগেই যদি একটা ছাউনির ব্যবস্থা করা যায়, বেঁচে যাবে।

মালার তলায় জমা পানিটুকুর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। মুখ বাড়িয়ে রবিনও দেখল। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু'জনের। ওই দুই চুমুক পানিই এখন ওদের কাছে লক্ষ টাকার চেয়ে দামি। মুসা ভাবছে কুমালোর কথা, রবিনও।

গোঙাচ্ছে কুমালো। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। রোদ ওঠার আগেই যদি এই অবস্থা হয়, উঠলে পরে কি হবে? পানি খেল না মুসা। রবিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল। মাথা নাড়ল রবিন। হাসল দু'জনেই। কুমালোর মাথাটা উঁচু করে বাকি পানিটুকু তার মুখে ঢেলে দিল মুসা।

কিশোরকে সাহায্য করতে চলল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

চামড়া পুরোপুরি ছাড়ানর আগেই উঠল লাল সূর্য, দিগন্তে উঁকি দিয়েই যেন আগুন ছড়াতে শুরু করল।

চামড়া ছাড়ানো শেষ হল অবশেষে। বিশ ফুট লম্বা আট ফুট চওড়া বেশ

চমৎকার একটা টুকরো। ভেতরের দিকে লেগে থাকা মাংসের টুকরোগুলো সযত্নে সাফ করে ফেলল ওরা। চামড়াটা টান টান করে মাটিতে বিছিয়ে দেখল কাজ কেমন হয়েছে।

'ভাল বুদ্ধি বের করেছিলে, রবিন,' কিশোর বলল।

'ঘর তো বানায় বললে মাছের চামড়া দিয়ে,' মুসা বলল রবিনকে। 'কি করে বানায়? সাইবেরিয়ায় বললে না?'

'হ্যাঁ। মাছ-তাতার বলে ওদেরকে। মাছ খায়, মাছের চামড়া দিয়ে জুতা আর পোশাক বানায়, ঘর বানায়। মাটিতে খুঁটি গেড়ে তার ওপর চামড়া ছড়িয়ে দেয়। যদি দেখতে যাও, বহুদূর থেকেই ওদের গ্রামের গন্ধ নাকে আসবে তোমার।'

'জানি, কি বলতে চাইছ,' নাক কুঁচকাল মুসা।

'হাঙরের চামড়ার অবশ্য এতটা গন্ধ বেরোবে না,' কিশোর বলল। 'রোদে শুকিয়ে যাবার পর। তবে মাছটার গন্ধ আর সইতে পারছি না। এটাকে গড়িয়ে নামিয়ে দিতে পারলে হয়। জোয়ারে ভেসে চলে যাবে।'

প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর ভারি লাশটাকে পানির কিনারে নিয়ে যেতে পারল ওরা।

'মাংসের পাহাড়,' পচা দেহটার দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

'অথচ এমনি কপাল আমাদের, একটা টুকরো মুখে দিতে পারব না।'

'বেশি পচে গেছে,' কিশোর বলল। 'খেলে পেটে অসুখ করে মরবে।'

সুতরাং, সাগরের নাস্তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বিষাক্ত খাবারের দিকে পিঠ ফেরাল ওরা। হাঙরের চামড়াটা টানতে টানতে নিয়ে ফিরে এল ক্যাম্পে।

ঘর বানানয় মনোযোগ দিল ওরা। কি করে বানানো যায়? পেরেক নেই, বল্টু নেই, স্ক্রু নেই, নেই কড়িকাঠ, তক্তা, খুঁটি। ঘর বানাতে যা যা জিনিস প্রয়োজন, তার কোনটাই নেই।

'শুধু আছে একটা চামড়া,' মুসা বলল। 'চালা বানানো যাবে। দেয়াল হবে কি দিয়ে? পাথর জড়ো করব?'

'প্রথমে দরকার লগি,' বলল কিশোর। 'আর গোটা দুই খুঁটি। ওই নারকেলের কাণ্ডটা দিয়ে লগির কাজ চলবে।'

'আরেকটা কাণ্ড কেটেই তো দুটো খুঁটি বানানো যাবে,' রবিন বলল। 'কিংবা আরও এক কাজ করা যায়। নারকেলের অনেক কাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি দুটোকে পালা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।'

নারকেল কাণ্ডের অভাব নেই। আট ফুট উঁচু দুটো কাণ্ড বেছে নিল ওরা, একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব বারো ফুট। ছুরি দিয়ে ওগুলোর মাথায় গভীর খাঁজ কাটল। তার পর ফেঁড়ে যাওয়া আরেকটা কাণ্ডকে কেটে এনে তুলে দিল ওই

দুটোর ওপর, কড়িকাঠ হয়ে গেল।

'বা-বা, দারুণ চালা,' মুসা বলল। 'তাঁবু হয়ে গেল একেবারে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'অনেক পলিনেশিয়ানই এরকম কুঁড়েতে থাকে। দ্বীপে থাকার সময় জাপানীরাও হরদম বানাত।'

কড়িকাঠের ওপর চামড়াটা ঝুলিয়ে দিল ওরা, দড়িতে চাদর ঝোলানর মত করে। দশ ফুট করে হল একেকদিকে। এরপর দেয়াল তৈরির পালা। প্রবালের চ্যাপ্টা টুকরো এনে একটার ওপর আরেকটা রেখে দুই পাশে চার ফুট উঁচু দুটো দেয়াল তুলল। চামড়ার দুই প্রান্ত বিছিয়ে দিল ওগুলোর ওপর। তার ওপর আরও পাথর রেখে আটকে দিল, যাতে ছুটতে না পারে। ব্যস, হয়ে গেল ঢালু ছাউনি। রোদ তো আটকাবেই, বৃষ্টি হলেও গড়িয়ে পড়ে যাবে ঢাল বেয়ে।

পাথর দিয়ে অন্য দু'পাশের দেয়ালও তুলে দিল ওরা। চারটে বড় বড় ফোকর রাখল, ওগুলো দরজা।

শেষ হল ঘর তৈরি। এমন কুঁড়ে আর কেউ কখনও দেখেছে কিনা সন্দেহ। মুসার দৃঢ় বিশ্বাস, মাছ-তাতারেরাও দেখেনি এই জিনিস।

'কুমালোকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসা হল। শোয়ানো হল প্রবালের মেঝেতে সব চেয়ে কম খসখসে জায়গায়। নিঃশ্বাস ফেলা দেখেই বোঝা গেল অন্ধকার ঠাণ্ডায় এসে আরাম লাগছে তার। তিন ফুট চওড়া প্রবালের দেয়াল পুরোপুরি ঠেকিয়ে দিয়েছে রোদ। চালাটাও চমৎকার, অন্তত নারকেল পাতার ছাউনি আর ক্যানভাসের চেয়ে ভাল। কুঁড়ে কিছুটা নিচু হয়ে গেল, তবে একদিক দিয়ে সেটা বরং ভালই, ঝড়ের সময় বাতাসে উড়িয়ে নেয়ার সম্ভাবনা কম।

লম্বা হয়েছে যথেষ্ট। চারজনের জন্যে বেশ বড়। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হবে না।

'বৃষ্টির দিনে রান্নাও করতে পারব এর ভেতর,' কিশোর বলল।

'যদি বৃষ্টি হয়,' বলল মুসা। 'রান্না করার মত কিছু পাওয়া যায়। আর যদি আগুন জ্বালাতে পারি।'

ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'এইসব যদির সমাধান করতে হবে আমাদের। বৃষ্টি ঝরাতে পারব না, কাজেই পানি জোগাড়ের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। হয়ে যাবে। ভাবতে হবে আর কি। গুইজি লতা থেকে পানি পাওয়া যায়, কিন্তু এই দ্বীপে ওই গাছ নেই। ব্যারেল ক্যাকটাসে পানি পাওয়া যায়, এখানে তা-ও নেই। প্যানডানাসের খোঁজ করলে কেমন হয়? এখানকার মত খারাপ জায়গায়ও জন্মায় ওগুলো। পানি থাকে ওতে। চল, খুঁজে দেখি।'

খুব উৎসাহের সঙ্গে রওনা হল ওরা, যদিও জানে, প্যানডানাস পাওয়ার আশা

তেমন নেই।

একটা পাথর তুলে মুসার হাতে দিতে দিতে কিশোর বলল, 'এটা চোষ। লালা গড়াতে থাকবে। মনে হবে পানি খাচ্ছ।'

বাকি দিনটা খুঁজে বেড়াল ওরা। প্যানডানাসও পেল না, পানি আছে ওরকম কিছুই না। চাঁদের পিঠের মতই মরা যেন এই দ্বীপ।

সেরাতে আবার শিশির ধরা ফাঁদ পাতল কিশোর। কিন্তু পাতার খানিক পরেই এল জোরাল বাতাস, বাষ্প জমতেই পারল না। সকালে শূন্য পাওয়া গেল মালাটা। এমনকি রোগীর জন্যেও এক ফোঁটা পানি মিলল না।

কুমালোর বিহ্বল ভাব কেটে গেছে। ফলে পায়ের অসহ্য ব্যথা টের পাচ্ছে। প্রচণ্ড পিপাসা। তবে জ্বর চলে গেছে। গাল আর কপালে হাত দিলে এখন আগের মত গরম লাগে না। তার সঙ্গে পানির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করল কিশোর। পানির জন্যে কি কি করেছে, সব জানাল। তারপর বলল, 'তুমি নিশ্চয় কোন উপায় বাতলাতে পারবে?'

'না,' কুমালো বলল। 'এর বেশি আমিও কিছু করতে পারতাম না। ওই পিগউইড খুঁজে বের করা, তারপর মালা পেতে শিশির ধরা...'

'জীবনে এতটা বোকা মনে হয়নি নিজেকে,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'অসহায়...'

কিশোরের বিধ্বস্ত চেহারার দিকে তাকাল কুমালো। 'দুশ্চিন্তা কাবু করে ফেলেছে তোমাকে। একটা কথা বললে শুনবে?'

'কী?'

'সাঁতার কাটতে চলে যাও তোমরা। আমার দেশের লোকের বিশ্বাস, কোন ব্যাপার যখন খুব জটিল হয়ে যায়, কিছুতেই কিনারা না হয়, ওটার দিক থেকে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়া উচিত। গিয়ে খেলাধুলা করা উচিত কিছুক্ষণ। এতে শরীরের অস্থিরতা কমে, চিন্তার ক্ষমতা বাড়ে।'

'বেশ, ডাক্তার কুমালো, তুমি যখন বলছ, যাচ্ছি,' শুকনো হাসল কিশোর। 'তবে আমার মনে হয় সময়ই নষ্ট হবে অযথা।'

'আমার কাছে পরামর্শটা ভালই লাগছে,' মুসা বলল। 'বাতাস আছে। পানিও বেশ ঠাণ্ডা। আরামই লাগবে।'

রবিন কিছু বলল না। তবে কিশোর আর মুসা উঠতেই সে-ও পিছে পিছে চলল।

সাগরের কিনারে চলে এল ওরা। ল্যাগুনের চেয়ে এদিকটায় ঠাণ্ডা বেশি। ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢেউয়ের ওপর। ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে যায়নি দেয়ালটা, সৈকত

নেই, একবারেই ঝপ করে নেমে গেছে গভীর পানিতে। তিনটে সীল মাছের মত খেলতে শুরু করল ওরা। ডুব দিচ্ছে, সাঁতার কাটছে, দাপাদাপি করছে। কচুপাতার পানির মত পিছলে ধুয়ে চলে গেল যেন তাদের সমস্ত উদ্বেগ।

'ধরতে পারবে না আমাকে,' মুসাকে চ্যালেঞ্জ করল কিশোর।

'পারলে কি দেবে?'

'এই দ্বীপটা।'

'এই মরা দ্বীপ কে নেয়? তবু আমি ধরছি তোমাকে।' কয়েক গজও যেতে পারল না কিশোর, তার আগেই তাকে ধরে ফেলল মুসা। ভেসে উঠে হাসতে হাসতে বলল, 'কি, রবিন মিয়া, তুমি চ্যালেঞ্জ করবে নাকি?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'না বাবা, পারব না, খামোকা মুখ খরচ করে লাভ নেই।'

'ডুব দাও,' মুসাকে বলল কিশোর। 'আমি ধরব।'

পারবে না জানে, তবু মুসার দ্রুত নেমে যাওয়া ছায়াটাকে লক্ষ্য করে ডুবে চলল কিশোর।

বিশ ফুট মত নেমে থামল মুসা। দেয়ালের ধার ধরে ডুব-সাঁতার দিয়ে চলল। তার পিছে তেড়ে এল কিশোর।

দেয়ালের বোতলের মুখের মত জায়গাটায় এসে, যেখানে চওড়া হতে আরম্ভ করেছে দেয়াল, হঠাৎ মুখে ঠাণ্ডা পানি লাগল মুসার। বেশি ঠাণ্ডা।

মনে হল, ঠাণ্ডা পানির একটা ডুবো-প্রবাহ দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে এসে সাগরে পড়ছে। সামনে এগোতেই আবার গরম পানিতে পড়ল সে।

ঠাণ্ডা পানি কিশোরের শরীরেও লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠতে শুরু করল সে। দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে মুসার, সে-ও উঠতে লাগল।

রবিন দেখল, ভুস ভুস করে ভেসে উঠল দুটো মাথা। সাঁতরে কাছে আসতে লাগল সে।

ঝাড়া দিয়ে চুল আর মুখ থেকে পানি ফেলে কিশোর বলল, 'মুসা, কিছু টের পেয়েছ?'

'পেয়েছি। ঠাণ্ডা পানি। মনে হল দ্বীপের ভেতর থেকেই আসছে।'

'এর মানে বুঝতে পারছ?'

'না তো!'

'এর মানে পরিষ্কার পানি! বাজি ধরে বলতে পারি আমি।'

'ধরলে হারবে, আরকি।'

কাছে চলে এল রবিন। জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে। তাকে বলল কিশোর। শুনে তার সঙ্গে একমত হল রবিন। 'নিশ্চয় মিষ্টি পানি! ইস, একটা বোতল পেলে

হত! চল, ডুব দিয়ে হাঁ করে মুখে নিই।'

ডুব দিল কিশোর। ঠাণ্ডা পানিতে মাথা ঢুকতেই স্রোতের দিকে ফিরে মুখ হাঁ করল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে ঢুকল পানি। পরিষ্কার, মিষ্টি! গিলে নিয়ে আবার হাঁ করল। আবার গিলে আবার হাঁ। পানি মুখে নিয়ে ভেসে উঠল ওপরে। তার পাশে ভাসল মুসা।

'রবিইন,' চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দা সহকারী। 'সত্যি মিষ্টি!'

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল কিশোরের। বলল, 'যাক, অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। রবিন,' মুসার সঙ্গে গিয়ে তুমিও খেয়ে এস।'

ওরা দু'জনে আবার ভাসলে বলল কিশোর, 'তোমরা এখানে থাক। নিশানা রাখ। আমি গিয়ে মালাটা নিয়ে আসি।'

দশ মিনিটের মধ্যেই নারকেলের মালা নিয়ে ফিরে এল সে।

'কিন্তু মুখ তো নেই,' মুসা বলল। 'ডোবালেই নোনা পানিতে ভরে যাবে। মিষ্টি পানি ভরবে কিভাবে?'

'পরা যাবে,' বলল রবিন। 'কায়দা আছে।'

'হ্যাঁ,' বলে ডুব দিল কিশোর। নোনা পানিতে ভরে গল মালা। ঠাণ্ডা পানিতে পৌঁছে মালাটা উপুড় করল সে। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে পাম্প করার মত কয়েকবার ওপরে নিচে করল আঙুলগুলো। চাপ লেগে বেরিয়ে গেল নোনাপানি, আর ঢুকতে পারল না, কারণ মিষ্টি পানির চেয়ে ভারি। সেই জায়গা দখল করল মিষ্টি পানি। মালাটাকে কয়েকবার ওপরে-নিচে করে, পানি ঢুকিয়ে, বের করে নিশ্চিত হয়ে নিল সে, যে আর এক ফোঁটা নোনা পানিও নেই। তারপর মালা ভর্তি মিষ্টি পানি নিয়ে, মালার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে ভেসে উঠতে শুরু করল ওপরে।

দেয়ালের ওপরে উঠে পা দোলাচ্ছে রবিন। পাশে বসে আছে মুসা। হাত বাড়িয়ে মালাটা নিল কিশোরের হাত থেকে। ঠোঁটে লাগাতে গেল। বাধা দিল কিশোর, 'না না, আর খেয়ো না। দু'তিন দিনের শুকনো পেট, বেশি সইতে পারবে না। যা খেয়েছ খেয়েছ। আবার পরে। এটা কুমালোর জন্যে নিয়ে যাই।'

পানির নিচের ঝর্না থেকে কুমালোর জন্যে পানি নিয়ে এল ছেলেরা। দেখে, পানি এসে গেল আহত রোগীর চোখে। দু'হাতে মালাটা ধরে একচুমুক খেয়ে নামিয়ে রাখল পাশে, ধরে রাখল যাতে গড়িয়ে না পড়ে যায়। বলল, 'জীবনে আর কোন জিনিস এত মজা লাগেনি।'

'যাক, দুটো দরকারি জিনিস পাওয়া গেল,' বলল কিশোর। 'ঘর এবং পানি। কিন্তু পেট বলছে খাবার ছাড়া আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা, 'ঠিক বলেছ! আহারে, দু'দিন ধরে যে কি কষ্টে রয়েছে

বেচারা,' পেটে হাত বোলাল সে।

হেসে উঠল সবাই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমালো বলল, 'এসব কাজ আমারই করার কথা। অথচ আমি একটা মরা কাঠ হয়ে পড়ে আছি এখানে, তোমরা কষ্ট করে মরছ।'

হাত নাড়ল কিশোর। 'বাদ দাও এসব কথা।'

'হ্যাঁ, তোমারও এখন খাবার দরকার,' মুসা বলল। 'আমাদের চেয়ে বেশি দরকার তোমার। কিশোর, দেরি করে লাভ কি? চল, যাই।'

পানি খেয়ে শরীর কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। ছাউনির ছায়া ছেড়ে রোদে বেরোতে ইচ্ছে হচ্ছে না কিশোরের। কিন্তু বসে থাকলে চলবে না।

রবিন বলল, 'খোঁজাখুঁজি তো দু'দিন ধরেই করলাম। কিছু থাকলে চোখে পড়ত না? কি পাওয়া যাবে এই হতচ্ছাড়া দ্বীপে?'

'একটা ব্যাপার চোখ এড়িয়ে গেছে তোমাদের,' কুমালো বলল। 'একটা ভাল লক্ষণ। ওই পাখিটা, গাংচিল। রয়ে গেছে দ্বীপে। খাবার না থাকলে কিছুতেই থাকত না।'

'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছি, কুমালো,' কিশোর বলল। 'শুনে নিরাশ হবে হয়ত। চলে গেছে ওটা। কাল রাতে।'

দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত, কেউ কথা বলল না। প্রচণ্ড হতাশা যেন চেপে ধরেছে সবাইকে। পানি শক্তি জুগিয়েছে বটে, অন্য দিকে পেটকেও চাঙা করেছে। খাবার চাইছে এখন ওটা।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বলল, 'এভাবে বসে থাকলে কিছুই হত না। পানি আর ঘর তো পেয়েছি। খাবারও পাব। ওঠ, এস তোমরা। প্রমাণ করে দেব, পাখি ব্যাটা ভুল করেছে।'

চার

ক্ষুধা তীক্ষ্ণ করে দিয়েছে ওদের চোখ। মিহি দাঁতের চিরুনি দিয়ে উকুন বাছার মত করে দ্বীপটায় খুঁজতে লাগল খাবার। অতি ছোট বস্তুও এখন চোখ এড়াবে না।

ওল্টানো যায় এরকম আলগা পাথর যে ক'টা পেল, সব উল্টে উল্টে দেখল তলায় কি আছে। প্রায় চষে ফেলল বালির সৈকত।

কিন্তু নিরাশ হতে হল।

তিন ঘন্টা খোঁজার পর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল মুসা। শেষে একটা নারকেলের কাণ্ডে মাথা রেখে একেবারে শুয়েই পড়ল। একটা আঙুল নাড়তে ইচ্ছে করছে না

আর।

খুব মৃদু একটা শব্দ কানে এল, নড়াচড়ার। মনে হল কাণ্ডটার ভেতরে। কিশোর আর রবিনকে ডাকল সে। কাছে এলে কিশোরকে বলল, 'কান রেখে দেখ।...কিছু শুনছ?'

কান ঠেকিয়ে রেখেই বলল কিশোর, 'ভেতরে জ্যান্ত কিছু আছে। ছুরি দিয়ে কেটে বের করা যাবে।'

কাণ্ডটা কাটতে শুরু করল ওরা। পচে নরম হয়ে গেছে। ভেতরের জিনিস দেখে মুখ বিকৃত করে ফেলল রবিন। মোটা মোটা শুঁয়াপোকার মত কতগুলো জীব।

'পোকা!' কিশোর বলল। 'সাদা গোবরেপোকার শুককীট। মুসা, ভর পকেটে। আর আছে কিনা দেখি।'

'খাবে ওগুলো!' রবিনের প্রশ্ন।

'প্রাণ তো বাঁচাতে হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'নাক টিপে ধরে তেতো ওষুধ খায় না রোগী?'

মোট চোদ্দটা পোকা পেল ওরা। সেগুলো দেখাতে নিয়ে গেল কুমালোকে।

'বিষাক্ত?' সন্দেহের চোখে পোকাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে রবিন।

'মোটেই না,' মাথা নাড়ল কুমালো। 'ভিটামিনে ভরা।'

'রাঁধা যায় না?'

'যায়। আগুন তো নেই, রোদে ঝলসেই কাজটা সেরে নিতে হবে। অন্ধকারে থাকে এগুলো, শরীর খুব নরম। গরম পাথরে রেখে রোদে দাও, সেদ্ধ হয়ে যাবে।'

ঘিনঘিনে লাগলেও ঝলসানো শুঁয়াপোকার স্বাদ খুব একটা খারাপ লাগল না ছেলেদের কাছে। দুই দিনের খিদে পেটে, যা খাবে এখন তাই ভাল লাগার কথা!

'এগুলো যেখানে পেয়েছ,' কুমালো বলল। 'সেখানে উইপোকাও থাকতে পারে। পচা কাঠে বাসা বানায় ওরা।'

কুমালোর অনুমান সত্যি। ওই কাণ্ডটারই আরেক প্রান্তে একটা উইয়ের বাসা খুঁজে পেল ছেলেরা। এই পোকার আরেক নাম সাদা পিঁপড়ে। বেশ মোটা, নরম। রোদ সইতে পারে না। তাড়াহুড়ো করে গাছের ভেতরের সুড়ঙ্গে ঢুকে বাঁচতে চাইল। কিন্তু যেতে দেয়া হল না। রবিনও হাত লাগাল এখন। পোকাগুলোকে বের করে করে রাখল গরম পাথরে। চোখের পলকে কুঁকড়ে, মরে গেল ওগুলো। ধীরে ধীরে সেদ্ধ হল।

আবার কিছু খাওয়া জুটল অভিযাত্রীদের।

হেসে বলল মুসা, 'বাড়ি গিয়ে মাকে যদি বলি শুঁয়াপোকা আর উই রেঁধে দাও,

কি করবে আল্লাই জানে।'

আবার খুঁজল ওরা। আর কিছু বেরোল না।

সূর্য ডোবার আগে ডুব দিয়ে গিয়ে পানি তুলে আনল মুসা। মনে হল, আগের মত জোর আর নেই স্রোতের। কিশোরকে জানাল সেকথা।

নিশ্চয় বৃষ্টি, আন্দাজ করল গোয়েন্দাপ্রধান। কয়েক দিন আগে ঝড়ের সময় যে বৃষ্টি পড়েছিল, সেটাই মাটির তলায় জমা হয়েছিল, ফাঁক দিয়ে বেরোতে শুরু করেছে। পানি কমে আসছে, তাই স্রোতের জোরও কমছে। আবার বৃষ্টি না হলে শেষ হয়ে যাবে একসময়। মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও আশঙ্কার কথা কাউকে জানাল না সে।

'পানিতে মাছ নিশ্চয় আছে,' কিশোর বলল। 'ধরি কিভাবে?'

জোর আলোচনা চলল। মাছ ধরা যায় কি উপায়ে? সুতো নেই, বড়শি নেই, ছিপ নেই, টোপ নেই, জাল নেই, বর্শা নেই। কি দিয়ে ধরবে?

কুমালো সুস্থ স্বাভাবিক থাকলে একটা জবাব বের করা যেত। কিন্তু রোগে ভুগে ভীষণ ক্লান্ত সে, ঘুমোচ্ছে। সমস্যাটা নিয়ে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল তিন গোয়েন্দা। হাই তুলল মুসা। ঘুম পেয়েছে।

'একটা ফাঁদ বানানো যায়,' কিশোর প্রস্তাব দিল। 'অবশ্য যদি একটা বাক্স বা ঝুড়িটুড়ি পাওয়া যায়।'

'কিন্তু নেই,' আবার হাই তুলল মুসা, হাত চাপা দিল মুখে। 'কাজেই ফাঁদ তৈরি হচ্ছে না। আর কোন উপায়ও নেই...'

'নিশ্চয় আছে!' চেঁচিয়ে বলে, একলাফে উঠে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেল কিশোর। রবিনও বেরোল। ঘুমজড়িত চোখে তাদের পিছু নিল মুসা, কি করে কিশোর দেখার জন্যে কৌতূহল হচ্ছে।

সূর্য ডুবে গেছে। যাই যাই করে এখনও রয়ে গেছে গোধূলির কিছু আলো। সাগরের পারে এসে পাথর জড়ো করতে শুরু করল কিশোর।

'দয়া করে বলবে, কি করছ?' আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ফাঁদ তৈরি করছি, পাথরের ফাঁদ। এটাই উপযুক্ত সময়, জোয়ার এখন সবে আসতে শুরু করেছে। পাথর গায়ে গায়ে লাগিয়ে একটা গোল দেয়াল তৈরি করব। জোয়ারে ডুবে যাবে ওটা। যখন পানি নেমে যাবে, হয়ত একআধটা মাছ আটকে থাকতেও পারে ওর ভেতর।'

'খাইছে! ঠিকই তো বলেছ!' তুড়ি বাজাল মুসা। ঘুম দূর হয়ে গেছে। কিশোর আর রবিনের সঙ্গে সে-ও দেয়াল তৈরিতে হাত লাগাল। দেয়ালটা ছড়িয়ে নিয়ে গেল পানি পর্যন্ত, যাতে জোয়ার চলে যাওয়ার পরেও তাতে চিকচিকে পানি থাকে।

শেষ হল দেয়াল। তিন ফুট উঁচু, বিশ ফুট চওড়া।

হিসেব করে বের করল কিশোর, মাঝরাতের দিকে ডুবে যাবে দেয়াল, ভোরে সূর্য ওঠার আগে আবার বেরিয়ে আসবে। ভেতরে পানি থাকবে তখনও।

পরদিন সকালে রোদের বর্শাগুলো যখন সবে ছড়াতে শুরু করেছে সূর্য, দু'একটা ঢুকে পড়েছে মাছের চামড়ার তাঁবুতে, ঘুম ভাঙল মুসার। শুঁয়াপোকা আর উই হজম করে ফেলেছে পেট, নতুন খাবার চাইছে। কিশোর আর রবিনকে ডাকল, 'এই ওঠ ওঠ! আলসে হয়ে গেছে সব। চল, গিয়ে দেখি কি মাছ পড়ল।'

ফাঁদের তলায় নেমে গেছে পানি। অল্প পানিতে ছোটাছুটি করছে কয়েকটা বিচিত্র ছোট জীব, বেরোনর পথ খুঁজছে। খুব সুন্দর একটা মাছ দেখা গেল, গায়ের রঙ সবুজে সোনালিতে মেশানো, তার ওপর লাল আর নীলের হালকা ডোরা। তিনজনেই চিনতে পারল ওটাকে, অ্যাঞ্জেল ফিশ। আরও দুটো মাছ আছে, অ্যাঞ্জেলের মত এত সুন্দর নয়, তবে খেতে চমৎকার। একটা বাচ্চা ব্যারাকুডা, আরেকটা মুলেট। বিষাক্ত একটা স্করপিয়ন ফিশও আছে। ওটার কাছেও গেল না তিন গোয়েন্দা। পানিতেই রইল ওটা। পরের বার জোয়ার এলে বেরিয়ে যেতে পারবে, যদি ততোক্ষণ বেঁচে থাকে।

মোচার মত দেখতে একটা তারা মাছ দেখে ধরতে গেল মুসা, থামাল রবিন। 'খবরদার! মারাত্মক বিষ ওগুলোর কাঁটায়। হাতে ফুটলে প্রথমে হাত ফুলে যাবে। তারপর ফুলবে শরীর। শেষে হৃৎপিণ্ড থেমে গিয়ে মারা যাবে।'

সরে এল মুসা। তারা মাছের ধারেকাছে গেল না আর।

খাবার উপযোগী মাছগুলো ধরে নিয়ে মহানন্দে ঘরে ফিরল তিন গোয়েন্দা। ওগুলো দেখে কুমালোও খুশি হল।

'কাঁচাই খেতে হবে,' সে বলল। 'খারাপ লাগবে না। তবে রেঁধে নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি করব? গায়ে তো জোর নেই, নইলে আগুন জ্বালাতে পারতাম।'

'দেখি, আমি চেষ্টা করে,' বলল কিশোর। তবে বিশেষ ভরসা পেল না। আমাজনের জঙ্গলে ভাসমান দ্বীপে আগুন জ্বালাতে গিয়ে বুঝেছে কাজটা কত কঠিন।

প্রথমেই দরকার শুকনো খড়কুটো। সেটা জোগাড় করা যাবে, নারকেলের কাণ্ড থেকে। ভেতরের কিছু ছোবড়া কেটে নিলেই হবে। তারপর লাগবে কাঠের গুঁড়ো। আর শক্ত শক্ত কয়েকটা কাঠি।

ছোবড়া জোগাড় হল। গুঁড়োও পাওয়া গেল বাকল চেঁছে। বাকি রইল কাঠি।

'কাঠি লাগবে,' কিশোর বলল। 'শক্ত এবং হালকা।'

আগের দিন সৈকতে একটা গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখেছিল রবিন। ঢেউয়ে ভেসে এসে আটকা পড়েছে। ছুটে গিয়ে কাঠি কেটে নিয়ে এল সে।

বেশ হালকা কাঠি। খটখটে শুকনো।

'কিভাবে কি করবে?' মুসা জানতে চাইল।

সোজা একটা কাঠিকে সুন্দর করে কেটে ছোট করল কিশোর। এক মাথা চোখা করল। বাকলের একটা টুকরো কেটে মাঝখানে ছোট একটা গোল খাঁজ করল। তারমধ্যে রাখল বাকলের গুঁড়ো। চারপাশে ছড়িয়ে দিল ছোবড়া। তারপর ছোট কাঠির চোখা মাথাটা খাঁজে রেখে দু'হাতের তালুতে চেপে ধরে ডলতে শুরু করল, ডাল ঘুঁটনি দিয়ে ডাল ঘোঁটা হয় যেভাবে।

দ্রুত থেকে দ্রুততর হল হাত। হাতের জোর ঠিক রাখতে হবে, বাড়াতে হবে গতি, তাহলেই কেবল আসবে সাফল্য। টপ টপ করে ঘাম ঝরতে লাগল তার কপাল থেকে। বাকলের খাঁজটাকে গভীর করে বসে যাচ্ছে কাঠির চোখা মাথা। চারপাশে ছিটকে পড়ছে বাকলের গুঁড়ো।

আরও জোরে ডলতে লাগল কিশোর। ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল ছোবড়া থেকে। তারপর দপ করে জ্বলে উঠল আগুনের একটা শিখা।

পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়েছে মুসা। মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে ফুঁ দিল আগুনে। তার ওপর আরও কিছু ছোবড়া আর শুকনো বাকলের কুটো রাখল মুসা। উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল আগুন।

কাঠিটা সরিয়ে এনেছে কিশোর। 'হউফ!' করে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাম মুছল কপালের। বলল, 'ইস, এভাবে কষ্ট করে আগুন ধরানো···ম্যাচ থাকলে কত সহজ হত।'

দ্রুত মাছগুলোর চামড়া পরিষ্কার করে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল ওরা। লম্বা লম্বা কাঠিতে গেঁথে ধরল আগুনের ওপর।

মাছের কাবাব দিয়ে চমৎকার নাস্তা হল সেদিন। কিছুই অবশিষ্ট রাখল না। কাঁটায় লেগে থাকা মাংসগুলো পর্যন্ত চেটেপুটে সাফ করে ফেলল। সেই সঙ্গে রয়েছে ডুবো ঝর্নার মিষ্টি পানি। আয়েশ করে ঢেকুর তুলল সবাই। ভুলে গেল প্রথম তিন দিনের আতঙ্ককর পরিস্থিতির কথা। মৃত্যুদ্বীপকে জয় করেছে ওরা।

'আশা করা যাচ্ছে,' রবিন বলল। 'ডেংগু আসাতক বেঁচে থাকতে পারব আমরা।' একটা কাঠিতে ছুরি দিয়ে গোল গোল খাঁজ কাটছে সে, তিনটা কেটে ফেলেছে, আরেকটা কাটছে।

'কি করছ?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'দিনের হিসেব রাখছি। কাঠিটা যেরকম লম্বা, তাতে চোদ্দটা খাঁজ কাটা

যাবে। আমার বিশ্বাস, ততদিনে মোটর বোটটাকে দেখতে পাব। ইস, কি যে আনন্দের দিন হবে সেদিনটা!'

'রবিন,' কিশোর বলল। 'কয়েকটা কথা বলার সময় এসেছে। তোমাদের জানিয়ে রাখা উচিত মনে করছি। এ-কদিন খুব ঝামেলা গেছে, দুশ্চিন্তায় ছিলাম, আরও বেশি চিন্তায় পড়ে যাবে বলে বলিনি। ডেংগুর আশা ছাড়তে হবে আমাদের। দ্বীপ থেকে বেরোতে হলে ভেলা তৈরি করতে হবে।'

রবিন, মুসা, কুমালো, তিনজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে।

'ভেলা?' মুসা বলল। 'ভেলা কি দরকার? বোটই যখন পাব?'

'না, বোট আসছে না,' ভুল রীডিং লিখে ডেংগুকে কিভাবে ফাঁকি দিয়েছে, খুলে বলল কিশোর। 'কাজেই বুঝতেই পারছ, নিজের পায়ে কিভাবে কুড়োল মেরেছি।'

'তা মেরেছ,' মাথা দোলাল মুসা।

'না না, ঠিকই করেছ তুমি,' কুমালো বলল। 'এছাড়া আর কি করতে পারতে? তুমি তো আর জানতে না এখানে এনে আমাদেরকে আটকাবে ডেংগু। তুমি করেছ, যাতে মুক্তা চুরি করতে না পারে সে। প্রফেসরের সম্পদ রক্ষা করেছ। এটা তোমার দায়িত্ব ছিল। আর এত ভাবনার কিছু নেই। খাবার আর পানি যখন পাওয়া গেছে, বেরিয়েও যেতে পারব আমরা। ভেলা বানাতে পারবে। নারকেলের অনেক কাণ্ড আছে।'

'কিন্তু শুধু কাণ্ড দিয়েই হবে না,' রবিন বল। 'বাঁধব কি দিয়ে ওগুলোকে? পেরেক নেই, স্ক্রু, বল্টু, দড়ি কিচ্ছু নেই।' কুমালোর জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না সে। 'তাছাড়া আসল কাজই এখনও বাকি রয়ে গেছে, যে জন্যে আমরা এলাম এখানে, আটকা পড়লাম। মুক্তো তোলা। কিছু নমুনা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখাতে হবে। মুক্তো তোলার জন্যে এত নিচে ডুব দেবে কে? তুমি তো অসুস্থ।'

'কাজটা আমাদেরকেই করতে হবে আরকি,' কিশোর বলল।

হাঁ হয়ে গেল রবিন। 'ষাট ফুট! তিরিশের বেশি আমি পারব না। পঁয়তাল্লিশের বেশি মুসাও পারবে কিনা সন্দেহ।'

হাসল মুসা। ওর এই হাসির অর্থ বুঝল কিশোর। ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ফেলেছে গোয়েন্দা সহকারী। আর একবার যখন নিয়েছে, সহজে ক্ষান্ত হবে না।

খানিক পরেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল মুসা। পিছে পিছে রওনা হল কিশোর আর রবিন।

ল্যাগুনের পাড়ে এসে কাপড় খুলে পানিতে নামল মুসা। ডাইভিং প্র্যাকটিস শুরু করল।

ডুব দিয়ে নেমে গেল অনেক নিচে। কিছুক্ষণ পর ভেসে উঠে ফোঁস্‌স্‌ করে বাতাস ছাড়ল মুখ দিয়ে।

দম নেয়ার পর বলল, 'তিরিশ ফুটের বেশি নেমেছি। পানি খালি ঠেলে রাখে। পায়ে দুটো লোহার জুতো পরতে পারলে কাজ হত। টেনে নামাত।'

'বিকেলে দোকান থেকে এনে দেব'খন,' হেসে বলল রবিন। 'আপাতত একটা পাথর দিয়ে কাজ চালাও।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।'

একটা পাথর বেছে নিল মুসা, তার মাথার দ্বিগুণ। ওটা দু'হাতে ধরে মাথা নিচু করে ডুব দিল। ভারের কারণে প্রথমে বেশ দ্রুত নেমে চলল, আস্তে আস্তে কমে এল গতি। কিন্তু তলায় নামতে পারল। এক হাতে পাথরটাকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আরেক হাতে একটা ঝিনুক তুলে নিল। তারপর ছেড়ে দিল পাথরটা। সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে তাকে ঠেলে তুলতে লাগল পানি।

বিশাল বাদামী ঝিনুকটা তীরে ছুঁড়ে মারল সে।

পানির তলায় বেশিক্ষণ থাকেনি, বিশ সেকেণ্ড। ফলে পানির চাপ তেমন প্রতিক্রিয়া করল না শরীরে।

'বাপরে বাপ, পিষে মেরে ফেলতে চায়!' শ্বাস নিতে নিতে বলল সে। 'এভাবে একটা একটা করে ঝিনুক তুলতে হলে এক মুক্তা পেতেই এক বচ্ছর লাগবে।'

'একটা ঝুড়ি হলে…'

কিশোরের কথায় বাধা দিল মুসা, 'কোথায় পাবে?'

'জানি না। চল, কুমালোকে জিজ্ঞেস করি।'

কুমালোকে সমস্যাটার কথা বলতে পড়ে থাকা নারকেল কাণ্ডের মাথার দিকে তাকাল সে। বলল, নারকেল গাছের মাথায় শক্ত আঁশে তৈরি এক ধরনের জাল থাকে। চেষ্টা করলে ওগুলো দিয়ে একটা থলে বানানো যায়।

'দূর!' বলে মাথা নাড়ল মুসা।

তবে নারকেলের 'জাল' বা 'কাপড়' পাওয়া গেল। গাছের মাথার কাছে ডালের গোড়ায় জড়িয়ে থাকে এই জাল। বেশ শক্ত। ডালের গোড়ার ফুটখানেক ওপর থেকে ডালপাতা সব মুড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝড়। তবে গোড়া যেটুকু আছে, তাতে পাওয়া গেল ওই জাল। ছুরি দিয়ে কয়েক টুকরো কেটে নিয়ে ওই জালের সুতো দিয়েই সেলাই করে থলে তৈরি হয়ে গেল।

'আচ্ছা, এই জিনিস দিয়ে কাপড় হয় না?' রবিন বলল।

'হয়ত হয়,' আনমনে বলল কিশোর। 'চামড়ায় ঘষা লাগবে। আরাম পাব না। তবে দিনের বেলা গায়ে দিয়ে রাখলে রোদ বাঁচবে কিছুটা।'

কড়া রোদ সাদা প্রবালে প্রতিফলিত হয়ে এসে গায়ে লেগে চামড়ায় যেন ছ্যাঁকা দেয়। ফোসকা পড়ে যাওয়ার অবস্থা।

নারকেলের কাপড় দিয়ে শার্ট, কিংবা বলা ভাল গায়ের ঢাকনা বানিয়ে নিল কিশোর। গায়ে দিয়ে দেখল, ভালই, রোদ অনেকখানি ঠেকায়।

'সানগ্লাস দরকার আমার,' মুসা বলল। 'চোখের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে রোদ। এভাবে রোদের দিকে সারাক্ষণ চেয়ে থাকতে হলে অন্ধ হয়ে যাব।'

ঠিকই বলেছে ও। এসব ছায়াশূন্য দ্বীপে আটকা পড়া অনেক নাবিকই অন্ধ হয়ে গেছে রোদের কারণে।

জালের বুনন কোথাও মোটা, কোথাও মিহি। ওরকম মিহি কাপড়ের ফালি কেটে চোখে বেঁধে নিল সে। খুদে ফাঁক দিয়ে তাকাল। আরে! কাজ হচ্ছে! রোদ আর ততটা লাগে না চোখে। যদিও দেখা যায় কম। তাতে কি? কাজ চললেই হল।

'যাক, আরামই লাগছে,' কিশোর বলল।

'তা তো লাগছে,' বলল মুসা। 'কিন্তু আমাকেও কি তোমার মতই কিম্ভূত লাগছে?'

'হ্যাঁ, লাগছে,' হেসে বলল রবিন। 'একেবারে নারকেল গাছের ভূত।'

হাসতে শুরু করল তিনজনেই।

'চল, কুমালোকে দেখাই,' প্রস্তাব দিল মুসা।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল ওরা। তবু সামান্য শব্দ হয়ে গেল। তন্দ্রায় ঢুলছিল কুমালো, হঠাৎ জেগে তিনটে কিম্ভূত মুখোশ পরা মূর্তিকে দেখে চমকে চিৎকার করে উঠল। তারপর চিনতে পারল ওদেরকে। কাপড়, চশমা, আর থলের প্রশংসা করল।

'কি জানি,' মাথা চুলকাল সে। 'সন্দেহ হচ্ছে, তোমাদের গায়েও পলিনেশিয়ান রক্ত বইছে কিনা। নইলে এভাবে নকল কর কিভাবে? যা-ই পাচ্ছ, ঠিক কাজে লাগিয়ে ফেলছ।'

খুশি হয়ে আবার উপসাগরের ধারে ফিরে এল ওরা। কুমালোর প্রশংসা অনেক উৎসাহ জোগাল ওদের।

'এখন, পলিনেশিয়ানদের মত ডুব দিতে পারলেই হয়,' বলল কিশোর। 'তাহলে কিছু মুক্তো তুলতে পারব।'

কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়। পাথর নিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করে দেখল

কিশোর, তলায় পৌঁছতে পারল না। তবে প্রতিবারেই আগের চেয়ে বেশি নিচে নামতে পারছে। বুঝল, আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে। পুরো ব্যাপারটাই অভ্যাসের।

ব্যাগ কোমরে বেঁধে নিচে নেমে গেল মুসা। ঝিনুক কুড়িয়ে থলেতে ভরে উঠে আসার সময় খেয়াল করল, ভারি হয়ে গেছে। টেনে রাখছে নিচের দিকে। বেশি জোরাজুরি করলে থলে ফেটে সব পড়ে যাওয়ারও ভয় রয়েছে। শেষে মাত্র তিনটে ঝিনুক নিয়ে উঠে আসতে হল তাকে।

'আসলে একটা দাড়ি দরকার আমাদের,' মুসা বলল। 'ব্যাগ বেঁধে দেব। টেনে তোলা যাবে।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হল কিশোর। 'ভেলা তৈরির জন্যেও দড়ি দরকার। কিন্তু এই পাথরের রাজ্যে পাই কোথায়?'

দড়ি খুঁজে অনেকটা সময় কাটাল ওরা। কুমালোর কাছে জেনেছে, ছোবড়া দিয়ে দড়ি তৈরি করে পলিনেশিয়ানরা। কিন্তু পেয়েছে মাত্র একটা নারকেল, ওটা দিয়ে আর কত লম্বা দড়ি হবে।

লিয়ান লতা দিয়ে দড়ির কাজ চালানো যায়। কিন্তু এই দ্বীপে তেমন কোন লতাই নেই।

আমাজানের জঙ্গলে ওরা দেখেছে, বোয়া সাপের চামড়া দিয়ে দড়ি বানায় ওখানকার জংলীরা। অ্যানকোণ্ডা সাপের চামড়া দিয়েও হয়। কিন্তু প্রবাল অ্যাটলে সাপ থাকে না, না ছোট, না বড়। সাগরের সাপ অবশ্য আছে, তবে এই ল্যাগুনে একটাও দেখতে পেল না ওরা।

দড়ি না পেলেও খাবার পেল। একটা শসা নিয়ে ঘরে ফিরল বিকেলে।

'কুমালো চমকে যাবে,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'কে ভাবতে পেরেছিল প্রবালের বাগানে শসা পেয়ে যাব?'

এই বিশেষ শসাটা কোন সব্জি নয়, কোন বাগানেও জন্মেনি। এটা একটা জলজ প্রাণী, নাম সী কিউকামবার বা সাগরের শসা। চীনাদের খুব প্রিয় খাবার।

ল্যাগুনের প্রবালের একটা তাকে ওটাকে পড়ে থাকতে দেখেছে ছেলেরা। বিশাল এক শসার মতই দেখতে, গায়ে শসার মতই শুঁয়া রয়েছে, চামড়ায় চাকা চাকা দাগ। বেশ মোটা, আর ফুটখানেক লম্বা। তবে পানির ওপরে তোলার পর চুপসে অর্ধেক হয়ে গেল।

এই জীবটাও বিষ ছড়াতে পারে, সেই বিষ চোখে লাগলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই ছুরি দিয়ে গেঁথে সাবধানে তুলেছে ওটাকে মুসা। রেখে দিয়েছে গরম পাথরের ওপর। মরে যাওয়ার পর ক্যাম্পে এনেছে।

কুমালোর নির্দেশ মত লম্বালম্বি চিরে পাঁচটা ফালি করল ওটাকে কিশোর। ঝলসে নিল আগুনে। চেহারাটা কুৎসিত, কিন্তু খেতে চমৎকার লাগল সাগর-শসার মাংস।

পাঁচ

সেরাতে দুঃস্বপ্ন দেখল মুসা। ঘুমের মধ্যেই চেঁচাতে শুরু করল, 'ওরে বাবারে! কানা হয়ে গেলামরে! সাগর-শসার বিষ লেগেছে!'

ঠেলা দিয়ে তাকে জাগাল কিশোর। 'এই মুসা, চেঁচানি থামাও। দুঃস্বপ্ন দেখছ।'

আর ঘুম এল না মুসার। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ছাউনি থেকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দেখতে পাচ্ছে সবই, তারমানে অন্ধ হয়নি। আসলেই দুঃস্বপ্ন ছিল ওটা।

কালো কালো মূর্তির মত তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে নারকেলের কাণ্ডগুলো।

তারার ঘড়ি দেখে অনুমান করল, ভোর তিনটে বাজে। ল্যাগুনের শান্ত পানিতে সাদার্ন ক্রসের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব ঝিলমিল করছে।

ল্যাগুনের ধারে পায়চারি শুরু করল সে, উত্তেজনা কমানোর উদ্দেশ্যে। তারপর সরে এল সাগরের ধারে। সাগরও নীরব। ঢেউ নেই। জোয়ার নামছে।

অলস ভঙ্গিতে হেঁটে এগোল সে ফাঁদে কি পড়েছে দেখার জন্যে। কিনারে এসে ভেতরে তাকাল।

ভীষণ চমকে উঠল সে। জীবনে এরকম দৃশ্য দেখেনি। বিশাল দুটো চোখ তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

বাসনের সমান বড় একেকটা। তার মনে হল, কোন জীবন্ত প্রাণী নয়, প্রাণীর ওরকম চোখ থাকতে পারে না। সত্যি সত্যি দেখছে, না সে এখনও ঘুমিয়েই রয়েছে? আরেকটা দুঃস্বপ্ন দেখছে।

কেমন যেন ভূতুড়ে সবুজ রঙ চোখগুলোর, জ্বলছে। মনে হয় কাঁচের ওপাশে বৈদ্যুতিক বাতি বসানো। ট্র্যাফিকের সিগন্যাল বাতি যেন বলছে 'যাও'। যাওয়ার ইচ্ছেও হল মুসার। কিন্তু পা কথা শুনতে চাইছে না।

হঠাৎ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল পানিতে, বিরাট কিছু একটা রয়েছে। দুটো সবুজ গোলক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল মুসার দিকে।

চিৎকার করে উঠল সে। তবু দৌড় দিতে পারল না। চোখ দুটো যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে তাকে, মাটির সঙ্গে আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে পা। স্বপ্নে

যেরকম হয়, ইচ্ছে থাকলেও দৌড় দিতে পারে না মানুষ। সে-কারণেই তার মনে হচ্ছে, আবারও দুঃস্বপ্ন দেখছে।

পায়ের শব্দ শোনা গেল।

পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? চিৎকার করছ কেন?'

তারপর সে-ও দেখল ওগুলো। মুসার মতই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'চোখের মতই তো লাগছে,' রবিন বলল।

'কিন্তু এত বড়?' বলল মুসা। 'নাকি প্ল্যাঙ্কটন জমে আছে কে জানে!'

'পাগল নাকি?' কিশোর বলল। 'প্ল্যাঙ্কটন কখনও ওভাবে গোল হয়ে জমে সাঁতরাতে পারে না। ওগুলো চোখই। আরিব্বাপরে, কত বড় একেকটা!'

'যেন ম্যানহোলের ঢাকনা! ভূত না তো!' বলতে বলতে পিছিয়ে গেল মুসা। ফাঁদের ভেতর পড়ে যাবার ভয়েই বুঝি। 'হুঁশিয়ার! ব্যাটা আসছে!'

ঝটকা দিয়ে সামনে এগোল ওটা।

চমকে পিছিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

ওটার নড়াচড়ায় কয়েক টন পানি বেরিয়ে গেল ফাঁদের ভেতর থেকে। কালো কালো বিশাল কয়েকটা সাপ কিলবিল করে শূন্যে উঠল, আবার ঝপাত করে পড়ল পানিতে।

'জায়ান্ট স্কুইড!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ভাল করে দেখার জন্যে আগে বাড়ল। একটা সাপ তার দিকে এগোতেই তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল আবার।

ফোয়ারার মত ছিটকে এল তরল পদার্থ। ভিজে গেল তিন গোয়েন্দা।

'পানি ছিটিয়ে ভেজাচ্ছে,' মুসা বলল। 'ব্যাটা খেলছে আমাদের সঙ্গে।'

'পানি না, কালি,' রবিন বলল। 'সাবধান, চোখে যেন না লাগে।'

আরও দূরে সরে এল ওরা।

'এ-জন্যেই ওদেরকে বলে কালি-কলম মাছ,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' বিদ্যে ঝাড়ার সুযোগ পেয়ে গেছে রবিন। 'খুব ঘন কালি, লেখা যায়। একজন অভিযাত্রী একবার ওই কালি দিয়ে লগবুক লিখেছিল।'

'দাপাদাপি তো করছে খুব,' মুসা বলল। 'ঘাড়ের ওপর এসে না পড়ে।'

'মনে হয় না। ডাঙায় উঠতে পারে না ওরা।'

'সাগরে তো নামতে পারে?'

'কিভাবে নামতে হবে জানলে তো সহজেই পারত। কিন্তু যেমন বড় তেমনি বোকা। এরকম ফাঁদে নিশ্চয় আর কখনও পড়েনি। বেরোতে পারবে না।'

'ধরে নিয়ে যেতে পারলে হত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এরকম

একটা স্কুইডই চেয়েছেন মিস্টার লিসটার।

'কিন্তু এই জীবটা তিনি পাচ্ছেন না,' বলল রবিন। 'আশা করা যায়, স্কুনার নিয়ে ফেরার পথে ধরতে পারব একটা। হামবোল্ড কারেন্টে অনেক পাওয়া যায় এগুলো?'

'দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ঘেঁষে যে স্রোতটা এসেছে, তার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। মনে আছে তোমার ওই বইটার কথা, ছয়জন তরুণ বিজ্ঞানী বালসা গাছের ভেলায় চড়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন সাগরে? পেরু থেকে রওনা হয়েছিলেন তাঁরা, ওই স্রোতে ভেলা ভাসিয়ে দক্ষিণসাগরের দ্বীপে এসেছিলেন। অসংখ্য স্কুইড দেখেছিলেন তাঁরা। রাতের বেলা ভেসে উঠত ওগুলো, দিনে তলিয়ে যেত গভীর পানিতে।'

সবুজ আলো দুটোর উজ্জ্বলতা এখন কমছে বাড়ছে, যেন ভেতরের বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র ভোল্টেজ একবার বাড়াচ্ছে একবার কমাচ্ছে।

গায়ে কাঁটা দিল মুসার। 'খাইছে! ব্যাটা চোখের পাতা ফেলে না কেন একবারও?' গুহার ভেতরে অষ্টাপদী জীবটার সঙ্গে লড়াইয়ের কথা মনে পড়ল তার। ওটার চোখেও এরকম শয়তানী ছিল, তবে আরও ছোট চোখ, আর দেখতে মানুষের চোখের মত। এটার মত উজ্জ্বলতাও ছিল না ওগুলোয়। মাথা দোলাল সে, 'হুঁ, অক্টোপাস আর স্কুইডের মাঝে ফারাকটা এখন বুঝতে পারছি। মাঝে মাঝেই ভাবতাম তফাৎটা কোথায়?'

'অনেক তফাৎ,' রবিন বলল। 'এটার চোখ বাসনের মত, অক্টোপাসের চোখ থিমবলের মত। অক্টোপাসের শরীর একটা আস্ত ফোলা ব্যাগ, আর এটার হল টরপেডোর মত। চলেও ওরকম ভাবেই। শুঁড় দশটা। দুটো শুঁড় আরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি লম্বা। শুঁড়ে কাপের মত বসানো রয়েছে, তবে অক্টোপাসের মত সাকশন কাপ নয়, এগুলোতে রয়েছে ধারাল দাঁত। মারাত্মক। ইস্পাতের তার কেটে ফেলতে পারে।'

'যাহ্, বাড়িয়ে বলছ।'

'এক বর্ণও না। আমেরিকান মিউজিয়ম অভ নেচারাল হিস্টরির কয়েকজন বিজ্ঞানী একবার এক অভিযানে বেরিয়েছিলেন। বড় মাছ ধরার জন্যে তাঁরা ব্যবহার করছিলেন ইস্পাতের তার। সেই তার কেটে দিয়েছে স্কুইডের দাঁত। কাজেই সাবধান। অবশ্য যদি নিজেকে ইস্পাতের চেয়ে শক্ত মনে কর, তাহলে আলাদা কথা।'

ভোর এল। অন্ধকার তাড়ানর জন্যে উঠেপড়ে লাগল ধূসর আলো। দানবটাকে স্পষ্ট দেখা গেল এখন। পুরো ফাঁদটা জুড়ে রয়েছে। শরীরের জন্যে

শুঁড়ের জায়গা হচ্ছে না ভেতরে। পাথরের ওপর দিয়ে এসে শুকনোয় বিছিয়ে আছে ওগুলো।

ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে টর্পেডোর মত শরীরটা। কালো থেকে বাদামী, বাদামী থেকে তামাটে, তামাটে থেকে ফ্যাকাসে সাদা।

গোল চোখের ব্যাস একফুট। রাতের চেয়ে এখন আরও ভয়ঙ্কর লাগছে। ফসফরাসের সবুজ আলো মিলিয়ে গেছে এখন, চোখ দুটোকে লাগছে এখন কালো দুটো গর্তের মত, যেন যে কোন মুহূর্তে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে আতঙ্ককর কিছু। তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেদের দিকে। স্থির ওই চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেদেরকে বড় ক্ষুদ্র আর অসহায় মনে হল তিন গোয়েন্দার।

'প্রশান্ত মহাসাগরের দুঃস্বপ্ন!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'একেবারে মানানসই না।'

জোয়ার এখনও পুরোপুরি নামেনি। ফাঁদের মধ্যে পানি রয়েছে। আবার জোয়ার এলে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারবে স্কুইডটা। ততক্ষণ টিকতে পারলে হয়। আটকা পড়েছে পাথরের ফাঁদে। একেবারে নেমে যাবে পানি। রোদ উঠবে। তখন কি করবে? ভাবসাবে মনে হচ্ছে বিপদ এখনও বুঝতে পারেনি ওটা।

ফাঁদের ভেতরে পানি কুচকুচে কালো, স্কুইডের কালি মেশানো। শরীরের ভেতরের থলে বোঝাই করে পানি টানছে, তীব্র গতিতে ছুঁড়ে মারছে আবার, উল্টোদিকে ছুটে যেতে চাইছে রকেটের মত, পারছে না পাথরের দেয়ালের জন্যে। ঠেকে রয়েছে।

'আরিব্বাবারে, কত্তো বড়!' গাল ফুলিয়ে বলল মুসা। 'শরীরটাই বিশ ফুট হবে। শুঁড় আরও বিশ ফুট।'

'তবু এটাকে ছোটই বলা চলে,' রবিন বলল। 'বেয়াল্লিশ ফুট লম্বা শুঁড়ওয়ালা স্কুইডও ধরা পড়েছে। স্পার্ম তিমির সঙ্গে অনেক সময় লড়াই বাধে স্কুইডের। একবার ওরকম এক লড়াই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল একদল বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীর। লড়াইয়ে তিমিটা হেরে গিয়েছিল।'

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' মুসা বলল। 'এটাকে ধরে নিয়ে যেতে পারলে ভাল পয়সা মিলত। কিন্তু পারব না। হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হচ্ছে।'

জীবটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ ভাবছিল আর নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল কিশোর। বলল, 'এটাকে কাজে লাগাতে পারি আমরা। দড়ি বানাতে পারি।'

'দড়ি? হাহ্, পাগল হয়ে গেছ তুমি। এটা দিয়ে দড়ি বানাবে কি করে?'

'শুঁড়গুলো দিয়ে। ফালি করে কেটে নিলে খুব শক্ত দড়ি হবে, চামড়ার ফালির মত।'

ঘোঁৎ করে উঠল মুসা, বিশ্বাস করতে পারছে না।

'কেন পারব না?' কিশোরের কণ্ঠে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। 'বোয়াকনসট্রিকটর আর অ্যানাকোণ্ডার চামড়া দিয়ে যদি দড়ি হয় স্কুইডের শুঁড় দিয়ে কেন হবে না? মালয়েশিয়ায় অজগর দিয়েও দড়ি বানায় লোকে। ওগুলো এত টেকসই, আসবাবপত্র মোড়ানর কাজে ব্যবহার করে, লস অ্যাঞ্জেলেসের বড় বড় অনেক দোকানে দেখতে পাবে। আমার তো বিশ্বাস, এই শুঁড় দিয়ে সাপের দড়ির চেয়ে শক্ত দড়ি হবে।'

'বেশ, তা নাহয় হল, কিন্তু কাটতে যাচ্ছে কে? বললেই তো খসিয়ে দিয়ে দেবে না স্কুইড। আমি ওই শুঁড়ের ধারেকাছে যেতে চাই না। রেগে আগুন হয়ে শেষে আমাকে দিয়েই নাস্তাটা সেরে ফেলবেন মহামান্য কালির মহাজন।'

সূর্য উঠল। রোদ চড়তে লাগল। গরম সইতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠল দানবটা, রাগ বাড়ছে। মেরু অঞ্চলের ঠাণ্ডা পানি ওদের পছন্দ, হামবোল্ড স্রোতের কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে ভেসে চলে আসে বলে নিরক্ষীয় অঞ্চলের গরম টের পায় না। দিনের বেলা ওই স্রোতের মধ্যেই থাকে। রাতে আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা হলে স্রোত ছেড়ে উঠে আসে ওপরে, আলো ফোটার আগেই ডুবে যায় আবার। রোদ ভীষণ অপছন্দ।

কড়া রোদে অস্থির হয়ে অল্প পানিতে সাংঘাতিক দাপাদাপি শুরু করল ওটা। শুঁড় দিয়ে চাবুকের মত বাড়ি মারতে লাগল দেয়ালের বাইরে মাটিতে, ধারাল দাঁতের আঁচড়ে গভীর ক্ষত হয়ে গেল শক্ত প্রবাল পাথরে।

হঠাৎ এক লাফ দিয়ে উঠে গেল ছয় ফুট। চাবুকের মতই শাঁই শাঁই শুঁড় চালাল বাতাসে। লাফিয়ে সরে এল রবিন আর মুসা। কিশোর সরে সারতে পারল না। পাথরে হোঁচট খেয়ে গেল পড়ে।

শাঁ করে এসে তার কোমর জড়িয়ে ধরল একটা ভয়াবহ শুঁড়। নারকেল কাপড়ের পোশাক কেটে চামড়ায় বসে যেতে লাগল তীক্ষ্ণধার দাঁত।

বড় একটা পাথর দিয়ে শুঁড়টায় পাগলের মত বাড়ি মারতে শুরু করল মুসা। 'কুমালো! কুমালো!' বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল রবিন।

ধীরে ধীরে কিশোরকে মুখের কাছে টেনে নিচ্ছে প্রকাণ্ড শুঁড়টা। ঈগল-চঞ্চুর মত ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে বেরিয়ে পড়ল একসারি করাতে-দাঁত। দুই হাতে একটা পাথর আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছে কিশোর। পারছে না। টানের চোটে হাত ছুটে গেল পাথর থেকে। ধরল আরেকটা পাথর। হ্যাঁচকা টানে ওটা থেকেও তার হাত ছুটিয়ে নিল স্কুইডের শুঁড়।

তিন-হাতে পায়ে ভর দিয়ে আহত পা-টা টানতে টানতে তাঁবু থেকে বেরোল

কুমালো।

'কুমালো, জলদি!' চেঁচিয়ে বলল রবিন। তার ধারণা, স্কুইডকে ঠেকানর নিশ্চয় কোন উপায় জানে পলিনেশিয়ানরা।

পাথর দিয়ে বাড়ির পর বাড়ি মারছে মুসা। যেন রবারে লাগছে পাথর, কিছুই হচ্ছে না শুঁড়টার। শেষে পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কিশোরের দু'হাত চেপে ধরল। শুরু হল যেন স্কুইডে আর মানুষের দড়ি টানাটানি।

দু'জনে মিলেও থামাতে পারল না শুঁড়টাকে। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে স্কুইড। আর মাত্র কয়েক ফুট তফাতে রয়েছে অপেক্ষমাণ ঠোঁট।

'মুসা, খবরদার!' সাবধান করল রবিন। আরেকটা শুঁড় এগিয়ে আসছে মুসাকে ধরার জন্যে, সে দেখতে পায়নি। রবিনের চিৎকার শুনে লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে।

অবশেষে পৌঁছে গেল কুমালো। বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে ভাল পা-টায় ভর দিয়ে দাঁড়াল। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারল পাথরটা। পাথর আর বর্শা ছুঁড়ে মাছ মারায় ওস্তাদ পলিনেশিয়ানরা। হাতের নিশানা খুব ভাল। আহত, অসুস্থ অবস্থায়ও কুমালোর লক্ষ্য ফসকাল না। দুর্বল অবশ্যই, কিন্তু এই জরুরি মুহূর্তে কোথা থেকে যেন অসুরের বল এসে গেছে তার গায়ে।

উড়ে এসে পাথরটা ঢুকল দানবের ঠোঁটে, চোয়ালে এমন শক্ত হয়ে আটকে গেল, কিছুতেই খুলতে পারল না স্কুইড।

একমুখ পাথর নিয়ে মানুষ খাওয়ার আশা ছাড়তে বাধ্য হল কালির মহাজন। কিন্তু শুঁড়ের বাঁধন আলগা করল না। যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, আচ্ছামত শাস্তি দিয়ে ছাড়বে ব্যাটাদের।

'জলদি কর, রবিন, ওই লাকড়িটা দাও আমার হাতে!' চিৎকার করে বলল কুমালো।

ছুটে গিয়ে নারকেল কাণ্ডের একটা ফাড়া লাকড়ি এনে কুমালোর হাতে দিল রবিন।

'ধর আমাকে! নিয়ে যাও ওটার কাছে!'

কুমালোকে স্কুইডটার কাছে আসতে সাহায্য করল রবিন। পায়ের ব্যথার পরোয়াই করল না পলিনেশিয়ান। ধাঁ করে বাড়ি মারল স্কুইডের মাথায়, মগজ ভর্তা করে দেয়ার জন্যে।

যন্ত্রণায় ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল স্কুইডের শরীর। লাফ দিয়ে শুঁড়টা উঠে গেল ওপরে, ঢিল হয়ে গেল বাঁধন। ধপ করে মাটিতে খসে পড়ল কিশোর। ঝাড়া লেগে চিত হয়ে পড়েছে মুসা, আগেই।

মাটিতে আছড়াতে শুরু করল শুঁড়গুলো, মুমূর্ষু সাপের মত মোচড় খাচ্ছে। ধীরে ধীরে কমে এল নড়াচড়া, নিথর হয়ে গেল।

কিশোরকে তুলে বসাল রবিন আর মুসা। তার জখম পরীক্ষা করল। রক্তাক্ত শরীর। অনেক জায়গায় কেটেছে, রক্ত ঝরছে ওগুলো থেকে।

'ঠিকই আছি আমি,' বলল কিশোর। 'হাত-পা ভাঙেনি। কাটাও তেমন বেশি নয়, শুধু আঁচড় লেগেছে। কুমালোকে তোল। ওর অবস্থা কাহিল।'

কুমালোর দুই বগলের তলায় ক্রাচ হয়ে তাকে ধরে ধরে তাঁবুতে নিয়ে এল মুসা আর রবিন। একেবারে নেতিয়ে পড়ল বেচারা। সারাদিন পায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেল।

কুমালোকে ঘরে রেখে মরা দানবটার কাছে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। পাথরটা আটকে রয়েছে স্কুইডের ঠোঁটে। যে শুঁড়টা তাকে ধরেছিল সেটার দিকে চেয়ে শিউরে উঠল কিশোর। আতঙ্ক উত্তেজনায় দুর্বল হয়ে পড়েছে শরীর, মাথা ঘুরছে, ঘোলা দেখছে চোখে।

'এরকম একটা প্রাণীকে মেরে ফেললাম,' আফসোস করে বলল কিশোর। 'জ্যান্ত নিতে পারলে কাজ হত।'

'না মারলে তুমি বাঁচতে না এতক্ষণ,' মুসা বলল। 'তাছাড়া ভেলা বানাতে দড়ি দরকার। ভেলা না হলে বেঁচে ফিরতে পারব না আমরা এখান থেকে।'

'তা ঠিক। বসে থাকলে চলবে না। জোয়ার আসার আগে কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। নইলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এটাকে।'

চামড়া খুবই শক্ত। কয়েক ঘন্টা কঠোর পরিশ্রম করে শুঁড়গুলো আলাদা করল ওরা। টেনে নিয়ে গিয়ে পাথরের ওপর বিছিয়ে দিল রোদে শুকানর জন্যে।

'কাল কাটব,' কিশোর বলল।

জোয়ার এসেছে। ভেসে ওঠা লাশটাকে টানতে শুরু করেছে পানি।

'নিয়ে যাক, নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'না স্কুইডের মাংসও খাওয়া যায়? কেটে রাখব খানিকটা?'

'আমার মনে হয় না সুবিধে হবে,' রবিন বলল। 'পুবদেশীরা অবশ্য বাচ্চা স্কুইডের মাংস খুবই পছন্দ করে। তবে এই বুড়ো দাদাকে ওরাও গিলতে পারবে কিনা সন্দেহ। চিবানই যাবে না রবারের মত মাংস।'

'ভেসে যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস রাখতে হবে আমাদের,' বলল কিশোর। 'কাজে লাগবে।'

একটা পাথর তুলে নিয়ে গিয়ে স্কুইডের ঠোঁটে বাড়ি মারতে শুরু করল সে। পিটিয়ে ভেঙে ফেলল একটা অংশ। শক্ত এই জিনিসটা দেখতে অনেকটা কুড়ালের

মত, কুড়ালের ফলার মতই ধার। নারকেল কাণ্ডের একটা খাটো লাকড়ি নিয়ে হাতল বানাল কিশোর। শুঁড় থেকে সরু চামড়ার একটা ফালি কেটে হাতলের সঙ্গে বাঁধল ভাঙা ঠোঁটটা।

'দেখতে হয়ত তেমন সুন্দর না,' হাত ঘুরিয়ে বাতাসে কোপ মারল সে। 'তবে চমৎকার একটা কুড়াল পেয়ে গেলাম। ভেলা বানাতে খুব কাজ দেবে।'

ছয়

পরদিন জায়ান্ট স্কুইডের শুঁড় কেটে লম্বা লম্বা ফালি করল ওরা। চেঁছে ফেলে দিল চামড়ার ভেতরের মাংস। কড়া রোদে খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল চামড়া।

'ট্যান করার দরকার আছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'কয়েক বছর যদি রাখতে চাইতাম, তাহলে করতাম,' জবাব দিল কিশোর। 'আমাদের এত বেশি দিন রাখার দরকার নেই। কয়েক হপ্তায় নষ্ট না হলেই হল।'

'অদ্ভুত, না? স্কুইডের চামড়া দিয়ে দড়ি...হাহ্, হাহ্।'

'অদ্ভুত হবে কেন?' ভুরু নাচাল রবিন। 'অন্য জীবের মত এটাও তো জীব। কিসের চামড়া ব্যবহার করে না লোকে? ক্যাঙারু, ওয়ালাবি, মোষ, উটপাখি, হরিণ, গুঁইসাপ, অ্যালিগেটর, হাঙর, সীল, ওয়ালরাস, কোনটা বাদ দেয়? বিশ্বাস করবে, জংলী নরখাদকরা আজও মানুষের চামড়া দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বানায়?'

বিশ ফুট লম্বা চারটে ফালি জোড়া দিয়ে বড় একটা দড়ি হল, উপসাগরের তলায় পৌঁছেও আরও থাকে। দড়ির এক মাথায় নারকেল কাপড়ের থলে বেঁধে ডুব দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হল ওরা।

'আমিই আগে যাই,' মুসা বলল।

একহাতে পাথর আঁকড়ে আরেক হাতে ব্যাগ নিয়ে পানিতে নামল সে। ওপর থেকে কিশোর আর রবিন দেখল কাঁপা কাঁপা একটা ছায়া নেমে যাচ্ছে, নামার সময় পানিতে ঢেউ উঠেছে, সে জন্যেই ওরকম দেখা যাচ্ছে মুসাকে।

পা নিচের দিকে রাখতে কষ্ট হচ্ছে মুসার। ঠেলে উল্টে ফেলতে চাইছে পানি। শেষে দু'পা দিয়ে পাথরটা চেপে ধরল। এবার আর মাথা ওপরের দিকে রাখতে অসুবিধে হল না।

ভয়ঙ্কর চাপ পড়ছে দেহের ওপর। জড়িয়ে ধরে চেপে চ্যাপ্টা করে দিতে চাইছে যেন বিশাল কোন দৈত্য। এই চাপের মধ্যে ফুসফুসের বাতাস আটকে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে।

নিচে নেমে খামচি দিয়ে দিয়ে ঝিনুক তুলে ব্যাগে ভরতে লাগল। ঝিনুকের খোলা খসখসে, কাঁটা কাঁটাও রয়েছে কোন কোনটাতে। কুমালোর দস্তানা দুটো পরে আসা উচিত ছিল, ভাবল সে। খোঁচা লেগে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে আঙুল। যদি কাছাকাছি হাঙর থাকে, তাহলে বিপদ হবে। তবে ল্যাগুনের ভেতর এ-পর্যন্ত কোন হাঙর দেখেনি। কিন্তু বাইরে থেকে আসতে কতক্ষণ?

থলেতে অন্তত পনেরোটা ঝিনুক জায়গা হবে। একের পর এক তুলে ভরতে লাগল সে। গোনার অবকাশ নেই। প্রচণ্ড এই চাপের মধ্যে কতক্ষণ থাকতে পারবে? এখনই মনে হচ্ছে, আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে।

থলেটা ভরে ফেলে রেখে ওপরে উঠতে শুরু করল সে।

ওপরে ভাসলে হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে তুলল কিশোর আর রবিন। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে মুসা. শিস দেয়ার মত শব্দ বেরোচ্ছে নাকের ফুটো থেকে। শরীর মোচড়াচ্ছে যন্ত্রণায়। খিঁচ ধরেছে মাংসপেশিতে। ফুলে উঠেছে গলা আর হাতের রগ। থরথর করে কাঁপছে ম্যালেরিয়া রোগীর মত। এই কড়া রোদের মাঝেও শীত করছে।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রবিন আর কিশোর।

'অনেক বেশি থেকেছ নিচে,' কিশোর বলল। 'প্রায় দুই মিনিট। পলিনেশিয়ানদের কাছাকাছি। ওদের ওস্তাদ ডুবুরিরাও তিন মিনিটের বেশি পারে না।'

উঠে বসল মুসা। 'আমার কিছু হয়নি,' খসখসে কণ্ঠে বলল সে। 'ব্যাগটা তোল। দেখি, কি আছে।'

দড়ি টেনে থলেটা তুলে আনা হল। পানির ওপরে তোলার আগে ওটার তলা দু'হাত দিয়ে ধরল রবিন, যাতে ফেটে না যায়। সৈকতে ঢালা হল ঝিনুকগুলো। পনেরোটা। বড় বড়, কালো।

ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে তর সইছে না ওদের। একের পর এক ঝিনুক খুলে মুক্তা খুঁজল। একটাও পেল না।

নিরাশ দৃষ্টিতে উপসাগরের, কালো পানির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। 'আবার যেতে হবে, তাই না!'

'হবে। কতবার যে যাওয়া লাগে, কে জানে! ঠিক আছে, আমি এবার চেষ্টা করে দেখি,' বলল কিশোর।

'দস্তানা পরে নাও,' হাতের আঙুল দেখাল মুসা। 'দেখ, কি অবস্থা হয়েছে।'

কুমালোর দস্তানা জোড়া নিয়ে এল কিশোর। তারপর থলে আর পাথর নিয়ে নেমে পড়ল পানিতে। পা নিচে রাখার চেষ্টা করল না সে। মাথা নিচের দিকে করে

ঝিনুক তুলতে শুরু করল, পা দুটো ওপরে দুলছে সাগরের শ্যাওলার মত।

ঝিনুক ভরা শেষ করে ওপরে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে, চাপের সঙ্গে শরীর সইয়ে। কিন্তু তারপরেও তাকে যখন ডাঙায় টেনে তোলা হল, সটান চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরোতে শুরু করল নাক-কান-মুখ দিয়ে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

'আ-আমি...তোমার মত...' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'তোমার মত উভচর নই...'

আবার টেনে তোলা হল থলেটা।

ঝিনুক খুলতে শুরু করল তিনজনে। এক এক করে খুলে ফেলল বারোটা, কিছু নেই।

তেরো নম্বরটা খুলতে খুলতে মুসা বলল, 'আনলাকি থারটিন। এটাতে তো থাকবেই না।' বলেই দিল ছুরি ঢুকিয়ে। ডালা খুলে মাংসের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়েই স্থির হয়ে গেল। গোল গোল হয়ে গেছে চোখ, ঝুলে পড়েছে নিচের চোয়াল। দ্রুত হয়ে গেল নিঃশ্বাস।

'খাইছে! পেয়েছি!'

দু'আঙুলে টিপে ধরে জিনিসটা বের করে আনল মুসা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কারও মুখে কথা ফুটল না। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওটার দিকে।

'ইয়া আল্লাহ!' অবশেষে ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। 'এত দেখি ফুটবলের সমান!'

ফুটবলের সমান অবশ্যই নয়, তবে মারবেলের সমান। মিউজিয়মে মুক্তা দেখেছে ওরা, ওগুলোর কোনটাই এর অর্ধেক বড় নয়। চমৎকার আকৃতি। একদিকে কাত করে ধরলে হয়ে যায় সাদা, আরেক দিকে ধরলে মনে হয় স্বচ্ছ, আকাশ আর ল্যাগুনের রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়। পাথর নয়, যেন জীবন্ত।

কিশোরের হাতের তালুতে মুক্তাটা ফেলে দিল মুসা। আরও অবাক হল কিশোর। এত ভারি! তারমানে খুব ভাল জাতের মুক্তা। দু'আঙুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। সূক্ষ্মতম দাগও নেই।

আরেক হাত দিয়ে রোদ আড়াল করল কিশোর। তার পরেও জ্বলছে মুক্তাটা, তবে এখন আর সূর্যের মত নয়, চাঁদের মত।

আনমনে বিড়বিড় করল বিস্মিত রবিন, 'প্রফেসর দেখলেও চমকে যাবেন!'

'তারমানে তাঁর পরীক্ষা সফল হয়েছে,' মুসা বলল।

'নিশ্চয় হয়েছে। তবে তাঁকে দেখাতে নিয়ে যাওয়াটাই মুশকিল। হারিয়ে যেতে পারে। চুরি হতে পারে। পোনাপেতে গেলে ডেংগু ব্যাটা আমাদের কাছ

থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে, অবশ্য যদি কোনদিন যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, ঝুঁকি আছে,' হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'রত্নের মালিক হওয়ার এই এক অসুবিধে। সব সময় চিন্তা, কখন কি হয়ে যায়। চল, কুমালোকে দেখাই।'

তাঁবুর অন্ধকারেও মুক্তার আগুন নিভল না। কুমালোর চোখের সামনে জিনিসটা তুলে ধরল কিশোর। শিস দিয়ে উঠল পলিনেশিয়ান। 'এত সুন্দর জিন্দেগিতে দেখিনি। আমাদের এদিকে এতবড় মুক্ত পাওয়া যায় না। তবে অন্যখান থেকে এনে বীজ ছড়ালে যে হয়, এটা প্রমাণ করে দিলেন তোমাদের প্রফেসর। দেখি, মালাটা দাও তো। পানি আছে না?'

মালার পানিতে মুক্তাটা ফেলে দিল কুমালো। খুব দ্রুত তলিয়ে গেল ওটা। 'ভাল ওজন।'

'তোমার কাছেই থাক,' কিশোর বলল। 'আমরা নানারকম কাজ করি, হারিয়ে ফেলতে পারি। ওটা সঙ্গে রাখলে কোন কাজই করতে পারব না।'

'মাপ চাই ভাই! আমি পারব না। ওটার ভাবনায় ঘুমাতে পারব না সারারাত। তুমিই রাখ।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুক্তাটা নিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখল কিশোর। তবে রাখার আগে নারকেলের ছোবড়ায় ভালমত জড়িয়ে নিল, যাতে পকেট থেকে ফসকে পড়তে না পারে। মুক্তার উত্তাপ নেই, তবু তার মনে হল জ্বলন্ত একটা কয়লার টুকরো রয়েছে পকেটে, চামড়ায় ছ্যাঁকা দিচ্ছে। মুক্তা তো পেল না, রাতদিন সব সময়ের জন্যে একটা দুর্ভাবনার ডিপো জোগাড় করল যেন।

'যা হবার হবে,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল সে। 'চল, কাজে যাই। একটায় সন্তুষ্ট হবেন না প্রফেসর। আরও কয়েকটা লাগবে।'

দিনটা শেষ হওয়ার আগেই সেদিন আরও দুটো মুক্তা যোগ হল প্রথমটার সঙ্গে। দ্বিতীয়টা কিছু ছোট, তৃতীয়টা আরও বড়।

'তোমাদের আসা সার্থক হল,' বলল কুমালো। 'মুক্তা পেলে। নিশ্চিন্ত হলে এতদিনে।'

'নিশ্চিন্ত?' মুখ বাঁকাল কিশোর। 'দুশ্চিন্তার কারখানা তৈরি করলাম বরং। এগুলো প্রফেসরের হাতে তুলে দেয়ার আগে আর স্বস্তি নেই আমার কপালে।'

সে-রাতে কিশোর দেখল দুঃস্বপ্ন। দেখল, ওদের ভেলা উল্টে গেছে। গভীর পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে সে। তার প্যান্টটা কামড়ে ছিঁড়ে খুলে নিয়ে যাচ্ছে একটা হাঙর। হাঙরের মুখটা ডেংগুর মত। মুখে শয়তানী হাসি। হাঙরের আবার হাতও আছে, সেই হাতে তিনটে মুক্তা।

জেগে গেল সে। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। চট করে হাত চলে গেল প্যান্টের

পকেটে। না, হারায়নি, আছে মুক্তাগুলো।

সাত

ভেলা তৈরি শুরু হল। ল্যাগুনের দিকে ঢালু হয়ে আছে জায়গাটা। ইচ্ছে করেই এই স্থান নির্বাচন করেছে ওরা। চারজনকে বয়ে নেয়ার উপযোগী ভেলা বেশ ভারি হবে, বয়ে নিয়ে গিয়ে পানিতে নামাতে পারবে না। জায়গা ঢালু হলে ঠেলে নামাতে সুবিধে হবে।

তারপরেও বাড়িতে সতর্কতা গ্রহণ করল কিশোর। কয়েকটা কাণ্ডকে পানির সঙ্গে আড়াআড়ি করে রাখল ডাঙায়। ওগুলোর ওপর ভেলাটা তৈরি করে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে পানিতে। খুঁটি গেড়ে আটকে দিল রোলারগুলোকে, যাতে আপনাআপনি গড়িয়ে যেতে না পারে।

পনেরো থেকে বিশ ফুট লম্বা সাতটা কাণ্ড এনে রাখা হল রোলারের ওপর। লম্বাগুলো রাখা হল মাঝখানে, বেড়ে থাকা অংশটা গলুইয়ের কাজ করবে। পাশেরগুলোর মধ্যে যে কটা মাপে বড় হয়ে গেল, ছোট করে কেটে সমান করে ফেলা হল। খুব কাজ দিল কুড়ালটা, ওটা ছাড়া কাটতে পারত না।

চামড়ার ফিতে দিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা বাঁধা হল কাণ্ডগুলো।

বাঁধা শেষ করে সব দিক থেকে খুঁটিয়ে দেখল কতটা কি হয়েছে।

'জাহাজের মতই আকার,' বলল কিশোল 'রোদ থেকে বাঁচার জন্যে একটা কেবিন লাগবে। পালও দরকার।'

হেসে উঠল মুসা। 'কি দিয়ে বানাবে? প্রবাল পাথর?'

'হেস না হেস না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'হাঙরের চামড়া দিয়েই ঘরের চাল হয়ে যাবে। পালও।' হতাশ হয়ে পড়ল পরক্ষণে। 'কিন্তু পাল তুলতে হলে মাস্তুল চাই। কি দিয়ে বানাব? নারকেলের কাণ্ড বেশি ভারি। দাঁড় করানো যাবে না।'

'যাবে,' কিশোর বলল। 'পরিশ্রম করতে হবে আরকি।'

স্কুইডের ঠোঁটের কুড়াল আর ধারাল প্রবালের সাহায্যে কাণ্ড ফাড়তে লেগে গেল ওরা। অনেক ঘাম ঝরানর পর কাণ্ড কেটে বের করল আঠারো ফুট লম্বা একটা দণ্ড। ছুরি দিয়ে চেঁছে মসৃণ করতে লাগল।

তার পরেও খসখসে রয়েই গেল, সোজা হয়নি ঠিকমত। কিন্তু এটা পেয়েই খুশিতে নাচতে বাকি রাখল ছেলেরা।

ভেলার গলুইয়ের কাছে গর্ত করে ফেলল একটা। তাতে বসিয়ে দিল মাস্তুল।

কেবিন আর পাল বানানো যাবে পরেও। এখনই দ্বীপ ছাড়তে তৈরি নয় ওরা,

কাজেই ঘরটার প্রয়োজন আছে।

ভেলা বানাতে লেগেছে তিন দিন। রসদ জোগাড় করতে আরও সময় লাগল।

প্রথমেই জরুরি হল পানি। ডুবো-ঝর্নাটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, স্রোতের জোর নেই বললেই চলে। ঝিরঝির করে বেরোয় এখন। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখন ওগুলো তুলে জমিয়ে ফেলা উচিত। দিনের মধ্যে অসংখ্য বার পালা করে ডুব দিল তিনজনে। প্রতিবারেই তুলে আনল একমালা করে পানি। আগের মত মিষ্টি নেই আর, নোনা পানি মিশে যাচ্ছে, যদিও খুব সামান্য।

কুমালোর সঙ্গে পরামর্শ করল কিশোর। 'পানি বয়ে নিই কি করে? এখন তো পাথরের গর্তে জমিয়েছি। গর্তটা তো আর তুলে নেয়া যাবে না। আর মালাও মোটে একটা। একমালা পানিতে কিছুই হবে না।'

ভুরু কোঁচকাল কুমালো। 'হ্যাঁ, সমস্যাই। আমাদের জেলেরা ছাগলের চামড়া দিয়ে ব্যাগ বানিয়ে নেয়। একটা ডলফিন-টলফিন পেলেও চলত।'

'দেখা যাক ফাঁদে পড়ে কিনা। কিন্তু আপাতত সমস্যার সমাধান করি কিভাবে? পাথরের গর্তে পানি বেশিক্ষণ থাকবে না, রোদে উড়ে যাবে। ঢাকনা দিয়ে রাখলে থাকবে?'

'থাকবে। নারকেলের লাকড়ি গর্তের ওপরে সাজিয়ে তার ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখগে।' বলে ছুরি নিয়ে কাজ করতে লাগল কুমালো। ছেলেরা কাজ করেছে এ-ক'দিন, সে-ও বসে থাকেনি। দুটো ক্রাচ বানিয়ে ফেলেছে। এখন বানাচ্ছে ভেলার জন্যে দাঁড়। বলল, 'নারকেল দিয়ে কত কিছুই করলাম। ঘর বানালাম, কাপড় বানালাম, ভেলা বানালাম···পানি রাখার পাত্রও বানানো যায়। তবে খুব কঠিন হবে। একটা টুকরো কেটে খোড়ল করে নিতে হবে···'

'পারব!' তুড়ি বাজিয়ে চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'খোড়ল হয়ে আছে ওরকম কিছু একটা বেছে নিলেই তো পারি আমরা।'

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল কুমালো।

'অন্য দ্বীপটায়,' বলল কিশোর। 'কাল কয়েকটা বাঁশের টুকরো দেখে এলাম। নিশ্চয় ঝড়ে উপড়ে গিয়েছিল, অন্য দ্বীপ থেকে ঢেউয়ে ভেসে এসে ঠেকেছে···'

'তাহলে তো আর কোন ভাবনাই নেই। কতটা লম্বা?'

'আট-দশ ফুট।'

'ছয় ফুট করে কেটে নাওগে।'

কাটতে অসুবিধে হল না। তবে আরেকটা সমস্যা দেখা দিল। ফুটখানেক পর পরই বাঁশে একটা করে গাঁট, ওগুলো বন্ধ। ছিদ্র না করতে পারলে লাভ হবে না। করবে কি দিয়ে?

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল একটা তলোয়ার মাছ। নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে দিল চারজন মানুষকে। ফাঁদে ধরা পড়ল ওটা। চমৎকার মাংস, কয়েক দিনের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ওটার তলোয়ার তিন ফুট লম্বা। একটা বাঁশের লাঠির মাথায় তলোয়ারটা বেঁধে লম্বা করে নিয়ে বর্শা বানিয়ে ফেলল মুসা। বাঁশের গাঁট ছিদ্র করার কাজে লাগল সেটা।

সাংঘাতিক শক্ত তলোয়ার মাছের তলোয়ার। একবার একটা মাছ তলোয়ার দিয়ে পালাউ ল্যাগুনে একটা মোটর বোটের তলা ফুঁড়ে দিয়েছিল। শুধু তাই না, বোটের তলা ফুটো করে ধাতব পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢুকে গিয়েছিল ওটার চোখা তলোয়ারের মাথা।

ছয় ফুট লম্বা তিনটে বাঁশের বোতল তৈরি হয়ে গেল। পানি বয়ে নেয়ার আর ভাবনা নেই। বোতলগুলোতে পানি ভরে নিয়ে কাণ্ড-কাটা ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হল ওগুলোর মুখ।

'যাক, পানির অভাবে আর মরছি না,' বলল কিশোর।

ঢেউয়ে ভেসে এসে যে শুধু পাকা বাঁশ ঠেকেছে তাই না, চারাও জন্মাল বাঁশের। আগে থেকেই ছিল ওগুলো দ্বীপে। ঝড়ে উপড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ঝাড়টা। কিছু শেকড়-বাকড় রয়ে গিয়েছিল, হয়ত ওগুলো থেকেই চারা গজিয়েছে। দিনে প্রায় এক ফুট করে বাড়ছে ওগুলো। বাঁশের কোঁড় খুব ভাল তরকারি। নরম থাকতে থাকতেই ওগুলো কেটে নেয়া হল। ভেলায় করে পাড়ি জমানর সময় খাওয়া যাবে।

'বাহ্, এখন আমাদের সুদিন,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'যখন নামলাম, ছিল মরুভূমি। এখন দেখি সব রকমের খাবার জোগাতে আরম্ভ করেছে দ্বীপটা।'

রান্নার পাত্রও জোগাল ওদেরকে বাঁশ। ভেতরে পানি ভরে ফুটানো যায়। বাঁশটা পোড়ে না। শুধু তাই না, বাঁশের ভেতর ভরে খাবারও নেয়া যাবে।

তলোয়ার মাছের মাংস ফালি করে কেটে রোদে শুকাল ওরা। নোনাও করা যায়, কিন্তু পদ্ধতিটা জানে না ছেলেরা। কুমালো বলে দিল। সাগরের নোনা পানি এনে রেখে দিতে হবে পাথরের গর্তে। রোদে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে পানি। নিচে জমে থাকবে লবণের হালকা আস্তর। লবণও পাওয়া গেল, নোনাও করা গেল মাছের মাংস।

মুক্তার জন্যে ঝিনুক তুলেছে ওরা। কুমালোর দেখাদেখি ঝিনুকের মাংস খেতে আরম্ভ করেছে। স্বাদ না থাকুক, প্রোটিন তো পাওয়া যায়, জীবন বাঁচে। কিন্তু বড় বেশি পচনশীল। একটু রোদেই পচতে শুরু করে। অনেক কায়দা-টায়দা করে শুকিয়ে নিল কিছু ঝিনুকের মাংস। বাঁশে ভরে রাখল। সাগর পাড়ির সময়

নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে খাবে না।

সাগরের শ্যাওলা তুলেও শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হল খাবার হিসেবে।

'এই জিনিস কে খায়?' নাক কুঁচকাল রবিন। 'একেবারে শুকনো খড়।'

কুমালো জানাল, স্বাদ যা-ই হোক, ভিটামিন আছে। প্রাচ্যের লোকেরা নাকি বেশ পছন্দ করে।

ফিরে আসতে শুরু করেছে পাখিরা। ইতিমধ্যেই চলে এসেছে কিছু। তার মধ্যে রয়েছে 'ভাঁড়' নামে পরিচিত মেগাপড পাখি। ওড়ার গতি খুবই শ্লথ, পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতেও পারে না ভালমত। মানুষকেও ভয় করতে শেখেনি। দুটো পাথর নিয়ে ঠুকতে শুরু করল কুমালো। আজব কোন কারণে ওই শব্দ শুনে লাফাতে লাফাতে দৌড়ে এল পাখিটা।

সহজেই ওটাকে ধরে ফেলল সে। পালক ছাড়িয়ে, কেটে, আগুনে ঝলসে ওটাকে রেখে দেয়া হল ভেলায় খাবার জন্যে।

আঁচড়ানর শব্দে একরাতে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। কী, দেখার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সে। বিরাট একটা গোল পাথর বুকে হেঁটে চলেছে পানির দিকে। চমকে উঠল সে। প্রথমেই মনে হল, ভূত! চেঁচিয়ে উঠতে যাবে, এই সময় চিনে ফেলল, কচ্ছপ। সাগরের কাছিম। বিশাল। দু'শো পাউণ্ড খুব ভাল মাংসের ভাঁড়ার। নিশ্চয় ডিম পাড়ার জন্যে তীরে উঠেছিল, আঁচড়ের শব্দের ব্যাখ্যা এটাই।

এতগুলো মাংস ল্যাগুনে হারিয়ে যেতে দেয়া যায় না। দৌড় দিল মুসা। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল কাছিমের পিঠে। পাত্তাই দিল না জীবটা। আগের মতই গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে। পাথরের খাঁজে পা ঢুকিয়ে দিয়ে ওটাকে আটকানর চেষ্টা করল সে। টেনে সহজেই তার পা ছাড়িয়ে নিল ওটা।

লাফিয়ে পিঠ থেকে নেমে পড়ল মুসা। উল্টে ফেলার চেষ্টা করল ওটাকে। বেজায় ভারি। একার সাধ্যে কুলাল না। সাহায্যের জন্যে চিৎকার শুরু করল।

কিশোর আর রবিন বেরিয়ে এসে সাহায্য করার আগেই ল্যাগুনের পানিতে নেমে পড়ল কাছিমটা।

কিন্তু এত সহজে ছাড়ার পাত্র নয় মুসা। কাছিমের পিঠে চড়ে বসল। টেলিভিশনে দেখেছে, কিভাবে পলিনেশিয়ান ছেলেরা কাছিমের পিঠে চড়ে পানিতে ঘুরে বেড়ায়।

গলাটা যেন রাবারের তৈরি। তার ঠিক নিচে শক্ত খোলার কিনার আঁকড়ে ধরল সে। চিত হয়ে গিয়ে শরীরের ভার দিয়ে উল্টে ফেলার চেষ্টা করল ওটাকে।

ওল্টাল না কাছিমটা, তবে ডুবও দিতে পারল না। সাঁতরে চলল ওপর দিয়ে।

সোজা এগিয়ে চলেছে সরু চ্যানেলের দিকে, যেখান দিয়ে সাগরে বেরোনো যায়। দ্রুত ভাবনা চলেছে মুসার মাথায়। সাগরে বেরিয়ে গেলে আর কিছু করতে পারবে না। যা করার এখনই করতে হবে। কি করবে? পেছনের একটা পা চেপে ধরবে? তাহলে হয়ত সাঁতরাতে অসুবিধে হবে কাছিমের।

পাশে কাত হয়ে হাত বাড়িয়ে পেছনের ডান পা-টা চেপে ধরল সে। ধরে রাখল শক্ত করে যাতে নাড়তে না পারে কাছিমটা।

অন্য তিনটা পা ব্যবহার করছে ওটা। ফলে সামনের দিকে না এগিয়ে এক জায়গায় ঘুরতে শুরু করল কাছিম। মুখটা সৈকতের দিকে ফিরতেই পা ছেড়ে দিল মুসা। সঙ্গে সঙ্গে ওই পা ব্যবহার শুরু করল জীবটা। এগিয়ে চলেছে এখন সৈকতের দিকে।

রবিন আর কিশোরকে দেখতে পাচ্ছে মুসা, কুমালোকেও। হৈ চৈ শুনে বেরিয়েছে।

'দাঁড়াও, মাংস নিয়ে আসছি,' চেঁচিয়ে বলল গোয়েন্দা সহকারী।

কিন্তু সাগরের কাছিমও সহজে পরাস্ত হতে চাইল না। মুসাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার সব রকম চেষ্টা চালাল। একবার এদিকে ঘুরে যাচ্ছে, আরেকবার ওদিকে। বার বার পেছনের পা চেপে ধরে ওটাকে সঠিক দিকে এগোতে বাধ্য করছে মুসা। এরকম করতে গিয়ে একসময় হাত ছুটে গেল গলার কাছ থেকে। ব্যস, চোখের পলকে ডুব দিল কাছিম। এক ডুবে নেমে এল ছয়-সাত ফুট। গলা চেপে ধরে টেনে আবার ওটাকে ওপরে উঠতে বাধ্য করল মুসা।

সৈকতের ধারে চলে এল কাছিমটা। পানিতে নেমে মুসাকে সাহায্য করল রবিন আর কিশোর। কুমালোও করল, যতটা পারল। আরেকটু হলেই তার ভাল পা-টায় কামড়ে দিয়েছিল কাছিম। দাঁত বসাতে পারলে এক কামড়ে অনেকখানি মাংস তুলে ফেলত।

'রাখ, করছি ব্যবস্থা,' ছুরি বের করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল কাছিমটা। অনেক বয়েস হয়েছে। রবারের মত চামড়ায় ভাঁজ। মনে হচ্ছে যেন রেগে গিয়ে মাথা নাড়ছে একজন বুড়ো মানুষ।

'মের না, দাদাকে মের না।' বাধা দিল রবিন। 'জ্যান্ত রাখব ওটাকে। ভেলায় করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। তাজা মাংসের দরকার হলে তখন জবাই করতে পারব।'

'ঠিক,' একমত হল কুমালো। একটা কাঠি দিয়ে বালিতে খোঁচা মারছে। 'তবে ওটা দাদা নয়, দাদী। এই যে দেখ, ডিম পেড়ে রেখে গেছে।'

ফুটখানেক গভীর একটা গর্তে প্রায় একশো ডিম পেড়েছে কাছিমটা।

সবাই মিলে টেনেটুনে কাছিমটাকে ডাঙায় তুলল। তারপর ঠেলে চিত করে ফেলল। আর সোজাও হতে পারবে না, পালাতেও পারবে না।

হাসিমুখে ডিমগুলোর দিকে এগিয়ে গেল মুসা। একটা ডিম তুলে নিল। আরে, অবাক কাণ্ড! ভেবেছিল মুরগী কিংবা হাঁসের ডিমের খোসার মতই শক্ত হবে, তা নয়। নরম, রবারের বলের মত।

'ভাঙব কিভাবে?' কুমালোকে জিজ্ঞেস করল সে।

'দাঁত দিয়ে এক জায়গায় কেটে ফেল। কাটা জায়গা মুখে ল্যাগিয়ে চাপ দাও, ভেতরের জিনিস মুখে ঢুকে যাবে। কাঁচা খাওয়া যায়। তবে সিদ্ধ করে নিলে বেশি মজা লাগবে। এগুলোও নিয়ে যেতে পারব ভেলায় করে।'

দাদীমাকে তুলে এনে একটা নারকেল কাণ্ডের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধল ছেলেরা।

ভোর হল। আলোচনা করে একমত হল অভিযাত্রীরা, যথেষ্ট খাবার জোগাড় করা গেছে। এবার রওনা হওয়া যায়।

তাঁবুর ওপর থেকে হাঙরের চামড়াটা নামিয়ে দুই টকুরো করল ওরা। একটা দিয়ে পাল হবে, আরেকটা দিয়ে কুঁড়ের চালা।

পাল তোলার কাছি হিসেবে ব্যবহার করা হল স্কুইডের চামড়া। বাঁশ পেয়েছে, কাজেই পাল বানাতে অসুবিধে হল না।

কেবিনটা অতি সাধারণ। তিনটে বাঁশের টুকরো ফেড়ে ধনুকের মত বাঁকা করে আটকে দেয়া হল ভেলায়। ফাঁক ফাঁক করে বসানো হয়েছে ধনুক তিনটে। তার ওপর ছড়িয়ে দেয়া হল চামড়াটা। কোণাগুলো বেঁধে দেয়া হল চামড়ার দড়ি দিয়ে, যাতে বাতাসে উড়ে যেতে না পারে। নৌকার ছইয়ের মতই দেখতে হল জিনিসটা। পাঁচ ফুট চওড়া, তিন ফুট উঁচু। নিচু হওয়ায় সুবিধে, ঝড়ো বাতাসেও উড়িয়ে নেবে না সহজে। লম্বায় হয়েছে আট ফুট। চারজনের জায়গা হয়ে যাবে। আর যেহেতু সামনে পেছনে খোলা, গলুইয়ে চোখ রাখতেও অসুবিধে নেই।

ডিমগুলো সিদ্ধ করে নেয়া হল। তারপর দাদীমাকে ভেলায় তুলে মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা হল শক্ত করে, ছুটতে পারবে না।

যাবার জন্যে তৈরি সবাই। বিষণ্ন চোখে পরিত্যক্ত ঘরটার দিকে তাকাল ওরা, পুরো দুটো হপ্তা কাটিয়েছে এখানে। ফেলে যেতে এখন মায়া লাগছে। ভেলায় চড়ে সাগরে পাড়ি দেয়ার অনিশ্চয়তায় কাঁপছে বুক।

ঢেউ আর বাতাসের করুণার ওপর নির্ভর করতে হবে ওদের। যাওয়ার চেষ্টা করবে দক্ষিণে। কিন্তু সহজেই পথ ভুল করতে পারে। ঘুরে যেতে পারে উত্তর, পুব কিংবা পশ্চিমে। বাতাসের চাপ কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে ওদের পলকা পাল কে

জানে! আর দাঁড়ও তেমন মজবুত নয়। স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকবে?

চেঁচামেচি করে আর গান গেয়ে ভয় ভুলে থাকার চেষ্টা করল ওরা।

'ভেলাটার একটা নাম রাখা দরকার,' রবিন বলল। 'কি নাম, বলত?'

'কিশোর, তুমি বল,' মুসা বলল।

'আশা। কারণ এখন আশা ছাড়া আর কি করতে পারি আমরা।'

ল্যাগুনে ভেলা ভাসাল চার নাবিক। চড়ে বসল তাতে। দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলল চ্যানেলের দিকে।

'বাহ্, ভালই তো ভাসছে,' মন্দব্য করল কুমালো।

'নাকও সোজা রাখছে,' বলল কিশোর। নারকেল গাছের সরল মসৃণ কাণ্ডকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাল সে। বেশ সোজা হয়েছে। কাত হয়ে যাবার প্রবণতা নেই।

'নাহ্, সত্যিই ভাল হয়েছে,' দাঁড় বাইতে বাইতে বলল মুসা।

পাল নামিয়ে রাখা হয়েছে। চ্যানেল পেরোনর পর তারপর তোলা হবে। দাঁড় বেয়ে ভারি ভেলাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট পরিশ্রম হল চারজনের।

পনেরো মিনিট পর অবশেষে বের করে আনা হল ওটাকে। খোলা সাগরে বেরোনর আনন্দেই যেন ঢেউয়ের বুকে দুলে দুলে নাচতে আরম্ভ করল 'আশা'।

আট

যাত্রার প্রথম দু'দিন এত নির্বিঘ্নে কাটল, যাত্রা শুরুর আশঙ্কার আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রইল না অভিযাত্রীদের মাঝে।

বাতাসের গতি অপরিবর্তিত রইল, উত্তর-পুব দিক থেকে বইছে, ওরা চলেছে সোজা দক্ষিণে। এই গতি অব্যাহত রাখতে পারলে দিন কয়েকই পোনাপেতে পৌঁছে যাবে ওরা। আর কোন কারণে যদি দ্বীপটার কাছ থেকে সরেও আসে, তাহলেও ভাবনা নেই, স্টীমার রুটে গিয়ে পড়বে। মারশাল আইল্যাণ্ড থেকে কুসাই, ট্রাক, পোনাপে আর ইয়্যাপেতে জাহাজ চলাচল করে। কোন না কোন জাহাজের দেখা পাবেই। কারণ ওই পথ ধরে অনেক মাছধরা জাহাজও চলাচল করে।

দিনের বেলা সূর্য ওদের কম্পাস, রাতে তারা। দাঁড় দিয়ে হালের কাজ চালায়। পালা করে ডিউটি দেয়। ক্রোনোমিটার নেই, সময়ও নির্ধারণ করে সূর্য আর তারা দেখে।

প্রতিটি কাণ্ডের ফাঁক দিয়েই ছলকে ওঠে পানি, ফলে সারাক্ষণই কিছুটা ভেজা থাকতে হচ্ছে ওদেরকে। তবে গরমের মধ্যে ওই ভিজে থাকাটা বরং আরামদায়ক।

দিনের বেলা কড়া রোদ। অসুবিধে হয় না ওদের। সহ্য না হলে ঢুকে বসে থাকে ছইয়ের ভেতর।

বাঁশের বোতলে পানি ভরা আছে। নিচ থেকে ছলকে ওঠা সাগরের পানি সারাক্ষণ ভিজিয়ে রাখছে বাঁশগুলোকে, ফলে ভেতরের পানি বেশ ঠাণ্ডা থাকছে। খাবার দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। তবে ভাবনা নেই, দাদীমা আছে। আর তেমন ঠেকায় পড়লে মাছও ধরতে পারবে।

ভেলার আশেপাশে খেলে বেড়ায় ডলফিনের দল। শরীরের রঙ উজ্জ্বল নীল কিংবা সবুজ, পাখনার রঙ হলুদ—রোদ লাগলে সোনালিই মনে হয়। ক্যামেলিয়ন আর অক্টোপাসের মতই রঙ বদলাতে পারে ওরা। মাঝে মাঝেই হয়ে যায় চকচকে তামাটে। লাফালাফি করতে গিয়ে সেদিন ভেলায় এসে পড়ল একটা। আর নামতে পারল না। মৃত্যুর পর রঙ বদলে ধূসর-রূপালি হয়ে গেল, তার ওপর কালো কালো দাগ।

তিন দিনের দিন আশাকে পরীক্ষা করতে এল মস্ত এক তিমি। সোজা এগিয়ে এল ভেলার দিকে, থেকে থেকেই ফোঁস ফোঁস করে পানির ফোয়ারা ছিটাল মাথার ওপরের ফুটো দিয়ে। ভয়ে প্রায় দম আটকে বসে রইল অভিযাত্রীরা। ইচ্ছে করলেই ভেলার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে ষাটফুটি দানবটা।

'লেজের মাত্র একটা ঝাপটা,' বলল উদ্বিগ্ন রবিন। 'ব্যস, তারপরেই আশা একেবারে নিরাশা।'

ভেলাটাকে ঘিরে দু'বার চক্কর মারল তিমি। তারপর লেজটাকে খাড়া ওপরের দিকে তুলে দিল ডুব। লেজ ডুবে যাওয়ার সময় এত বেশি পানি ছিটাল, অভিযাত্রীদের মনে হল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল তাদের ওপর।

প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল পানিতে। ভীষণ কেঁপে উঠল ভেলা, দুলতে শুরু করল।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। গোড়ালির ওপরে পানি উঠে গেছে। 'এই গেলাম!'

তবে নৌকার তুলনায় একটা বিশেষ সুবিধে রয়েছে ভেলার। তলা নেই, কাজেই পানি জমা হয় না, ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল, কিছু নেমে গেল ফাঁক দিয়ে।

ভেলার নিচ দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে আবার ভুঁউস করে ভাসল তিমি, আরেকবার নাকানি-চোবানি খাওয়াল ভেলাটাকে। কাঁধের ধাক্কায় আরেকটু হলেই ছিঁড়ে ফেলেছিল পাশের একটা কাণ্ডের বাঁধন।

আরও কিছুক্ষণ অভিযাত্রীদের আশঙ্কার মধ্যে রেখে অবশেষে ডুবল তিমি, আর ভাসল না। দেখা দিল না আর একবারও।

তিমির কাঁধের ধাক্কায় ঢিল হয়ে গেছে কাণ্ডটার বাঁধন। তাড়াতাড়ি আবার সেটাকে শক্ত করল ওরা।

সেদিন সকাল থেকেই বাতাস পড়ে গেছে। ঝিরঝিরে বাতাসে পালের কোনা ছপাত ছপাত করে বাড়ি খাচ্ছে মাস্তুলের সঙ্গে। ঢেউ নেই। বাতাস না থাকায় দশগুণ বেশি হয়ে গেছে রোদের তেজ। সাগর যেন একটা মসৃণ চকচকে আয়না।

আনমনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করল কুমালো, 'ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। হঠাৎ এরকম বাতাস পড়ে যাওয়ার মানে বিপদ।'

কিন্তু আকাশে মেঘ নেই। শুধু পুবদিকে বহুদূরে কালো একটা স্তম্ভের মত দেখা যাচ্ছে, পানিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন আকাশে মাথা তুলে।

খানিক পরে উত্তরে দেখা দিল ওরকম আরেকটা।

'জলস্তম্ভ,' কুমালো বলল। 'প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকটায় খুব বেশি দেখা যায় ওগুলো।'

'বিপজ্জনক?' মুসা জানতে চাইল।

'কখনও কখনও,' জবাবটা দিল রবিন। 'ডাঙায় যেমন বালির ঘূর্ণি ওঠে, অনেকটা ওরকম। তবে পানিরগুলো অনেক বড়...,' উদ্বিগ্ন চোখে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'এই ছোট ছোটগুলো আগাম সঙ্কেত, বুঝিয়ে দিচ্ছে বড়টাও আসবে। টর্নেডোর মতই। বলা যায়, সাগরের টর্নেডো।'

'ডাঙার টর্নেডো তো ঘরবাড়িই উড়িয়ে নিয়ে যায়,' কিশোর বলল।

'যায়,' বলল কুমালো। 'সাগরেরগুলোও কম না। একটু পরেই দেখতে পাবে।' উত্তর-পূর্ব দিকে তাকিয়ে আছে সে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্যরাও তাকাল।

তাদের চোখের সামনেই জমে উঠল কালো মেঘ, তিন হাজার ফুট উঁচুতে। এমন ভাবে দোমড়াচ্ছে মোচড়াচ্ছে, যেন জীবন্ত এক দানব। ওটা থেকে ঝুলে রয়েছে লম্বা একটা লেজের মত।

পলিনেশিয়ানরা এর নাম দিয়েছে 'আকাশের দানব'। এ-সম্পর্কে অনেক কুসংস্কার আছে ওদের।

কালো জমাট বাঁধা মেঘটার মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুৎ।

'হারিক্যানের মত খারাপ নয় নিশ্চয়,' আশা করল মুসা।

'আরও বেশি খারাপও হতে পারে,' কুমালো বলল। 'তবে থাকে না বেশিক্ষণ। আর হারিক্যানের মত এত জায়গা জুড়ে আসে না। হারিক্যান আসে পাঁচ-ছয়শো মাইল জুড়ে, আর এটা বড়জোড় দু'তিন হাজার ফুট। তবে ছোট হলে হবে কি, ভয়ঙ্কর আঘাত হানতে পারে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব এরচে

হারিক্যান ভাল।'

কিছু একটা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। 'সরে যেতে পারি না আমরা? এখানে থেকে কি ওটার খাবলা খেয়ে মরব?' বলেই ছপাত করে দাঁড় ফেলল পানিতে।

'অযথা শক্তি খরচ কোরো না। কোন দিক দিয়ে যে যাবে কিছুই বলা যায় না। দাঁড় বেয়ে সরে বাঁচতে গিয়ে হয়ত আরও ভেতরেই পড়ব। চুপচাপ এখন বসে বসে শুধু আশা করা ছাড়া আর কিচ্ছু করার নেই।'

প্রতিমুহূর্তে লম্বা হচ্ছে দানবটার লেজ। এখন দেখে মনে হচ্ছে লম্বা শুঁড় বাড়িয়ে দিয়ে সাগর ছোঁয়ার চেষ্টা করছে কোন অতিকায় অক্টোপাস।

আশ্চর্য রকম স্তব্ধ হয়ে আছে বাতাস। নড়ে না চড়ে না, একদম স্থির। অথচ কানে আসছে ছুটন্ত বাতাসের ভয়ঙ্কর গর্জন।

শুঁড়টা সাগর ছুঁয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন উঠল ওখানকার পানিতে। শাঁ শাঁ করে শূন্যে উঠে যেতে লাগল পানি, ফোয়ারার মত।

ঘূর্ণি জেগেছে পানিতে। বাতাসের পাকের টানে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে পানি, মনে হচ্ছে, পানির মোটা একটা স্তম্ভ রচনা করছে। প্রচণ্ড বাতাস বইছে ওখানে, অথচ ভেলার কাছে একরত্তি নেই। একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না এখানে বাতাস।

ডাঙার টর্নেডোরও এই একই ধর্ম। একটা বাড়ি হয়ত উড়িয়ে নিয়ে গেল খড়কুটোর মত, ঠিক দশ ফুট দূরেই আরেকটা ঘর রইল একেবারে অক্ষত।

'আমাদের কাছে আসবে না,' বলল সে।

'হয়ত,' বলল বটে, তবে ততটা আশাবাদী হতে পারল না কুমালো।

'পাল নামিয়ে ফেলব?'

'লাভ হবে না। নিতে চাইলে নিয়ে যাবেই। নামিয়ে রাখলেও নেবে, উঠিয়ে রাখলেও নেবে।'

দানবটার দয়ার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে, এই ভাবনাটাই অস্বস্তিকর। কিছু একটা করতে পারলে এতটা খারাপ লাগত না। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। কিছুই করার নেই।

দেখার মত দৃশ্য। তিন হাজার ফুট উঁচু এক পানির স্তম্ভ। মাথাটা গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মেঘের মত, নিচটা শঙ্খ আকৃতির। মাঝখানে সরু একটা স্তম্ভ যোগাযোগ রক্ষা করেছে দুটোর।

'গতিবেগ দুশো মাইলের কম না!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। কিন্তু বাতাসের প্রচণ্ড গর্জনে ঢাকা পড়ে গেল তার কথা।

ঘুরে ঘুরে ছুটে আসছে স্তম্ভটা। একবার এদিকে সরে যাচ্ছে, একবার ওদিকে। কোনদিকে যাবে যেন মনস্থির করতে পারছে না।

রোদের মধ্যে উড়ছিল একটা গাংচিল। হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে ওটাকে ভেতরে নিয়ে গেল পানির স্তম্ভ, চোখের পলকে কোথায় যে হারিয়ে গেল ওটা, বোঝাই গেল না।

সরে যেতে যেতেও হঠাৎ গতিপথ বদল করে কাছে চলে এল দানবটা। একটানে যেন ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল ভেলার ছাউনি আর পাল। ডেকে উপুড় হয়ে পড়ে কাণ্ড আঁকড়ে ধরে রইল অভিযাত্রীরা।

মলিন হয়ে এল দিবালোক। চোখের সামনে শুধু পানি আর পানি। কানফাটা গর্জন। কানে আঙুল ঢোকাতে বাধ্য হল ওরা। বনবন করে ঘুরতে শুরু করেছে ভেলাটা।

হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে গেল দাদীমার বাঁধন। চোখের পলকে সাগরে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কাছিমটা।

চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল অভিযাত্রীরা।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল, বুঝতেই পারল না ওরা। হঠাৎ নিজেদেরকে আবিষ্কার করল পানির মাঝে। চারপাশে পানি, ওপরে পানি, নিচে পানি। মাথার ওপরে একটা হাঙরকে দেখতে পেল খাবি খাচ্ছে। তবে কি ডুবে গেছে ওরা?

হঠাৎ কাত হয়ে গেল ভেলাটা। মুহূর্ত পরে কিশোর দেখল, সে একা একটা কাণ্ড আঁকড়ে ধরে আছে, অন্যেরা নেই। ভেলাটাও নেই।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল, সাগরে ভাসছে সে। সরে যাচ্ছে দানবটা। কি ঘটেছিল বুঝতে পারল। ওদের ওপর সরাসরি এসে পড়েনি জলস্তম্ভ, পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যাবার সময় টান দিয়ে তুলে নিয়েছিল ভেলাটাকে। হাঙরটাকে আসলে সাগরের তলায় নয়, পানির স্তম্ভের মাঝে দেখতে পেয়েছে সে।

সাগরের পানি স্থির। দূরে সরে গেছে পানির স্তম্ভটা। একশো ফুট দূরে একটা বাদামী মাথা ভেসে উঠতে দেখা গেল। খানিক দূরে আরেকটা মাথা।

'কুমালোও! রবিইন!' চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর। 'মুসা কোথায়?'

'তোমার পেছনে,' জবাব দিল রবিন।

পেছনে ফিরে তাকাল কিশোর। চল্লিশ ফুট দূরে ভাসছে মুসা। আরেকটা কাণ্ড আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

কাছাকাছি হল চারজনে। দুটো কাণ্ডকে একসঙ্গে করে, ছেঁড়া দড়ির টুকরো যে ক'টা পাওয়া গেল, সেগুলো দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল।

তারপর, বাকি কাণ্ডগুলো পাওয়া যায় কিনা, খোঁজাখুঁজি শুরু করল।

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কুমালোও যোগ দিল। ভেলাটা যে জায়গায় ধ্বংস হয়েছে, সে জায়গাটা আন্দাজ করে নিয়ে চারপাশে তল্লাশি চালাল ওরা। কিন্তু আর একটা কাণ্ডও পাওয়া গেল না। কে জানে, হয়ত টেনে ওগুলোকে মাথার ওপরে তুলে নিয়ে চলে গেছে জলস্তম্ভ। দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলবে। মোট কথা, ওগুলো পাওয়ার আর কোন আশা নেই। যে দুটো পাওয়া গেছে, ওগুলোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

রোদ নেই আর এখন। মাথার ওপরে কালো মেঘ। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘন ঘন বাজ পড়তে শুরু করল। আকাশের দানব চলে গেছে, এবার আসবে বোধহয় ঝড়।

মেঘের মধ্যে যেন বোমা ফাটাতে শুরু করল বজ্র। নামল বৃষ্টি, মুষলধারে। তবে বেশিক্ষণ রইল না। জোরাল হল ওপরের বাতাস, উড়িয়ে নিয়ে গেল মেঘ।

বৃষ্টি থামলে আরও কিছুক্ষণ কাণ্ডগুলো খুঁজল অভিযাত্রীরা। পেল না। শেষে দুটো কাণ্ডের ওপর উঠেই কোনমতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চারজনের ভার বাইতে পারল না দুটো কাণ্ড, ডুবতে শুরু করল।

নেমে গেল মুসা। কাণ্ড ধরে ঝুলে রইল পানিতে। অন্যেরাও নেমে পড়ল। তার মত একই ভাবে ধরে ভেসে রইল। ঢেউ ভাঙছে মাথার ওপর। শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে। পানি ঢুকে যেতে চায় নাকের ভেতর।

'আশা' এখন 'নিরাশায়' পরিণত হয়েছে। বাঁশের বোতল আর খাবারগুলো গেছে। পাল নেই, দাঁড় নেই, ছাউনি নেই, এমনকি নারকেল কাপড়ের পোশাক-গুলোও নেই যে রোদ থেকে গায়ের চামড়া আর চোখ বাঁচাবে। দুটো মাত্র কাণ্ড, চারজনের ভর রাখতে পারে না, উঠে বসারও উপায় নেই। অস্ত্র বলতে আছে শুধু একটা করে ছুরি।

বার বার মুখ নামিয়ে পানির তলায় দেখছে রবিন। হাঙরের ভয় করছে। যে-কোন মুহূর্তে হাজির হয়ে যেতে পারে ওগুলো। মুখ তুলে পানির ওপরেও খুঁজছে হাঙরের পিঠের পাখা, দূর থেকে পানি কেটে আসছে কিনা দেখছে।

'তোমাদের কেমন লাগছে, জানি না,' বলল সে। 'আমার অবস্থা কাহিল।'

আহত পায়ের যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে হাসল কুমালো। বলল, 'এক কাজ কর। ভেলায় উঠে জিরিয়ে নাও খানিকক্ষণ। একজনের ভার সহজেই রাখতে পারবে এটা।'

কুমালোর কথামত দুই কাণ্ডের ভেলায় উঠে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। খুবই বেকায়দা অবস্থা, কিন্তু এটাকেই মনে হল এখন গদির বিছানা।

'অত ভাবনার কিছু নেই,' শান্তকণ্ঠে বলল কুমালো। 'এখনও বেঁচে রয়েছি আমরা। দুটো কাণ্ড আছে। চারটে প্যান্ট আছে। তিনটে ছুরি আছে। আর আছে তিনটে মুক্তো...'

চট করে পকেটের ওপর হাত বোলাল কিশোর। বলল, 'আছে।'

'বেশ। তাহলে ওগুলো জায়গামত পৌঁছে দেয়া এখন আমাদের দায়িত্ব। এক কাজ করতে হবে। ভেলায় উঠে একজন করে জিরাব আমরা। অন্য তিনজনে পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে এগোব। সোজা দক্ষিণে। ঠিক আছে?'

এতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হল না কারও কাছেই। তবু, চুপচাপ একজায়গায় ভেসে থেকে মরার চেয়ে কিছু করা ভাল। কুমালোর কথা মতই কাজ শুরু করল ওরা।

খুবই ধীর গতিতে আবার দক্ষিণে এগিয়ে চলল দুই কাণ্ডের 'আশা'।

নয়

পালা করে ভেলায় উঠে বিশ্রাম নেয় ওরা। শক্ত কাণ্ডের ওপর শুয়ে থাকা, মুখের ওপর ঢেউ ভেঙে পড়া, মোটেই আরামদায়ক নয়। ঘন্টাখানেক পর সাগরে নেমে বরং আরামই লাগে।

আবার অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কেটে ভেলায় উঠতে পারলে সেটাও খানিকটা স্বস্তি।

তবে যতই সময় কাটতে লাগল এই আরাম আর স্বস্তি কোনটাই থাকল না।

দিনটা তো কাটল যেমন তেমন, রাতটা বড় বেশি দীর্ঘ মনে হল। ঘুমানো অসম্ভব। সারাক্ষণ জেগে থাকা, সতর্ক থাকা, ঢেউ এসে নাকে ঢোকে কিনা সে খেয়াল রাখা, এক মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। তন্দ্রা এলে, সামান্য অসতর্ক হলেই নাকেমুখে ঢুকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চায় পানি।

তার ওপর রয়েছে জলজ জীবের ভয়। আতঙ্কিত করে রেখেছে ওদের। চেনা-অচেনা অদ্ভুত সব প্রাণী নিচ থেকে উঠে আসছে আজব ভেলাটাকে পরীক্ষা করে দেখতে। সাগরে এত প্রাণী আর কখনও দেখেনি ওরা।

সাগরে অবশ্য এত প্রাণীরই বাস। কিন্তু জাহাজে কিংবা নৌকায় থেকে সেগুলো খুব কমই দেখা যায়। ওপর থেকে বড়জোড় কিছু ডলফিন আর উড়ুক্কু মাছ, ব্যস। গভীর পানির জীবেরা দানবীয় জলযানের কাছে আসতেই ভয় পায়।

এমনকি দুই কাণ্ডের প্রায় ডুবো ডুবো ভেলার চেয়ে সাত কাণ্ডের ভাসমান ভেলাটাও অনেক বেশি ভয়াল ছিল ওগুলোর কাছে। এ দুটোকে নিজেদের মতই

কোন প্রাণী ভাবল বোধহয় মাছেরা, তাই দেখতে এল।

নিচে তাকালেই দেখা যায় অসংখ্য আলো। যেন ওপরের তারাজ্বলা আকাশের মতই নিচেও আরেকটা আকাশ রয়েছে।

বেশি দেখছে মুসা। 'ওই যে গেল একটা লণ্ঠন মাছ।...একটা তারাখেকো! ...খাইছে! ওটা কি?'

বিশাল দুটো চোখ অলস ভঙ্গিতে অনুসরণ করে চলেছে ভেলাটাকে। প্রায় এক ফুট ব্যাস, জ্বলছে, হলদে-সবুজ আলো।

'ওটা আমাদের পুরানো দোস্ত,' কিশোর বলল। 'জায়ান্ট স্কুইড।'

কেঁপে উঠল রবিন। 'ও দোস্ত হতে যাবে কেন! শুঁড় বাড়িয়ে ধরবে না তো ব্যাটা?'

'ধরতেই পারে,' মুসা বলল। 'থাক, এসব অলক্ষুণে কথা বল না। বল, ও খুব ভাল মানুষ, এখুনি চলে যাবে।' বলে ভেলায় ঠেলার জোর কিছুটা বাড়াল সে।

পেছনে পড়ল চোখ দুটো।

উদয় হল আরও বিচিত্র একটা জীব। স্কুইডের চোখের মতই অনেকটা, জ্বলন্ত, আরও অনেক বড়। ওটার ব্যাস আট ফুটের কম না। রূপালি আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভেলার একেবারে নিচে চলে এল ওটা। ছয় ফুট নিচ দিয়ে অনুসরণ করে চলল। মস্ত এক পূর্ণিমার চাঁদ যেন।

বোবা হয়ে গেছে যেন ছেলেরা। মুসার বাহুতে হাত রাখল কুমালো। কাঁপছে মুসা। অন্য দু'জনের অবস্থাও ভাল নয়। চোখই যার এতবড়, সেই দানবটা কত বড়!

'চোখ নয় ওটা,' কুমালো বলল। 'ওটা চন্দ্র মাছ। চাঁদের মতই গোল আর জ্বলে তো, সে-জন্যে ওই নাম।'

'গোল মাছ?' মুসা বলল। 'যাহ্, বানিয়ে বলছ, আমরা যাতে ভয় না পাই।'

'না, বানিয়ে বলছি না। মাথাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা।'

'তাহলে বাকি শরীরটা কোথায়?'

'বাকি কোন শরীর নেই। মাথা ছাড়া আর কিছু নেই ওটার। সে-জন্যেই অনেকে বলে মাথা মাছ। আরও একটা নাম আছে ওটার, সূর্য মাছ। দিনের বেলা প্রায়ই ভেসে থেকে রোদ পোয়ায় তো।'

'মাথা ছাড়া আর কিছু নেই?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'থাকে, ছোট বেলায়। লেজ। ধীরে ধীরে খসে যায় ব্যাঙের পোনার মত। আসলে মাথা ঠিক নয় ওটা, পুরো শরীরটাই। ওটার ভেতরেই রয়েছে ওর পেট আর শরীরের অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সাঁতার কাটার জন্যে পাখনাও আছে।'

'বেশ বড়। ওজন নিশ্চয় টনখানেকের কম না।'

'হ্যা। আরও বড় হয়। মাঝে মাঝে ক্যানুর তলা ঠেকে যায় পানির নিচে ভেসে থাকা মাথা মাছের গায়ে। মনে হয় ডুবো চরায় লেগেছে।'

কয়েক মিনিট ধরে ভেলাটাকে অনুসরণ করল সাগরের চাঁদ। ওটা থাকতে থাকতেই এল চারটে সাপের মত জীব। রক্ত ঠাণ্ডা করে দেয়া চেহারা। ওগুলোর আলো নেই, চাঁদ মাছের আলোয় দেখা গেল কুৎসিত ভঙ্গিতে শরীর মোচড়াচ্ছে। আট-দশ ফুট লম্বা, মানুষের উরুর সমান মোটা।

'সাপ নাকিরে বাবা?' মুসা বলল।

'না, মোরে,' ছুরি বের করল কুমালো। 'এক ধরনের বান মাছ। এ-ব্যাটাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার। সব খায়। মানুষের মাংসেও অরুচি নেই।'

'হারামী জীব!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ,' রবিন বলল। 'বইয়ে পড়েছি, প্রাচীন রোমানরা নাকি মোরে ইল পুষত, এক পুকুরে অনেকগুলো। রোজ সকালে ওগুলোর নাস্তার জন্যে জ্যান্ত মানুষ ফেলে দিত পুকুরে। যুদ্ধবন্দী কিংবা গোলামদের।'

হাতে ছুরি নিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে পানির নিচে তাকিয়ে আছে কুমালো। 'আমরা ওদেরকে বলি ক্যামিচিক। অর্থাৎ ভয়ানক জীব। ব্যাটারা উভচর। গাছ বেয়ে ওপরে উঠে সাপের মত ওত পেতে থাকে। নিচে দিয়ে শিকার গেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। পোনাপেতে একবার একজনকে কামড়ে দিয়েছিল একটা মোরে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেয়ার পরেও বাঁচেনি লোকটা, দু'দিন পর মারা যায়।'

ভেলার নিচ দিয়ে কয়েকবার আসা-যাওয়া করল ওগুলো। কুমালোর মত মুসাও ছুরি বের করে তৈরি হয়ে আছে।

'ভেলায় এসে উঠবে না তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'উঠতেও পারে। অনেক সময় নৌকায়ই উঠে পড়ে চুরি করে। ওঠার সময় লেজটাকে কাজে লাগায় ওরা। দুনিয়ার বেশির ভাগ প্রাণীই আক্রান্ত না হলে হামলা করে না। কিন্তু মোরের ওসব ভদ্রতা নেই। অযথাই লাগতে আসে। এক ইঞ্চি লম্বা দাঁতের সারি, ছুরির মাথার মত চোখা আর ধারাল।'

ছুরির বাঁট শক্ত করে চেপে ধরল মুসা। 'আসুক। প্রথম যে ব্যাটা আসবে, মুণ্ড কেটে ফেলব।'

'তাতে আরও খারাপ হবে। রক্তের গন্ধে হাজির হয়ে যাবে হাঙর। তাছাড়া ঘাড়ের চামড়া সাংঘাতিক শক্ত ওগুলোর। সহজে কাটবে না। তবে লেজের চামড়া নরম।'

চলে গেল একটা বান। খানিক পরেই আলতো ছোঁয়া লাগল মুসার পিঠে। সে

ঘাড় ফেরানর আগেই ছুরির বাঁট দিয়ে গায়ের জোরে বাড়ি মারল কুমালো।

'যাক,' বলল সে। 'এই একটা আর জ্বালাতে আসবে না।'

মুহূর্ত পরেই এল আরেকটা। মুসার প্রায় মুখে লেজ বুলিয়ে গেল। তার দিকেই বানগুলোর নজর কেন, বোঝা গেল না। পিঁপড়েরাও তার প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়। আমাজানের জঙ্গল আর আফ্রিকাতেও সেই প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখন শুরু করেছে বান মাছগুলো। কাণ্ডের ওপর দিয়ে সাপের মত গড়িয়ে এল লেজ, আলতো ছোঁয়া লাগল মুসার মুখে। তারপরই উঠে এল মোটা শরীরটা, কুৎসিত মুখটা এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে। হাঁ করা চোয়ালে তীক্ষ্ণ দাঁত। তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কুমালোর মতই ছুরি দিয়ে লেজে বাড়ি মারল মুসা। যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল বানের শরীর, লাফ দিয়ে নেমে গেল পানিতে।

চন্দ্র মাছের কাছে আর কোন সর্পিল ছায়াকে চোখে পড়ল না।

দুর্বল লাগছে মুসার। বান মাছগুলো আতঙ্কিত করে দিয়েছে তাকে, কাহিল লাগছে সে-জন্যেই। ভেলায় উঠে শুয়ে পড়ল। ঘুম এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু পরমুহূর্তেই জেগে উঠল নাকে-মুখে পানি ঢুকে যাওয়ায়।

সবাই বুঝল, এখন ঘুমাতে না পারলে হয়ত মাথাই খারাপ হয়ে যাবে মুসার।

'ওঠ, উঠে বস,' কুমালো বলল। 'ঘোর। আমার কাঁধে মাথা রাখ।...হ্যাঁ, ঘুমাও এবার।'

তর্ক করতেও ইচ্ছে হল না মুসার। কুমালোর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঢেউ এখন আর তার নাক ছুঁতে পারছে না।

বাতাস বাড়ছে। শীত করতে লাগল ওদের। ভোরের দিকে অসহ্য হয়ে উঠল ঠাণ্ডা। দিগন্তে সূর্যের আগমনে তাই খুশি হল খুব। তবে ঘন্টাখানেকও লাগল না, দূর হয়ে গেল খুশি। ভাবল, এর চেয়ে ঠাণ্ডা রাতই আরামের ছিল।

ঘুমিয়ে বেশ ঝরঝরে হয়েছে মুসার শরীর। ফলে ক্ষুধাও লেগেছে, পিপাসাও। অন্যেরা ঘুমাতে পারেনি, ফলে এই অসুবিধেটা দেখা দেয়নি এখনও।

তবে ক্ষুধার কথাটা কাউকে বলল না সে।

নিজের হাতের তালু দেখল, অন্যদেরগুলোও দেখল। নোনা পানিতে ভিজে কুঁচকে গেছে চামড়া।

'মরেছি,' বলল মুসা। 'চামড়ার যা অবস্থা, আর বেশিক্ষণ এই অবস্থা চললে খসে যাবে।' রসিকতা করল, 'দাও দাও, কোল্ড ক্রীমের কৌটাটা দাও।'

অন্যেরা ক্লান্ত। কাজেই ভেলার বড় মোটরটা হল এখন মুসা। জোরে জোরে ঠেলতে লাগল। 'আশা' তাদেরকে নিরাশ করবে বলেই মনে হচ্ছে।

বেলা যতই বাড়ল, বাড়ল ক্ষুধা আর পিপাসা, সবারই। পানিতে থাকায়

একটা উপকার হয়েছে, রোমকূপ দিয়ে আর্দ্রতা ঢুকছে, ফলে দ্রুত পানিশূন্যতার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে শরীর। ডাঙায় থাকলে আরও অনেক আগেই প্রচণ্ড পিপাসা পেত। এখানে ধীরে ধীরে আসছে পিপাসা, কিন্তু আসছে তো। রাত নাগাদ এত বেড়ে গেল, এখন যদি কেউ বলে এক গেলাস পরিষ্কার পানি দেবে, বিনিময়ে মুক্তা তিনটে দিয়ে দিতে হবে, সামান্যতম দ্বিধা করবে না কিশোর।

এই রাতে নিজেকে বালিস বানানর প্রস্তাব দিল মুসা। সবাই তাঁর কাঁধে পালা করে মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিক। প্রথমে ঘুমাল রবিন। তারপর কুমালো। সব শেষে কিশোর। শেষ দিকে নিজের চোখও আর খুলে রাখতে পারল না মুসা। কুমালো আর রবিন ভেলা ঠেলছে। কাণ্ড ধরে ভেসে রয়েছে সে। কাঁধের ওপর কিশোরের মাথা।

ঘুমিয়ে পড়ল মুসা। প্রায় একই সঙ্গে চমকে জেগে উঠল সে আর কিশোর। দু'জনেরই নাকেমুখে পানি ঢুকে গেছে। কাশতে আরম্ভ করল।

পরদিন সকালে কোথা থেকে এসে হাজির হল একঝাঁক বোনিটো। ভেলার সঙ্গে সঙ্গে চলল। বার বার ছোঁ মারল অভিযাত্রীরা, কিন্তু একটাকেও ধরতে পারল না।

'বড়শির সুতো বানাতে পারলে কাজ হত,' কাণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলল কুমালো। 'নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তো বানানো যায়। কাণ্ডের আঁশ দিয়েও বোধহয় হবে।'

দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করল ওরা আঁশ বার করতে। জোড়া দিয়ে, পাকিয়ে তৈরি করে ফেলল একটা সুতো, যদিও মাত্র পাঁচ ফুট লম্বা। তবে শক্ত। বাকল কেটে একটা বড়শি বানাল কুমালো। সুতোর মাথায় বাঁধল সেটা। কিন্তু টোপ নেই।

টোপ ছাড়াই বড়শিটাকে পানিতে ঝুলিয়ে রাখল ওরা। আশা করছে, যদি কোন একটা বোকা বোনিটো খাবার মনে করে গিলে ফেলে?

চলে গেল বোনিটোর ঝাঁক। অন্যান্য মাছ এল গেল, বড়শির দিকে নজর দিল না কেউ।

আরেকটা ভয়ঙ্কর রাত পেরোল, কাটল দুঃসহ দিন। নোনা পানিতে ভিজে আর কাণ্ডের সঙ্গে ঘষা লেগে ঘা দেখা দিতে লাগল শরীরে। পা ফুলে যাচ্ছে। একধরনের ঝিনঝিনে অনুভূতি। লাল লাল দাগ পড়ছে, কোথাও কোথাও ফোসকা।

'এই অবস্থাকে বলে ইমারসন ফুট,' কিশোর বলল। 'এরপর দেখা দেবে ফোঁড়া। নোনা পানির ফোঁড়া।'

রোদে পুড়ে গেছে চামড়া। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে চোখ, ভীষণ জ্বালা করছে।

পানির অভাবে শুকিয়ে ঠোঁট ফেটে গেছে। ফুলে উঠেছে জিভ, মুখগহ্বর ভরে দিয়েছে যেন। কথা বলতে অসুবিধে হয়। নোনাপানি দিয়েই গরগরা করল মুসা, গিলেও ফেলল খানিকটা।

'সাবধান,' হুঁশিয়ার করল কিশোর। 'পেটে খুব সামান্য গেলে ক্ষতি নেই। কিন্তু একবার খাওয়া শুরু করলে আর লোভ সামলাতে পারবে না।'

'শরীরের লবণ দরকার হয়,' প্রতিবাদের সুরে বলল মুসা। 'খেলে ক্ষতিটা কি বুঝি না।'

'বেশি খেলে প্রথমে জ্ঞান হারাবে,' রবিন বলল। 'তারপর দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে। হুঁশ ফিরে পাবে, তবে মাথায় গণ্ডগোল হয়ে যাবে। কিংবা একেবারেই আর ফিরবে না।'

'তাতেই বা কি?' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'এমনিতেই পাগল হব, কিংবা মরব। তারচে খেয়েই মরি।' কপালে হাত রেখে সামনে তাকাল সে। 'পাগল বোধহয় হতেই শুরু করেছি। নানারকম গোলমেলে জিনিস দেখছি।'

'কি দেখছ?'

'মেঘ করেছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ওই তো,' দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখাল সে। 'আমি জানি, চোখের ভুল…'

'না না, ভুল নয়!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। সত্যি বৃষ্টি হচ্ছে, আধ মাইল দূরেও হবে না। 'চল চল, জলদি চল!'

চারজনে মিলে ঠেলতে শুরু করল ভেলাটাকে। দ্রুত সাঁতরে চলল মেঘের দিকে।

কিন্তু হতাশ হতে হল ওদেরকে। ওরাও পৌঁছে সারল, বৃষ্টিও থেমে গেল। হেসে উঠল রোদ, যেন ব্যঙ্গ করল অভিযাত্রীদের।

'দেখ দেখ, ওই যে আরেকখানে হচ্ছে!' রবিন দেখাল এবার। সিকি মাইল পশ্চিমে। কাছেই, ওটাতে সময়মত পৌঁছানো যাবে এই আশায় ভেলা ঠেলে নিয়ে চলল ওরা। হালকা বাতাসে ভেসে এসেছে একটুকরো কালো মেঘ, ওটা থেকেই বৃষ্টি পড়ছে।

সাঁতরে চলেছে ওরা। মেঘটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস। ওরা যতই জোরে সাঁতরায়, বাতাসও ততই জোরে বয়। যেন খেলা জুড়েছে ওদের সঙ্গে। ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, কিন্তু বাতাসের ক্লান্তি নেই। তবু আশা ছাড়তে পারল না ওরা।

অবশেষে ঝরে ঝরে শেষ হয়ে গেল মেঘটা। রোদ দেখে বিশ্বাস করার উপায়

নেই কয়েক মিনিট আগেও ঝেঁপে বৃষ্টি হচ্ছিল ওখানে।

'কি মনে হয়?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'সবই কি আমাদের কল্পনা?'

'নিশ্চয় না,' বলল কিশোর। 'আমরা সবাই দেখেছি, তাই না?' কেউ জবাব দিল না দেখে কুমালোকে বলল, 'কথা বলছ না কেন? দেখিনি?'

'মনে তো হল...,' দ্বিধা করছে কুমালো। 'আসলে, কোন কিছুকেই আর বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'এই যে আরেক কাণ্ড, এটাকেও বিশ্বাস করতে পারছি না!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'অথচ হাতে লাগছে। ধরতেও পারছি।' বড়শিটা বেঁধে রাখা হয়েছে কাণ্ডের সঙ্গে, তাতে আটকা পড়েছে একটা অ্যালবাকোর মাছ। মাছটা তুলে দেখাল সে। কালো, চকচকে শরীর। বেশি বড় না, মাত্র দেড় ফুট। তবে বেশ মোটাসোটা, ভাল মাংস।

ছুরি নিয়ে ক্ষুধার্ত হায়েনার মত মাছটাকে আক্রমণ করল ওরা। দেখতে দেখতে কাঁটাগুলো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। ছোট একটা টুকরো সরিয়ে রাখল কুমালো, বড়শির টোপের জন্যে।

অনেকটা সুস্থ বোধ করল ওরা, পিপাসাও কমল সামান্য। অ্যালবাকোরের রসাল মাংসে পানি আছে। তবে একেকজনের ভাগে যেটুকু পানি পড়ল, বড় এক চামচের বেশি না।

বড়শিতে টোপ দেয়ায় তাড়াতাড়িই আকৃষ্ট হল শিকার, একটা বাচ্চা করাত মাছ। ধরা পড়ার পর আর রেহাই নেই, তুলে ওটাকে যত দ্রুত পারল সাবাড় করে দেয়া হল, টোপের জন্যে খানিকটা মাংস রেখে।

শিশু করাত যেখানে আছে, ধাড়িও থাকতে পারে। একটু পরেই দেখা গেল ওটাকে। আলোড়ন তুলল পানিতে।

'ওই দেখ!' কুমালোকে দেখাল মুসা।

ছোট মাছের ঝাঁককে আক্রমণ করেছে বিশাল এক করাত মাছ। ষোলো ফুটের কম হবে না। করাত দিয়ে দু'টুকরো করে ফেলছে মাছগুলোকে, তারপর গপাগপ গিলছে। মারাত্মক ওদের করাত। তিমিকেও ছেড়ে কথা কয় না। অনেক সময় হারেও তিমি।

বিশাল করাতের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করল ওরা। কাটা মাছের টুকরো ভেসে উঠছে পানিতে। নিয়ে আসছে ওগুলো মুসা আর কুমালো। জমাচ্ছে ভেলার ওপর।

রক্তের গন্ধে এসে হাজির হল মস্ত এক টাইগার শার্ক। কাটা মাছগুলো খেতে শুরু করল।

এটা মোটেই পছন্দ হল না করাত মাছের। সোজা গিয়ে করাত চালিয়ে দিল হাঙরের গায়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোল হাঙরের। পালাবে না পাল্টা আক্রমণ করবে ঠিক করতে পারছে না যেন।

'দশ মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে যাবে হাঙরের পাল,' শঙ্কিত হয়ে বলল কুমালো। 'চল, এখানে থাকা আর নিরাপদ না।'

ভেলা ঠেলে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে এল ওরা। পেছনে তাকিয়ে দেখল, খানিক আগে যেখানে ছিল ওরা সেখানকার পানি যেন টগবগ করে ফুটছে। অসংখ্য হাঙর এসে হাজির হয়েছে। রক্তাক্ত হয়ে গেছে পানি।

আরও দূরে সরে এল ওরা। তারপর কাঁচা মাছ খাওয়ায় মন দিল।

'বড্ড উপকার করল করাতটা,' চিবাতে চিবাতে বলল মুসা। 'নাহ্, ততটা দুর্ভাগা নই আমরা। কপাল মাঝে মাঝেই ভাল হয়ে যায়।'

কিন্তু তারপর যতই সময় গেল কপাল আবার খারাপ হতে লাগল। মাছ আর চোখেই পড়ে না এখন। শুধু জেলিফিশ। ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে মাইলের পর মাইল জুড়ে। খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে ওগুলোর ভেতর দিয়ে। জেলিফিশের শুঁড়ে মারাত্মক বিষ। বড় বড় মাছকেও অবশ করে ফেলে।

জেলিফিশের সব চেয়ে খারাপ প্রজাতিগুলোর একটা 'সী ব্লাবার'। লাল রঙ, সাত ফুট পুরু, একেকটা শুঁড় একশো ফুট লম্বা। সাঁতার কাটার সময় সাঁতারুর শরীরে অনেক সময় জড়িয়ে যায় ওই শুঁড়, বিষাক্ত হুল ফুটতে থাকে চামড়ায়। তখন অন্যের সাহায্য ছাড়া ওই শুঁড় খোলা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

কম-বেশি হুল অভিযাত্রীদের সবার শরীরেই ফুটল। জেলিফিশের এলাকা থেকে সরে আসার পরেও অনেকক্ষণ থাকল ওই হুলের জ্বালা। আশার গায়ে লেগে আছে থিকথিকে জেলির মত জিনিস, জেলিফিশের গা থেকে লেগেছে, ওগুলোও বিষাক্ত।

পরদিন দেখা গেল একটা পাখি। মৃত্যুদ্বীপ থেকে আসার পর এই প্রথম পাখি চোখে পড়ল ওদের। কিছুক্ষণ পর উড়ে এল আরও অনেক পাখি, নডি, বুবি। পাক খেয়ে খেয়ে উড়তে লাগল ভেলাটাকে ঘিরে।

'এরমানে,' কুমালো বলল। 'ডাঙা দূরে নয়।'

রক্তলাল উৎসুক চোখ মেলে ডাঙা খুঁজল চারজোড়া চোখ। কিন্তু দিগন্তের কোথাও নারকেল গাছের একটা মাথাও চোখে পড়ল না।

কোন কিছুই আর ভাল লাগছে না এখন ওদের। সব কিছুতেই বিরক্তি। এমন কি নিজেদের সান্নিধ্যও খারাপ লাগছে, সইতে পারছে না একে অন্যকে। বুঝতে পারছে কিশোর, এই অবস্থা আর দু'দিন চললেই পাগল হয়ে যাবে সবাই।

মুসা বলল, রবিনকে একই ভেলায় আর সইতে পারছে না সে। রবিন ঘোষণা করে দিল, হাতের কাছে কিছু একটা পেলেই মুসার মুখে ছুঁড়ে মারবে ওটা।

প্রত্যেকেই ভাবছে, সে ছাড়া বাকি তিনজন পাগল। আবোল-তাবোল কথা বলছে। দেশী ভাষায় অনর্গল বকবক করে যাচ্ছে কুমালো। কিশোর বলল, 'আর পানিতে থাকছি না আমি। এবার সৈকতে উঠব।'

হেসে উঠল মুসা। ডুব দিয়ে কিশোরের পা টেনে ধরে তাকে ডুবিয়ে রাখল কিছুক্ষণ। ভেসে উঠে হা হা করে হেসে বলল, 'কেমন উঠলে সৈকতে? দিলাম তো ঠেকিয়ে।'

মেঘ দেখতে পেল কিশোর। অথচ মেঘের চিহ্নও নেই কোথাও। তারপর দেখল নারকেল গাছের মাথা। সবুজ গাছপালায় ছাওয়া দ্বীপ। পাহাড়ের ওপর থেকে বনের মাথায় ঝরে পড়ছে জলপ্রপাত।

খেয়ালই করল না ওরা, কখন বাতাসের বেগ বাড়ল, কালো মেঘ জমল, ফুঁসে উঠল সাগর। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হল। ওপরের দিকে হাঁ করে পানি খাওয়ার কথাও মনে এল না কারও। তবু করল, শরীরের স্বাভাবিক তাগিদেই বোধহয়। অনেক দিন পর পাকস্থলীতে ঢুকল মিষ্টি পানি।

ফুঁসে উঠল সাগর। ছোট্ট ভেলাটাকে ঠেলে নিয়ে চলল দক্ষিণ-পশ্চিমে। নিজেদের অজান্তেই অনেকটা, কাণ্ডগুলো আঁকড়ে ধরে রইল ওরা।

ঝড়ের অন্ধকার মিশে গেল রাতের অন্ধকারের সঙ্গে। ঘোরের মধ্যে থেকে যেন কিশোরের কানে আসছে বাতাসের গর্জন, অনুভব করছে ঢেউয়ের দোলা।

তারপর শুনতে পেল আরেকটা গর্জন। বাতাসের নয়। তীরে ঢেউ আছড়ে পড়ার।

বিচিত্র কাণ্ড শুরু করেছে ভেলাটা। কিসের টানে যেন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে আবার, আবার এগোচ্ছে…

কয়েকবার এরকম করে হঠাৎ টান লেগে ছিঁড়ে গেল বাঁধন। আলাদা হয়ে গেল দুটো কাণ্ড। আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারল না কিশোর। ডুবতে শুরু করল। পায়ের তলায় ঠেকল মাটি!

ধাক্কা দিয়ে আবার তাকে ভাসিয়ে ফেলল ঢেউ। আবার ডোবাল। আবার ভাসাল। অবশেষে দেখল, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে সে।

হ্যাঁচকা টানে তাকে চিত করে ফেলল আবার পানি। টেনে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলল বালিতে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আরও কিছুদূর উঠে গেল কিশোর। ঢেউ পৌঁছতে পারছে না এখানে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল বালিতে।

তারপর শুধুই অন্ধকার!

দশ

চোখ মেলে একটা বাদামী মুখ দেখতে পেল কিশোর। কালো খোঁপায় লাল হিবিসকাস গোঁজা। হাতে একটা কচি ডাব। কাত করে ধরল তার ঠোঁটের কাছে।

ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি পড়ল হাঁ করা মুখের ভেতর। ফোলা জিভের জন্যে গিলতে কষ্ট হল তার। কোনমতে গিলে নিল কয়েক ঢোক।

সূর্য উঠেছে, কিন্তু রোদ লাগছে না তার গায়ে। সে শুয়ে আছে ঘন নারকেল কুঞ্জের ছায়ায়। ফলে বোঝাই গাছগুলো। বাতাসে ভেসে আসছে ফুলের সুবাস।

তার পাশেই শুয়ে আছে রবিন, মুসা আর কুমালো। তাদের সেবাযত্ন করছে আরও কয়েকটা মেয়ে। গাছপালার ভেতরে কয়েকজন পুরুষকে দেখা যাচ্ছে।

এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে কিশোর, আবার চোখ বুজে ফেলল। বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, টের পাচ্ছে। আস্তে শুইয়ে দেয়া হল। কানে আসছে অনেক কণ্ঠস্বর। কাঠের ধোঁয়া আর খাবারের জিভে-পানি-আসা গন্ধ নাকে এল।

চোখ মেলল আবার কিশোর। গাঁয়ের একটা কুঁড়ের বারান্দায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। বেড়া বেয়ে ছাতে উঠে গেছে লতা, নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। বড় বড় আম গাছে আম ধরে আছে, ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে ডাল।

বারান্দায় ভিড় করে আছে অনেকগুলো বাদামী মুখ। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অভিযাত্রীদের দিকে।

তার ওপর ঝুঁকল একটা মুখ, সেই মেয়েটা। হাসল কিশোর। কাঠের একটা পাত্র থেকে কাঠের চামচ দিয়ে খাবার নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। কিশোর হাঁ করতেই ঢেলে দিল তার মুখে। রুটিফল, কলা আর নারকেল দিয়ে বানানো এক ধরনের মণ্ডের মত খাবার।

খুব ধীরে ধীরে গিলতে লাগল কিশোর।

পাশে এসে তার মাদুরের ওপর বসল এক বৃদ্ধ। তাকে অবাক করে দিয়ে ইংরেজিতে কথা বলে উঠল, 'আমি নুলামা। এ-গাঁয়ের মোড়ল। অনেক ভুগেছ তোমরা। আমাদের এখানে যখন আসতে পেরেছ, আর ভাবনা নেই। খেয়েদেয়ে ঘুম দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আবার যখন চোখ মেলল কিশোর, দেখল গাছপালার লম্বা ছায়া পড়েছে। নিশ্চয় শেষ বিকেল। শান্ত স্নিগ্ধ গাঁয়ের দিকে চোখ বোলাল সে। নির্দিষ্ট কোন রাস্তা নেই। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কুঁড়েগুলো।

গাছে গাছে ছেয়ে রয়েছে! আম তো আছেই। আছে রুটিফল, কলা, কমলা,

লেবু, নারকেল, ডুমুর, পেঁপে, তুঁত। ফলে ফলে বোঝাই।

আর আছে ফুল। নানা জাতের অর্কিড আঁকড়ে রয়েছে গাছের ডাল, কাণ্ড। বুগেনভিলিয়া, হিবিসকাস আর কনভলভুলাসের বাগানে যেন বসন্ত এসেছে।

সচল রঙেরও অভাব নেই এখানে। গাছে গাছে উড়ছে আর কর্কশ চিৎকার করছে লাল-সবুজ কাকাতুয়া। ঝিম মেরে বসে রয়েছে ঘন নীল মাছরাঙা। পড়ন্ত রোদে চিকচিক করছে ঘুঘুর পালক। আরও অনেক পাখি আছে, বেশির ভাগের নামই জানে না সে। বিচিত্র ওগুলোর রঙঃ লাল, সবুজ, কালো, সাদা, নীল, হলুদ।

পাখির ডাকে মুখরিত হয়ে আছে গ্রামটা। তার সঙ্গে তাল মিলিয়েছে যেন লোকের মৃদু আলাপ। কাছেই কোথাও গিটার বাজিয়ে গান গাইছে কারা যেন।

ফিরে তাকাল কিশোর। কুমালো, মুসা আর রবিনেরও ঘুম ভেঙেছে। উঠে বসেছে। অবাক হয়ে দেখছে, কান পেতে শুনছে।

'স্বপ্ন দেখছি, তাই না?' মুসা বলল।

'হয়ত,' বলল কিশোর। 'ঘুম ভাঙলে হয়ত দেখব এসব কিছুই নেই। নারকেলের কাণ্ড আঁকড়ে ধরে সাগরে ভাসছি...'

ঘরের ভেতরে কথা শোনা গেল। কয়েকটা মেয়ে আর একজন বয়স্ক মহিলা বেরিয়ে এল পানি আর খাবারের পাত্র নিয়ে। সেগুলো রাখল অভিযাত্রীদের সামনে। নানারকমের মাছ, কবুতরের রোস্ট, মিষ্টি আলু সেদ্ধ আর একঝুড়ি ফল।

ওরা খাবার সময় কাছে এসে বসল বৃদ্ধ মোড়ল। হাসি হাসি মুখ।

'এ-জায়গাটার নাম কি?' খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল কিশোর। জিভের ফোলা আর এখন নেই।

'রুয়াক। ট্রাক দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপ।'

ট্রাক, যাকে দক্ষিণ সাগরের স্বর্গ বলা হয়! এর নাম অনেক শুনেছে কিশোর। বিশাল এক ল্যাগুনকে ঘিরে রেখেছে একশো চল্লিশ মাইল লম্বা প্রবালের দেয়াল। দেয়ালের ভেতরে ল্যাগুনের বুকে গজিয়ে উঠেছে দু'শো পঁয়তাল্লিশটা দ্বীপ।

'এই দ্বীপটা কি ল্যাগুনের মধ্যে?'

'না। দেয়ালের ওপর। ওই যে, ওদিকে সাগর। আর এদিকে ল্যাগুন।'

'আমেরিকান নেভির লোক আছে এখানে?'

'মূল দ্বীপটাতে আছে। সকালে গিয়েছিলাম তোমাদের খবর জানাতে। সঙ্গে সঙ্গেই আসতে চাইছিল ওরা, আমি বারণ করেছি। বলেছি কাল সকালে যেন আসে, ততক্ষণ আমার মেহমান হয়ে থাকবে তোমরা। ওরা বলল, পোনাপে থেকে নাকি বোট নিয়ে বেরিয়েছিলে তোমরা, তারপর নিখোঁজ হয়েছ। কাল নেভির একটা হসপিটাল শিপ যাবে পোনাপে আর মার্শাল দ্বীপে, ইচ্ছে করলে ওটায় করে যেতে পার।' হাসল বৃদ্ধ। 'কিংবা থেকেও যেতে পার এখানে, যতদিন ইচ্ছে।

আমরা খুব খুশি হব।'

চোখে পানি এসে গেল কিশোরের। 'আপনাদের দয়ার কথা কোনদিন ভুলব না। থাকতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু পোনাপেতে জরুরি কাজ আছে আমাদের।'

পরদিন সকালে ক্যানুতে করে ট্রাকের মূল দ্বীপে পৌঁছে দেয়া হল অভিযাত্রীদের।

হসপিটাল শিপটা আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত একটা সত্যিকারের হাসপাতাল। এক্স-রে মেশিন আছে, চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আছে, আছে ফার্মেসী, ল্যাবরেটরি। দ্বীপ থেকে দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়, অসুস্থের সেবা করে, দেশী মেয়েদেরকে নার্সের ট্রেনিং দেয়।

ধবধবে সাদা বিছানায় শোয়ানো হল অভিযাত্রীদের। চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল সাথে সাথেই। কুমালোর জখম দেখে ডাক্তার বললেন, ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

তিন দিন পর পোনাপেতে পৌঁছল জাহাজটা। রেডিওতে আগেই খবর পাঠানো হয়েছে। তৈরিই হয়ে ছিল কমাণ্ডার ফেলিকস ম্যাকগয়ার। জাহাজের নোঙর পড়তে না পড়তেই ওটার গায়ে এসে ঘেঁষল তার বোট।

অভিযাত্রীদের সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন শুরু করল, 'কোথায় ছিলে তোমরা? কি হয়েছিল? অ্যাটলে থেকে গেলে কেন? কেন ফিরলে না বোটে করে?'

হেসে উঠল কিশোর। 'আহা, একটা করে প্রশ্ন করুন। নইলে জবাব দিই কি করে? আচ্ছা, আগে বলুন, ডেংগু ফিরেছে?'

'ডেংগু? ডেংগুটা আবার কে?'

'ওহ্হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি তো আবার তাকে চেনেন রেভারেণ্ড হেনরি রাইডার ভিশন নামে।'

'ওঁকে উদ্ধার করেছে একটা মাছধরা নৌকো। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। খাবার পানি সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, পরে সাগরের পানি খেয়েছেন। তাতেই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটু সুস্থ হলে তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, তোমরা নাকি ইচ্ছে করেই অ্যাটলে থেকে গেছ। তিনি আবার ফিরে গেলে তারপর আসবে।'

'সব মিথ্যে কথা,' কিশোর বলল। 'কুমালোকে গুলি করেছে। আমাদের ওখানে ফেলে রেখে এসেছে মরার জন্যে। ওই লোক মিশনারি নয়, মুক্তো ব্যবসায়ী। আর তার নামও রাইডার ভিশন নয়, ডেংগু পারভি। ওই অ্যাটলে একটা মুক্তোর খামার আছে। ওটাই লুট করতে চেয়েছিল সে।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল ম্যাকগয়ার। 'তাই নাকি? আশ্চর্য!'

'এখন কোথায় সে? এখানেই?'

'না। বড় একটা বোট ভাড়া করে, মাঝিমাল্লা নিয়ে আবার বেরিয়েছে। আমরা তো ভাবলাম তোমাদের আনতে গেছে। পরে যখন শুনলাম, তোমরা প্রায় মরতে মরতে এসেট্রাক দ্বীপে উঠেছ, শুনে তো চমকে গেলাম।'

'গেছে কতদিন হল?'

'এই হপ্তাখানেক। কখন ফিরবে বলেনি। আবোলতাবোল কথা বলছিল। সে নাকি রামধনুর দেশ থেকে সোনার সিন্দুক তুলে আনতে যাচ্ছে। এখনও নব্বই ভাগ পাগল। একটা লগবুক সারাক্ষণ বগল তলায় চেপে রাখত, কাউকে ছুঁতেও দিত না। কেউ দেখার কথা বললেই খেপে যেত। কোন জায়গায় যাচ্ছে, অবস্থান জানতে চেয়েছিলাম আমরা, বলেনি। ভাল নেভিগেশন জানে, এরকম একজন পলিনেশিয়ানকে নিয়ে গেছে।' এক মুহূর্ত থেমে বলল ম্যাকগয়ার, 'এখন বুঝতে পারছি কোথায় গেছে। অ্যাটলেই যাবে।'

'ওখানে কোনদিনই পৌঁছতে পারবে না।' হাসল কিশোর। 'আমি চাইছি, আমরা থাকতে থাকতেই ফিরে আসুক। গরুর হাড্ডি কোপানর কুড়াল নিয়ে ওর জন্যে তৈরি থাকব আমি।'

হেসে বলল ম্যাকগয়ার, 'তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না। এবার ফিরলেই জেলে ঢুকতে হবে তাকে।'

কিন্তু কিশোর আর ম্যাকগয়ার দু'জনেরই হিসেবে ভুল হয়েছে। কুড়ালের কোপও খেতে হল না ডেংগুকে, জেলেও ঢুকতে হল না।

এগারো

সেই বাড়িটাতেই উঠল অভিযাত্রীরা, পোনাপেতে এসে প্রথম যেটায় উঠেছিল। ক্যাপ্টেন ইজরা কলিগ জানাল, মেরামত হয়ে গেছে শুকতারা।

'একেবারে আগের মত,' বলল সে।

'মাছটাছগুলো কেমন আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'ভাল। তবে অক্টোপাসটা বেশ জ্বালায়। একদিন তো বেরিয়ে পড়েছিল ট্যাঙ্ক থেকে। মাকড়সার মত হেঁটে হেঁটে উঠে চলে এসেছিল ডেকে, আরেকটু হলেই সাগরে নেমে যেত। লোকজন ডেকে অনেক কষ্টে তারপর ধরেছি।'

বাড়িতে একটা লম্বা রেডিওগ্রাম পাঠাল কিশোর। আর অনেক টাকার বীমা করে ছোট একটা প্যাকেট পার্সেল করে পাঠাল প্রফেসর এনথনি ইস্টউডের নামে।

মুক্তাগুলো হাত বদল করে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

জামবুর ব্যাপারে খোঁজখবর নিল তিন গোয়েন্দা। জেলেই রয়েছে এখনও। কিশোরের মনে হল, যথেষ্ট সাজা হয়েছে বেচারার। ম্যাকগয়ারকে অনুরোধ করল,

তাকে মুক্তি দিতে।

মুক্তি পেল জামবু। একেবারেই অকৃতজ্ঞ লোকটা। কিশোরকে একটি বারও ধন্যবাদ জানাল না। দ্বীপেও থাকল না আর। আমেরিকাগামী যে জাহাজটা প্রথম ধরতে পারল, তাতেই মাল্লা হিসেবে নাম লিখিয়ে পাড়ি জমাল দেশের উদ্দেশে।

ডেংগুর ফেরার অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। রিডিঙে ভুল রয়েছে, পার্ল ল্যাগুন খুঁজে বের করতে পারবে না সে। কিন্তু সত্যিই কি পারবে না? খুঁজতে খুঁজতে যদি পেয়ে যায়! কে জানে, হয়ত এখন ল্যাগুনে মুক্তো তোলায় ব্যস্ত তার লোকেরা। একবার ওখানে গিয়ে পৌছতে পারলে একটা ঝিনুকও রাখবে না ডেংগু, সব তুলে ফেলবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই কিশোরের। তারপর ওগুলো থেকে মুক্তা বের করে নিয়ে চলে যাবে। পোনাপেতে আর কোনদিনই ফিরবে না।

কারণ, দ্বীপে ছেলেদেরকে না পেয়ে তাদের লাশ না দেখে, সন্দেহ হবেই ডেংগুর। ভাববে, যে ভাবেই হোক পোনাপেতে ফিরে এসেছে ওরা। স্বভাবতই এদিকে ঘেঁষতে চাইবে না সে। সমস্ত মুক্তা নিয়ে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে।

প্রফেসরকে তখন কি জবাব দেবে কিশোর? স্বীকার করতেই হবে দোষটা তার। ডেংগুর ফাঁকিবাজি ধরতে পারেনি। তাকে বোটে তুলে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে একেবারে দেখিয়ে দিয়েছে আসল জায়গা।

'আমি একটা গর্দভ! আস্ত গাধা!' কথাটা মনে পড়লেই নিজেকে গাল দেয় কিশোর। এই যেমন এখন দিচ্ছে। অস্থির হয়ে গড়াগড়ি শুরু করল মাদুরে। ঘুম পালিয়েছে। 'আর এভাবে বসে থাকা যায় না। কিছু একটা করা দরকার। অন্তত গিয়ে দেখা দরকার, অ্যাটলে সত্যি সত্যি যেতে পেরেছে কিনা ডেংগু।'

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বন্দরে রওনা হল কিশোর, ক্যাপ্টেন কলিগকে বলার জন্যে, ওরা আবার পার্ল ল্যাগুনে যাবে। পুব দিগন্তে তখন সবে উঁকি দিয়েছে সূর্য। বন্দরে এসে দেখল সে, একটা বোট এসে নোঙর করেছে ডকের শ'খানেক গজ দূরে। নৌকা নামিয়ে তাতে নামল কয়েকজন পলিনেশিয়ান আর একজন শ্বেতাঙ্গ।

ধক করে উঠল কিশোরের বুক। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল। কে লোকটা? ডেংগু? সত্যি দেখছে, না কল্পনা!

নৌকাটা আরও কাছে এলে ভালমত দেখা গেল লোকটাকে। ডেংগুই।

দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক। ডেংগু নিশ্চয় অ্যাটলটা খুঁজে পায়নি। তাহলে ফিরত না। কিশোরকে দেখলে কি করবে এখন? রাগের মাথায় গুলি করে বসবে? পালাবে নাকি? গিয়ে ম্যাকগয়ারকে খবর দেবে?

কিন্তু কোনটাই করল না কিশোর। দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মত।

তীরে পৌঁছে গেল নৌকা। ডকে উঠল ডেংগু। মাতালের মত টলছে। চোখে বন্য দৃষ্টি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। উসকো খুসকো চুল এসে পড়েছে কানের ওপর। পিঠের কুঁজটা আরও প্রকট। ঝুলে পড়ছে কাঁধ, ফলে হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা লাগছে।

তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর, চমকে দেয়ার জন্যে।

ডেংগু দাঁড়াল।

'এই যে, ডেংগু,' কিশোর বলল। 'চিনতে পারছ আমাকে?'

এক মুহূর্ত চেয়ে রইল ডেংগু। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। যেন চিনতেই পারেনি।

পলিনেশিয়ান একটা লোকের হাতে সেক্সট্যান্ট, বোধহয় সে-ই নেভিগেটর। বলল, 'পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'লগবুকের রীডিং দেখে একটা দ্বীপ খুঁজেছে। তার ধারণা, ওই দ্বীপে অনেক মুক্তা আছে। রীডিং মত ওখানে গিয়ে দেখা গেল, কোন দ্বীপ নেই, শুধু পানি। আশেপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে কোন দ্বীপ পাওয়া গেল না। মাথায় আগেই গোলমাল হয়ে ছিল, এই ঘটনার পর একেবারে পাগল হয়ে গেল। কি আর করা। বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছি।'

ডকের শেষপ্রান্তে হৈ-হট্টগোল শোনা গেল। কি হয়েছে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল কিশোর। দু'জন মিলিটারি পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেছে ডেংগু। হাত ছাড়াতে পারল না। টেনেহিঁচড়ে তাকে নিয়ে গেল ওরা।

লোকটার জন্যে এখন দুঃখই হল কিশোরের।

জেলে নয়, শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল ডেংগুকে। এখানে রোগ না সারলে পাঠিয়ে দেয়া হবে স্যান ফ্র্যানসিসকোর কোন মেনটাল ইন্সটিটিউশনে।

রেডিওতে সেদিনই একটা মেসেজ এল কিশোরের নামে। ম্যাকগয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ক্যাপ্টেন কলিগ, মেসেজটা নিয়ে এসেছে।

কেবিনে রবিন, মুসা, কুমালো সবাই আছে।

খামটা ছিঁড়ল কিশোর। জোরে জোরে পড়লঃ

'ভাল কাজ দেখিয়েছ তোমরা। জানোয়ারগুলো পেয়েছি, চমৎকার। খুব খুশি হয়েছে লিসটার। বাকি যা আছে কারগো স্টীমারে তুলে দাও। পার্সেল পেয়েছেন ইস্টউড, তোমাদের অনেক প্রশংসা করেছেন। আর দেরি কর না। যত তাড়াতাড়ি পার, বাড়ি ফিরে এস। তোমার চাচা, রাশেদ পাশা।'
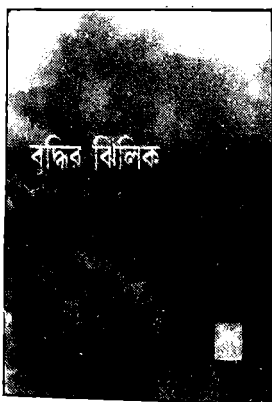
-o-

বুদ্ধির ঝিলিক

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৯০

বিকেল বেলা কেসের রিপোর্ট লিখছিল রবিন মিলফোর্ড। বাইরে বসন্তের রোদ। ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে। একটা গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। কাজ থেকে ফিরেছেন রবিনের বাবা মিস্টার মিলফোর্ড।

কয়েক মিনিট পর ঘরে ঢুকলেন তিনি। রবিনকে দেখে হাসি ফুটল মুখে। বললেন, 'এই যে, গোয়েন্দা। গুপ্তধন খোঁজার ইচ্ছে আছে? যে বের করতে পারবে, ওগুলো তার।'

ঝট করে মুখ তুলল রবিন। 'হারিয়ে গেছে?'

'না, লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

'লোকটা তাহলে পাগল,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'নইলে লুকিয়ে রেখে খুঁজতেই বা বলবে কেন? আর যে পাবে তাকেই বা দিয়ে দেবার কথা বলবে কেন?'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত,' হাসলেন বাবা। চোয়াল ডললেন। 'তোমাদের মিস্টার ক্রিস্টোফারকেও এতে জড়ানো হয়েছে, তিনি তো আর পাগল নন। এই যে, লেখাটা পড়ে দেখ,' একপাতা কাগজ রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

কাগজটা লম্বা, খবরের কাগজের গ্যালি প্রুফ, যে কাগজটায় তিনি চাকরি করেন। 'খবরটা কাল বেরোবে। তোমাদেরকে আগেই জানাব বলে নিয়ে এসেছি।'

কাগজটায় লেখাঃ

খামখেয়ালী ধনীর চ্যালেঞ্জঃ

'গুপ্তধন খুঁজে বের করত পারলে রেখে দাও'

পারিবারিক উকিলের ধারণা, 'এই খেপাটে' উইল যিনি করেছেন, তাঁর মানসিক রোগ ছিল।

রহস্যমানব সন্ন্যাসী ডেন কারমলের মৃত্যু হয়েছে গত রবিবার, রকি বীচে। তিনি ঘোষণা করে গেছেন, তাঁর রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তি তারই হবে যে ওগুলো খুঁজে পাবে।

তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ড্যাম সান গতকাল এই খবর প্রকাশ

করেছেন। বিশ বছর ধরে রকি বীচে বাস করছিলেন ডেন কারমল। সব সময় খুব সাদাসিধা পোশাক পরে থাকতেন এই রহস্যময় মানুষটি, বাস করতেন একটা পুরানো বাড়িতে, কিন্তু লোকের বিশ্বাস তিনি ছিলেন কোটিপতি।

ডেন কারমলের উকিল রস উড বলেছেন, শেষদিকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর মক্কেলের। নইলে ওরকম উইল করতে পারতেন না। কারণ তাঁর পুত্রবধু আর এক নাতি রয়েছে। ওদের নামে নাকি একটা উইলও করা হয়েছিল আগে।

ডেন কারমলের এই আজব উইলের সাক্ষী হয়েছেন মিস্টার সান এবং আরেক বান্ধবী মিসেস ডোরা কেমপার।

প্রতিবেদনটির নিচে পুরো উইলটা লেখা রয়েছে, পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। পড়া শেষ করে বলল, 'বাবা, কিশোর আর মুসাকে দেখিয়ে আনি? ডিনারের তো এখনও দেরি আছে।'

হেসে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার মিলফোর্ড।

ফোনের দিকে দৌড় দিল রবিন। ফোন করে বন্ধুদেরকে থাকতে বলে ছুটে বেরোল ঘর থেকে।

সাইকেল নিয়ে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেটে এসেই থমকে গেল রবিন। অনেকগুলো পুরানো মালের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কিশোরের মেরিচাচী, তারমানে কাজ। সদর গেট দিয়ে আর ঢুকল না সে, ঘুরে চলে এল সবুজ ফটক এক-এর কাছে। ভেতরে ঢুকে, ওয়ার্কশপে সাইকেল রেখে, দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে।

'কি ব্যাপার, নথি?' দেখেই বলে উঠল কিশোর পাশা।

'খাইছে, রবিন,' বলল মুসা আমান, 'এত উত্তেজিত। ভাল খবর নিয়ে এসেছ মনে হয়?'

জবাব না দিয়ে নীরবে কাগজটা কিশোরের হাতে দিল রবিন। জোরে জোরে পড়তে লাগল গোয়েন্দাপ্রধান। প্রতিবেদন শেষ করে উইল পড়লঃ

'আমি, ডেন নিকোলাস কারমল ঘোষণা করছি যে আর দশজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতই সুস্থ রয়েছি আমি। আমার আত্মীয় এবং তাদের বন্ধুদেরকে আমি পছন্দ করি না, কারণ ওরা অতিমাত্রায় লোভী, হিংসুক, স্বার্থপর। আমার মতে ওরা খারাপ লোক। কাজেই আমার সারা জীবনের কষ্টার্জিত সম্পদ ওদেরকে দান করে যাবার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

'এটা আমার শেষ ইচ্ছের দলিল। আমার পুত্রবধু, ভাগ্নে এবং ভাগ্নি প্রত্যেককে ১.০০ (এক) ডলার করে দান করে গেলাম। বাকি যা সহায় সম্পত্তি থাকবে, ওগুলো নির্দ্বিধায়, খুশিমনে দিয়ে গেলাম যে আমার লুকানো ধন খুঁজে বের করতে পারবে তাকে। কারণ প্রচুর মাথা খাটিয়ে যে বের করতে পারবে, তারই ভোগ করার অধিকার থাকবে ওগুলো।

'গুপ্তধন পেতে চাইলে তাকে এই ধাঁধার সমাধান করতে হবে—

'হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস, দ্য বটল অ্যাণ্ড স্টপার
'শোজ দ্য ওয়ে টু দ্য বিলাবং।

'অ্যাবাভ দ্য অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস অল অ্যালোন
'দ্য লেডি ফ্রম ব্রিসটল রাইডস ফ্রম আ ফ্রেণ্ড।

'অ্যাট দ্য টেনথ বল অভ টোয়াইন, ইউ অ্যাণ্ড মি
'সি আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ অ্যাহেড।

'ওয়ান ম্যান'স ভিকটিম ইজ অ্যানাদার'স ডারলিন,
'ফলো দ্য নোজ টু দ্য প্লেস।

'হোয়্যার মেন বাই দেয়ার ট্রাবল অ্যাণ্ড স্ট্রাইফ,
'গেট আউট ইফ ইউ ক্যান।
'ইন দ্য পশ কুইন'স ওল্ড নেড, বি ব্রাইট
'অ্যাণ্ড দ্য নেচারাল অ্যাণ্ড দ্য প্রাইজ ইজ ইওরস।

'কে ভাবতে পেরেছিল বৃদ্ধ ওই মানুষটির এত টাকা? পাশা গড়িয়ে দাও লুটের মাল তোমার।

'আমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হবেনঃ ড্যাম সান, যে আমাকে পছন্দ করত; সিংক অ্যাণ্ড ওয়াটারস, যারা টাকা পছন্দ করে; ডেভিস ক্রিস্টোফার, যাঁর তৈরি ছবি আমি পছন্দ করতাম, আর যিনি নিজে রহস্য খুব পছন্দ করেন।'

নাটকীয় ভঙ্গিতে পড়া শেষ করে মুখ তুলল কিশোর। একান ওকান হয়ে গেছে হাসি।

'খাইছে!' বিড়বিড় করল মুসা, 'মরা মানুষের ধাঁধা! কিশোর, ওটা সত্যি সত্যি

উইল, না কোন পাগলের রসিকতা?'

'আমার তো মনে হচ্ছে আসলই,' কিশোর বলল। 'এর মধ্যে খেপামির কিছু দেখছি না। তবে বুঝতে পারছি না উইলটা বৈধ কিনা, মানে, যে গুপ্তধন খুঁজে পাবে সত্যিই সে রাখতে পারবে কিনা। যদি বৈধ হয়ও তারপরেও কথা থেকে যায়। তাঁর বংশধররা গিয়ে কোর্টে নালিশ করতে পারে, ডেন কারমল পাগল ছিলেন। তখন সবকিছু বিবেচনা করে কোর্ট হয়ত তাঁদের পক্ষেই রায় দিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু তার পরেও,' চোখের তারা ঝিলিক দিয়ে উঠল গোয়েন্দা-প্রধানের, 'ভেবে অবাক হচ্ছি আমি, কি লুকিয়ে রেখে গেছেন ভদ্রলোক? এবং কোথায়?'

'মিস্টার ক্রিস্টোফার হয়ত বলতে পারবেন বৈধ কিনা,' রবিন বলল।

'ঠিক বলেছ,' তুড়ি বাজাল কিশোর। রিসিভার তুলে ডায়াল করল। অফিসেই আছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। কেন ফোন করেছে, জানাল সে।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'খবরটা বেরোলে আমার মাথা খারাপ করে ফেলবে লোকে! আমার নাম ঢুকিয়ে দেয়ার কোন অধিকার ছিল না খেপাটে বুড়োটার। ভালমত চিনতামই না তাকে।'

'বুঝেছি, স্যার,' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল কিশোর। 'কিন্তু উইলটা কি বৈধ? মানে লুকানো জিনিসগুলো যদি খুঁজে পাই...?'

'একটা ছবিতে ওর পরামর্শ নিয়েছিলাম, তাইতেই আমার এই সর্বনাশ...! হ্যাঁ, কি যেন বললে? বৈধ? জানি না, তবে রীতিমত পাগলামি। কোর্টে টিকবে বলে মনে হয় না। ইচ্ছে হলে এটা নিয়ে যত খুশি সময় নষ্ট করতে পার তুমি, কিশোর পাশা, তবে দোহাই তোমার, আমার সময় নষ্ট কোরো না!'

লাইন কেটে দেওয়া হল ওপাশ থেকে।

'নষ্ট করবে নাকি সময়?' মুসা বলল। টেলিফোন লাইনের সঙ্গে যোগ করা লাউডস্পীকারে সবাই শুনতে পেয়েছে ওপাশের কথা।

'খেপাটে বুড়ো,' বলল রবিন। 'মিস্টার ক্রিস্টোফার ঠিকই বলেছেন। কারমলের উইল টিকবে না। বংশধরেরাই পেয়ে যাবে সমস্ত সম্পত্তি।'

'তা পাক,' উত্তেজিত হয়ে বলল কিশোর। 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছ না কেন? কোর্ট তাঁদেরকে গুপ্তধনগুলো বের করে দিতে পারবে না। বের করতে হলে এই ধাঁধার সমাধান করতে হবে।'

টেলিফোনের তীক্ষ্ণ শব্দে চমকে উঠল তিনজনেই। মিস্টার ক্রিস্টোফার করেছেন। বললেন, 'কেস বোধহয় একটা পেলে তোমরা। কারমলের আত্মীয়-স্বজনেরা ফোন করেছিল এইমাত্র। তাদেরকে তোমাদের সাহায্য নেয়ার পরামর্শ

দিলাম।'

'মানে, স্যার…!'

'ওরা বোধহয় এখুনি কথা বলবে তোমাদের সঙ্গে। এই পাগলামিতে আমি আর নাক গলাতে চাই না।' আবার লাইন কেটে দিলেন পরিচারক। কিশোরের মনে হল এবার স্বস্তির সঙ্গে রিসিভার রেখেছেন।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল তিন গোয়েন্দা। নতুন আরেকটা কেস!

পরদিন সকালে স্কুলে যাবার আগে তিনজনেই আবার হেডকোয়ার্টারে মিলিত হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেয় হল রবিন আর মুসা। কিশোর রইল হেডকোয়ার্টারেই। ফোনের কাছে বসে একটা ব্যস্ত বিকেল কাটাতে হবে তাকে।

দুই

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে সাইকেল নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে চলে এল মুসা। সবুজ ফটক এক-এর কাছাকাছি এসে দেখল, বেড়ার ধারে ঘাপটি মেরে রয়েছে রবিন।

'কিশোর ফোন করেছিল তোমাকে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না,' ফিসফিস করে জবাব দিল রবিন। 'হেডকোয়ার্টারের কাছে ঘুরঘুর করছে কে যেন।'

রবিনের পাশে এসে বসে পড়ল মুসা। দেখল, ট্রেলারটা লুকানো রয়েছে যেসব জঞ্জালের তলায় তার কাছে নড়ছে কে যেন। ছায়ার জন্যে ভালমত দেখা যাচ্ছে না। জঞ্জাল সরিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছে।

'কিশোর কি ভেতরে?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'ওকে সতর্ক…'

'দেখ!'

মুসাও দেখল, দুই সুড়ঙ্গের পাইপের মুখ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কিশোরের মুখ।

'ও-ও শুনতে পেয়েছে,' আবার বলল রবিন।

তার কথা কানে গেল কিশোরের। ঝট করে এদিকে মুখ ফিরিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা না বলার ইশারা করল। তারপর দেখাল জাংকইয়ার্ডের পেছন দিকে।

'ঘুরে যেতে বলছে আমাদের,' মুসার কানে প্রায় ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল রবিন। 'ধরার চেষ্টা করতে বলছে।'

নিঃশব্দে ঘুরে পেছনের বেড়ার কাছে চলে এল দু'জনে। মস্ত একটা পুরানো ওয়াশিং মেশিনের আড়ালে লুকিয়ে সাবধানে মুখ বাড়াল। এখনও আগের জায়গায়ই রয়েছে ছায়াটা, নড়ছে।

হঠাৎ দৌড় দিল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, 'খবরদার, যেখানে রয়েছ দাঁড়িয়ে থাক। নড়লে মাথায় বাড়ি মারব,' একটা লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়েছে সে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ছায়াটা। পাঁই করে ঘুরল। একটা ছেলে।

'ধর, ধর ওকে!' চিৎকার করে বলল রবিন।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে ওয়ার্কশপের দিকে দৌড় দিল ছেলেটা। তাড়া করল দুই গোয়েন্দা। বার বার পেছনে তাকাচ্ছে ছেলেটা, কল্পনাই করল না সামনেও কেউ অপেক্ষা করছে। গিয়ে পড়ল সোজা কিশোরের হাতের মধ্যে।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ঝাড়া মারল ছেলেটা। 'ছাড়, ছাড় আমাকে!'

বয়েস আটের বেশি না। রোগা জিরজিরে শরীর। মাথা ভরা ঝাঁকড়া কালো চুল, আর বড় বড় টলটলে দুটো চোখ। গায়ে কালো সোয়েটশার্ট, পরনে নীল জিনস, পায়ে কালো স্নীকার।

'কি করছিলে তুমি ওখানে?' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা বাদ দিয়েছে ছেলেটা। বড় বড় চোখ মেলে কিছুটা অবাক হয়েই তিন কিশোরকে দেখছে। 'তোমরা তিন গোয়েন্দা, না! ইস, কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলে!'

'কি করছিলে তুমি?' আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তোমাদের কথা শুনেছি,' ছেলেটা বলল। 'জঞ্জালের মধ্যে নাকি হেডকোয়ার্টার লুকানো আছে তোমাদের। সেটাই খুঁজছিলাম। রকি বীচেই থাকি। আমিও ডিটেকটিভ,' চোখ নামিয়ে জুতোর ডগায় লেগে যাওয়া মাটি দেখল সে। 'মানে, ডিটেকটিভ হতে চাইছি আরকি। চেষ্টা করছি।'

'আমাদেরকে খুঁজছিলে?' রবিন প্রশ্ন করল।

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'তোমাদের সাহায্য…আমার মা চায়। তাই আমি…'

চত্বরের ওদিক থেকে শোনা গেল এক মহিলার ডাক, 'নরি? এই নরি? গেল কোথায়? এ-জন্যেই আনতে চাইনি…'

বলতে বলতে এসে দাঁড়াল এক অল্পবয়েসী মহিলা। পরনে উজ্জ্বল নীল পোশাক। লম্বা কালো চুল, বাদামী চোখ। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। তার পেছনে এসে দাঁড়াল একজন লোক, তারও বয়েস কম। চুল বাদামী, পরনে হালকা নীল সুট। কুঁচকে রয়েছে ভুরু, সব সময়ই ওরকম থাকে মনে হয়।

'কারমল?' উজ্জ্বল হল কিশোরের চোখের তারা। 'মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস কারমল?'

'আমি এলসা কারমল,' মহিলা জবাব দিল। 'আমার স্বামী মারা গেছে। ও

আমাদের বন্ধু, উকিল রস উড।'

'আমাদের কাছে কেন এসেছেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'ভাড়া করতে!' চেঁচিয়ে উঠল নরি। 'দাদার গুপ্তধন খুঁজে দিতে।'

হেসে উঠল উড। 'নরি, তোমাকে আমরা বলিনি কাউকে ভাড়া করতে যাচ্ছি। মিস্টার ক্রিস্টোফার অবশ্য তিন গোয়েন্দার কথা বলেছেন,' ছেলেদের দিকে তাকাল সে, 'তোমরাই নাকি? পুরো ব্যাপারটা একটা রসিকতা, বুঝেছ। যা রায় দেয়ার কোর্টই দেবে। ক্যালিফোর্নিয়ার আইনে নরিরই পাবার কথা, যদি না আসল উইলটা পাওয়া যায়, যেটাতে এলসা আর নরির নামে সম্পত্তি লিখে দেয়া হয়েছে।'

'পাওয়া যায় মানে?' কিশোরের প্রশ্ন। 'কেন, উইলটা আপনার অফিসে নেই নাকি?'

'ছিল। হারিয়ে গেছে। দেখা যাক বুড়ো কারমলের বাড়িতে পাওয়া যায় কিনা।'

'খোঁজা তো হল অনেক, পাওয়া গেল না,' ফস করে বলল নরি। 'গুপ্তধন কোথায় লুকানো তা-ও জানি না। আপনিও তো বললেন, যে আগে খুঁজে পাবে, ওগুলো তার।'

'নরি ঠিকই বলেছে,' এলসা বলল। 'খুঁজে বের করে সহজেই চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে।'

'সহজে চুরি বলছেন কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল এলসা আর উড। শ্রাগ করল উকিল। বলল, 'বুড়ো কারমল ছিল এক আজব মানুষ। সুন্দর একটা কটেজ আছে তার, ওটাতে থাকতে দিয়েছিল এলসা আর নরিকে, অথচ নিজে থেকেছে একটা পুরানো জরাজীর্ণ বাড়িতে। দুটো বাড়ি একই জায়গায়। পোশাকে আশাকে মনে হত ভিখিরিরও অধম, একটা পয়সা খরচ করতে চাইত না, অথচ আমরা জানি অনেক টাকার মালিক ছিল সে। কোন ব্যবসায় খাটায়নি ওই টাকা, ব্যাংকে রাখেনি। ঘরেও না, অন্তত তা-ই মনে হয়। রোববারে সে মারা যাবার পর তন্ন তন্ন করে বাড়িটা খুঁজেছি, কিছুই পাইনি। ব্যাংকের কোন চেকবই নেই। তারপর গতকাল জানলাম, সমস্ত টাকা দিয়ে পাথর কিনেছে বুড়ো। লাখ লাখ ডলারের উপল, চুনি, পান্না আর নীলকান্ত মণি।'

'তার কারণ,' বুঝতে পারছে কিশোর, 'দামের তুলনায় অনেক কম জায়গা দখল করে পাথর। লুকানো সহজ, চুরি করাও সহজ।'

গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল উড। 'তাড়াতাড়ি ওগুলো খুঁজে না পেলে আর কোনদিন আমাদের পাওয়ার আশা বাদ। অবশ্যই যদি এজটাররা পেয়ে যায়।'

এলসা আর নরির জন্যে থোড়াই কেয়ার করে ওরা।'

'এজটাররা কে?' রবিন প্রশ্ন করল।

'বুড়োর ভাগ্নে-ভাগ্নি। লণ্ডনে বাস। কারমলের বোন অনেক বছর আগেই মারা গেছে। ওদেরকে পছন্দ করত না বুড়ো, দেখা-সাক্ষাৎও ছিল না অনেকদিন। কিন্তু দু'দিন আগে রকিবীচে এসে হাজির হয়েছে ওরা। গুপ্তধনের জন্যে পাগল হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, এরকম একটা অদ্ভুত উইল করতে গেলেন কেন মিস্টার কারমল?' জানতে চাইল কিশোর। 'বলতে পারেন?'

'কারণ,' কাটা জবাব দিল উকিল, 'লোকটা ছিল আস্ত পাগল।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে বলল এলসা, 'আত্মীয়-স্বজন কাউকে দেখতে পারত না। এমনকি আমাকে আর নরিকেও না। সে-জন্যেই এই রসিকতা।'

'আর রসিকতাও জবর রসিকতা!' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা।

'হ্যাঁ, ধাঁধা বানিয়ে উইল লিখে যাওয়া রসিক মনের পরিচয়ই দেয়,' কিশোর বলল। 'আমার বিশ্বাস, ধাঁধার সমাধান পাওয়া গেলে রত্ন পাওয়া যাবেই। আপনার কি মনে হয়?'

'জানি না,' জবাব দিল উড। 'তবে সূত্রটুত্র কিছুই নেই হাতে। বুড়োর বাড়িতে নেই। অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে, বুড়োর যেরকম স্বভাব...'

'তাহলে কি আমরা খুঁজে বের করে দেব?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'আমরা অভিজ্ঞ গোয়েন্দা...'

'সরি, বয়েজ,' বাধা দিয়ে বলল এলসা। 'কোন আসল গোয়েন্দা সংস্থা হলে...'

'ওরা আসলই, মা,' চেঁচিয়ে বলল নরি, 'কিশোর, তোমাদের কার্ড দেখাও তো!'

মুহূর্তে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে মিসেস কারমলের নাকের নিচে ধরল কিশোর।

'পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সার্টিফিকেটটাও দেখিয়ে দাও না,' হাত নেড়ে বলল মুসা।

কার্ড, সার্টিফিকেট দেখে সলজ্জ হাসল এলসা, 'সরি, বয়েজ, তোমরা সত্যিই গোয়েন্দা।'

'এবং তোমাদের মত লোকই বোধহয় আমাদের দরকার,' বলল উড। 'নরির কাছে শুনলাম, কয়েকটা জটিল রহস্যের সমাধান নাকি তোমরা করেছ। এলসা, ওদের কার্ড, সার্টিফিকেট দেখে অবাকই লাগছে, তাই না? এই বয়েসে পুলিশ চীফের সার্টিফিকেট পাওয়া...ভাড়া করা যায় ওদেরকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, যায়।'

হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল নরি। 'ভাল হয়েছে, খুব ভাল! আমিও ওদের সঙ্গে থাকতে পারব, না মা?'

'নিশ্চয়ই না। তুমি ওদের চেয়ে অনেক ছোট। ওদের মত ছোটাছুটি করতে পারবে না।'

'কেন পারব না? আট বছর বয়েস আমার। ছোট রয়েছি নাকি এখনও?'

'শুরু করে দাও তাহলে তোমরা,' উকিল বলল তিন গোয়েন্দাকে। 'সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। যা করার গোপনে করবে, কেউ যাতে টের না পায়।'

'খাইছে!' ঘুড়ি দেখে আঁতকে উঠল মুসা। 'ইস্কুলে যেতে হবে আমাদের।'

'গোপনে করার কথা কেন বলছেন?' রবিন ধরল কথাটা। 'ব্যাপারটা কারমলই তো গোপন রাখেননি, পেপারে ছাপিয়ে দিয়েছেন। আজকের কাগজেই বের হবে।'

'সর্বনাশ!' গুঙিয়ে উঠল এলসা। 'আজকেই! গুপ্তধনের খোঁজে মৌমাছির চাকের মত ভেঙে পড়বে সারা শহর! জলদি করতে হবে তোমাদের!'

'তাড়াহুড়ো করে ধাঁধার সমাধান করতে পারবে না কেউই, সবারই সময় লাগবে। এক ধাপ এক ধাপ করে এগোতে হবে, কাজেই ভয়ের কিছু নেই। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে সমাধান করতে বসব। প্রথম ধাপ থেকে শুরু করতে হবে প্রথমে।'

'সেটা কি?' উড জানতে চাইল।

'অবশ্যই বুনো কুকুরেরা যেখানে বাস করে,' হেসে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। পকেট থেকে উইলের একটা নকল বের করে পড়ল, 'হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস, দ্য বটল অ্যাণ্ড স্টপার,' এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে পড়ল, 'শোজ দ্য ওয়ে টু দ্য বিলাবং।' হাসল সে। 'নিশ্চয়ই জানেন, ঝর্না, ডোবা কিংবা ছোট জলাশয়কে অস্ট্রেলিয়ানরা বলে বিলাবং। ওয়াইল্ড ডগ বলে নিশ্চয় নিজেকে বোঝাতে চেয়েছেন কারমল, কারণ তিনি অস্ট্রেলিয়ান। নিজেকে ওয়াইল্ড ডগ বা ডিংগো ভাবতে পছন্দ করতেন। হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস, অর্থাৎ "যেখানে বুনো কুকুরেরা বাস করে" বলে নিশ্চয় নিজের বাড়ি বুঝিয়েছেন। সুতরাং ওখানে গিয়ে দেখতে হবে ছিপি লাগানো একটা বোতল কোন জলাশয়ের দিকে মুখ করে রয়েছে কিনা।'

তিন

স্কুল ছুটি হতেই কারমলের বাড়িতে রওনা হল তিন গোয়েন্দা। বোটানিক্যাল

গার্ডেন আর একটা বড় পার্কের পাশে বাড়িটা। খানিক দূরে পাহাড়। সাইকেল চালাতে চালাতে কিশোর বলল, 'কড়া নজর রাখবে। বলা যায় না, আমাদের ওপরও চোখ রাখতে পারে কেউ।'

'খাইছে! কিশোর, দেখ!' হাত তুলে পাহাড়ের নিচে দেখাল মুসা।

পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে ওরা। নিচে, বাঁয়ে কারমলের বাড়ি, অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বেড়া দেয়া। ভেতরে জঞ্জালের ছড়াছড়ি, পুরানো তক্তা আর আরও নানারকম বাতিল জিনিসের স্তূপ। আর আছে একগাদা বোতল। একপাশে পরিচ্ছন্ন একটা সাদা কটেজ। মাঝখানে পুরানো একটা দালান, দেয়াল ধসে পড়ে পড়ে এই অবস্থা। কিন্তু বাড়ির দিকে চোখ নেই ছেলেদের।

নিচে এক অদ্ভুত দৃশ্য! লোকের ছড়াছড়ি, পিঁপড়ের মত পিলপিল করছে। বাচ্চা, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা সবাই পাগলের মত ছুটছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এখানে ওখানে, ঝোপঝাড় দলে মাটির সঙ্গে মেশাচ্ছে, জঞ্জাল আর বোতল ছড়িয়ে ফেলছে যেদিকে ইচ্ছে। বসন্তের এই সুন্দর বিকেলে খেপে গেছে যেন মানুষগুলো। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেছে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে ওরাঃ ওটা আমার! এই আমি পেয়েছি! ...এই, বোতল ছাড়!...ইত্যাদি।

দলবল নিয়ে এসেছেন ইয়ান ফ্লেচার, সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। কটেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হতাশ চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে এলসা, নরি আর উড। সাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'হায় হায়রে! সব সূত্র মুছে দিল,' প্রায় কেঁদে ফেলল নরি।

'সবখানে ভাঙা বোতল,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'এত কেন?'

'কারণ, কারমল বোতল সংগ্রহ করত,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল উড। 'হাজার হাজার! আসল বোতলটা আর কোনদিনই খুঁজে পাব না আমরা!'

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এগিয়ে এলেন ফ্লেচার। পেছন পেছন এল এক মোটা লোক আর এক সাংঘাতিক রোগাটে মহিলা। এত পাতলা, মনে হয় বাতাসেই পড়ে যাবে।

'সবগুলোকে ভাগান, অফিসার,' মহিলা বলল।

'বেআইনী ভাবে ঢুকেছে শয়তানগুলো,' মোটা লোকটা বলল, 'সব ক'টাকে অ্যারেস্ট করুন।'

মাথা নাড়লেন চীফ। 'সবাইকে ঢোকার অনুমতি দিয়ে গেছেন আপনার মামা, মিস্টার এজটার। আর জোর করে ওদেরকে তাড়াতে হলে এখন মিলিটারি ডাকতে হবে। আমাদের পক্ষে সম্ভব না। বড় জোর বাড়িঘর বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারি।'

'মামাটা তো একটা বদ্ধ পাগল ছিল,' মুখ ঝামটা দিল মহিলা, 'পাগলের কথা মানতে হবে নাকি? আসল মালিক আমরা।'

'কি যে বল, জেনি এজটার,' বলে উঠল এলসা, 'মালিক তোমরা হতে যাবে কেন? তোমাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক...'

'রক্তের সম্পর্ক থাকলে কিছুটা আমাদের সঙ্গেই আছে, এলসা,' জেনি বলল। 'তোমার তো তা-ও নেই। তোমাদের বুদ্ধিতেই আমাদের ঠকানোর মতলব করেছিল বুড়োটা। আসলে ওকে দেখাশোনা করার জন্যে আরও আগেই চলে আসা উচিত ছিল আমাদের।'

'হ্যাঁ। তোমাদেরকে দেখতে পারত না বলেই তো,' বোনের সঙ্গে গলা মেলাল মোটা মাইক, 'ঘরে জায়গা দেয়নি। ওই কটেজে থাকতে দিয়েছে।'

'তোমাকে কটেজেও দিত না,' উড বলল। 'দশ বছর ধরে খবর নেই, এখন এসেছ দরদ দেখাতে। বেআইনী ভাবে তোমরাই বরং ঢুকেছ।'

'এই, তুমি বলার কে!' চেঁচিয়ে উঠল জেনি।

'তুমিও হাত মিলিয়েছ এলসার সঙ্গে!' গর্জে উঠল মাইক। 'তোমরা দু'জনে মিলে আমাদের ঠকানোর মতলব করেছ। কিন্তু আমরা জানি, আসল উইল একটা আছে, তাতে নিশ্চয় নাম রয়েছে আমাদের।'

'আসল উইলে নরি আর এলসার নাম আছে। আর কারও না,' উকিল বলল।

রাগে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল মাইক। 'সেকথা শুধু তুমি বলছ। উইলটা হারাল কি করে, অ্যাঁ? আমার তো মনে হচ্ছে, আসল উইলটা তুমিই গাপ করে দিয়েছ, আমাদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে।'

'তাহলে তো ভালই হত,' উকিল হাসল। 'তোমরা একটা কানাকড়িও পেতে না, সব পেত নরি।'

'আমরাও কারমলের বংশধর!' আবার চেঁচিয়ে উঠল জেনি। 'সম্পত্তির ভাগ আমরাও পাব।'

'ক্যালিফোর্নিয়ার আইনে কিছুই পাবে না। যদি তোমাদের মামার ছেলে বা নাতি না থাকত, তাহলে পেতে।'

জ্বলন্ত চোখে নরির দিকে তাকাল ভাইবোন। ছেলেটার চোখে ওদের দৃষ্টিরই প্রতিফলন দেখতে পেল।

'দেখে নেব,' কুৎসিত ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচাল মাইক।

'নিয়ো,' এলসা বলল। 'দয়া করে এখন বেরোও আমার বাড়ি থেকে।'

মুলোর মত লাল হয়ে গেল ভাইবোনের মুখ।

'আমাদের জিনিস আমরা আদায় করে নেবই, মনে রেখ,' দাঁতে দাঁত চেপে

বলল জেনি। 'কি করে নিতে হয় তা-ও আমরা জানি।'

গটমট করে চলে গেল দু'জনে। ওদিকে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে দুই ছোকরা। ভাইবোনের দিকে চেয়ে শ্রাগ করে ছেলেদের লড়াই থামাতে এগিয়ে গেলেন চীফ।

'ব্যাটারা একেবারেই ছোটলোক,' ফস করে বলে ফেলল মুসা।

'ঠিকই বলেছ,' একমত হল উকিল। 'কারমল এখন থাকলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করত। একটা পয়সাও পাবে না ব্যাটারা। যাকগে, এখন আমাদের কাজ সেরে ফেলা দরকার। বোতলটা খুঁজতে হবে...'

'ভেতরে যাওয়া দরকার আমাদের,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর।

জবাবের অপেক্ষা না করেই কটেজে ঢুকে পড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। অন্যেরা অনুসরণ করল। পরিপাটি লিভিংরুমে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে চমৎকার বাতাস আসছে।

'মিস্টার কারমলের ঘরে বোতল খুঁজেছেন আপনারা?' উকিল আর এলসার দিকে তাকাল কিশোর।

জবাবটা দিল নরি, 'খুঁজেছি। পাইনি।'

'পাওয়ার কথাও না,' আনমনে বলল কিশোর। 'আমার মনে হয় নেই।'

পকেট থেকে ধাঁধার নকলটা বের করল সে। 'এখান থেকেই শুরু করার কথা বলেছেন কারমল, তাঁর বাড়ি থেকেই। কবিতার মত করে লিখেছেনঃ হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস। বিশেষ ধরনের কোড।'

'তারমানে,' ধীরে ধীরে বলল রবিন, 'বটল আর স্টপারও কোন ধরনের কোড? আসল বোতল না হয়ে বোতলের মত দেখতে কোন জিনিসের কথা বুঝিয়ে থাকতে পারেন।'

'তেমন দেখতে কিছু নেই এখানে,' এলসা বলল।

'কিন্তু পানি আছে!' আস্তে কথা যেন বলতেই পারে না নরি, চেঁচাল, 'বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশে, হাঁস পালে যে পুকুরে।'

রবিন বলল, 'পরের লাইনটা বলছে, অ্যাবাভ দ্য অ্যাপলস্ অ্যাণ্ড পেয়ারস অল অ্যালোন। আপেল গাছের কথা বলছে হয়ত। পুকুরটার পাড়ে আছে ওরকম গাছ?'

উত্তেজিত হয়ে উঠল উড। 'ঠিক বলেছ!'

'বেশ...' শুরু করল কিশোর, শেষ করতে পারল না।

জানালার বাইরে থেকে শোনা গেল গা জ্বালানো খিকখিক হাসি। বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে, মাথামোটার দল!' পায়ের শব্দ শোনা গেল।

জানালার কাছে দৌড়ে গেল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, 'শুঁটকি টেরি!'

বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে ছুটে যাচ্ছে তালপাতার সেপাই এক তরুণ,

তিন গোয়েন্দার চেয়ে কিছু বড়। ওদের চিরশত্রু টেরিয়ার ডয়েল।

'শুনে ফেলেছে,' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'আগেই ভাবা উচিত ছিল...'

'ভেব না,' সান্ত্বনা দিল কিশোর, 'বেশি দূর এগোতে পারবে না। বিলাবং বলে হয়ত হাঁসের পুকুরটা বুঝিয়েছেন কারমল, আপলস অ্যাণ্ড পেয়ারসের মানে গাছ না-ও হতে পারে। এত সহজ মনে হয় না। অন্য কোন মানে আছে।'

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। কেউ জবাব দিতে পারল না। ভ্রূকুটি করল সে। 'কারমলের ব্যাপারে যত বেশি জানতে পারব, তাঁর ধাঁধার সমাধান করা তত সহজ হবে।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল উডের দিকে।

'বেশ, শোন,' উকিল বলল। 'উনিশশো দুই সালে অস্ট্রেলিয়ায় জন্মেছিল কারমল। তার বাবা ছিল একজন আসামী। তখন আসামীদেরকে সাজা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাত ইংল্যাণ্ডের লোকেরা। বাপের চেয়ে কোন অংশে ভাল ছিল না কারমল, ছেলেবেলায়ই ভীষণ দুষ্টু ছিল। অল্প বয়েসেই বুশরেঞ্জার, মানে ডাকাত হয়ে গেল সে। ডাকাতি করে বড়লোক হল। তবে অপরাধী সে, আইনের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হত। তরুণ বয়েসে চলে গেল ক্যানাডায়, আরও অনেক টাকা কামাল, বিয়ে করল অনেক বয়েসে, একটা ছেলে হল। বছর বিশেক আগে এসেছিল রকি বীচে, তারপর একাই বাস করেছে। অনেকটা সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন। তার ছেলে বছর পাঁচেক আগে যখন মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, এলসার যাবার জায়গা রইল না। কাজেই তাকে নিজের কাছে নিয়ে এল বুড়ো। আলাদা কটেজ বানিয়ে দিল। দুনিয়ার সব মানুষকে সন্দেহ করত সে, কাউকে নিজের ঘরের ধারেকাছে ঘেঁষতে দিত না। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোন দেশকে ভালবাসত না, বাপের মতই গোঁড়া ককনি ছিল বোধহয়। দুর্ধর্ষ এক মানুষ।'

রবিন বলল, 'ধাঁধায় অস্ট্রেলিয়ান শব্দ ব্যবহার করেছেন কারমল। অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস বলে অস্ট্রেলিয়ান বা ক্যানাডিয়ান কিছু বোঝাননি তো?'

'বলতে পারব না,' বলে এলসার দিকে তাকাল উড।

এলসাও মাথা নাড়ল। বলল, 'বাড়ি চলে যাও এখন। গিয়ে ভালমত ভাব। দেরি হয়ে গেছে।'

নিরাশ হয়েছে নরি। তার হিরোরা পরাজিত, ধাঁধার সমাধান করতে পারেনি। তিন গোয়েন্দাও অখুশি। দেখল, পরাজিত হয়ে আরও অনেকেই ফিরে যাচ্ছে। নীরবে সাইকেল চালাল ওরা রকি বীচের দিকে।

নীরবতা ভাঙল মুসা, 'কিশোর, ককনি কি?'

'লণ্ডনের ঈস্ট এণ্ডে যাদের বাড়ি তাদেরকে বলে ককনি। কেউ কেউ বলে, সেইন্ট মেরিলবাউ গির্জার ঘন্টার শব্দ যতদূর যায়, ততদূরের মধ্যে যাদের জন্ম

তারা আসল ককনি। সে যাই হোক, ককনিদের কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণ অদ্ভুত। হটকে বলে অট, ব্রেমকে বলে ব্রাইম, এরকম। অস্ট্রেলিয়ানরাও করে ওরকম।'

'কিশোর,' রবিন বলল। 'উচ্চারণের ওপর ভিত্তি করে শব্দ বসানো হয়নি তো ধাঁধায়? হয়ত...'

সিটের ওপর হঠাৎ সোজা হয়ে গেল কিশোর। কেঁপে উঠে আরেকটু হলেই কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল সাইকেল। 'ককনিজ!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'হয়ত...'

'কিশোর!' বাধা দিল মুসা। স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাছে চলে এসেছে ওরা। রাস্তার ধারে একটা পরিচিত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে চোখ পড়েছে তার। 'শুঁটকি'!

লাল গাড়িটা খালি মনে হল। ভাল করে তাকাতে চোখে পড়ল, সামান্য নড়ল একটা মাথা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে টেরিয়ার। নিশ্চয় ওদের পিছু নিয়ে এসেছে।

'জলদি,' বলতে বলতে পকেট থেকে নকলটা বের করল কিশোর, 'এমন ভাব কর, যেন জরুরী কিছু জেনে ফেলেছি আমরা। তোমাদেরকে তদন্ত করতে পাঠাচ্ছি। তাড়াহুড়ো করে চলে যাবে, যাতে তোমাদের পিছু নেয় সে। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, দেখতে যাচ্ছি ঠিক কিনা। শুঁটকি পিছু নিক, চাই না।'

টোপ গিলল শুঁটকি। দ্রুত প্যাডাল করে একটা বাড়ির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার সময় স্পোর্টসকারের ইঞ্জিনের শব্দ শুনল রবিন আর মুসা।

ইয়ার্ডের গেট দিয়ে কিশোর ঢুকে যাওয়াতক অপেক্ষা করেছে টেরিয়ার, তারপর পিছু নিয়েছে রবিন আর মুসার।

তাকে পিছে পিছে টেনে নিয়ে চলল দুই সহকারী গোয়েন্দা। এমন ভাব করল, যেন কেউ পিছু নিয়েছে এটা বুঝতেই পারেনি। অহেতুক কয়েকটা আঁকাবাঁকা মোড় ঘুরে সময় নষ্ট করে শেষে বাড়ির পথ ধরল ওরা।

রবিনকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে অবাক হল শুঁটকি। তারপর মুসার পিছু নিল। খানিক পরে দেখল, মুসাও বাড়িতে ঢুকছে। ড্রাইভওয়েতে ঢুকে ফিরে তাকাল মুসা। হাহ্ হাহ্ করে হেসে শুঁটকির দিকে চেয়ে হাত নাড়ল রাগিয়ে দেয়ার জন্যে। গাড়ি ঘুরিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে চলে গেল শুঁটকি।

রাতে খাওয়ার পর কিশোরকে ফোন করল রবিন।

'কি জানি কোথায় গেল,' মেরিচাচী জবাব দিলেন। 'তাড়াহুড়ো করে খেয়েই বেরিয়ে গেল।...না, কোথায় গেছে বলে যায়নি।'

অবাক হয়ে রবিন ভাবল, গেল কোথায় কিশোর?

চার

পরদিন সকালে নাস্তার পরেও কিশোর ফোন করছে না দেখে রবিনকে ফোন করল মুসা।

'আমাকেও তো করেনি,' রবিন জানাল।

শেষে আর অপেক্ষা না করে স্যালভিজ ইয়ার্ডে চলল দু'জনে। হেডকোয়ার্টারে কিশোরকে পাওয়া গেল না। তাই তাকে ঘরে খুঁজতে চলল।

বাড়ির সামনে পিকআপ ট্রাকটার ইঞ্জিন মেরামত করছেন রাশেদ পাশা। রবিনের প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'কি জানি, কোথায় গেল। সেই ভোরে বেরিয়েছে। কি নাকি জরুরী কাজ। নাস্তাও করল না ভালমত।'

'চল, ইস্কুলেই দেখা হবে,' রবিন বলল।

'যদি আসে,' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা।

স্কুলেও কিশোরের দেখা মিলল না। ক্লাসরুমে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে বার বার একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে দুই গোয়েন্দা, এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল কিশোর। চওড়া হাসি উপহার দিল দুই বন্ধুকে। দুপুরে টিফিনের আগে আর কথা বলার সুযোগ হল না। স্কুলের সাইন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সে, সুতরাং টিফিনের সময়ও বেশ খানিকটা সময় কাটাতে হল ক্লাবে জরুরী মীটিঙে। আবার ক্লাস শুরু হওয়ার ঘন্টা বাজলে তাড়াহুড়ো করে রবিন আর মুসাকে বলল, 'পেয়েছি। চাবিকাঠি। ছুটির পর হেডকোয়ার্টারে চলে এস।'

শুক্রবারে একটা বাড়তি ক্লাস করতে হয় রবিন আর মুসাকে, কিশোরের সে ঝামেলা নেই। ফলে সে চলে গেল, দুই সহকারীকে বসেই থাকতে হল ক্লাসে। ছুটির পরে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে কৌতূহলে ফেটে পড়তে পড়তে ইয়ার্ডে এসে ঢুকল দু'জনে। কিভাবে যে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল, বলতে পারবে না। কিশোর বসে আছে তার জায়গায়।

'রাইমিং স্ল্যাং,' ঘোষণা করল সে।

ডেস্কের উপর ছড়ানো কয়েক পাতা কাগজে গিজগিজ করে কি লেখা।

'বাহ্, ভারি সহজ করে বললে!' নাক কুঁচকাল মুসা। 'একেবারে গ্রীক দিয়ে শুরু। তা স্ল্যাংটা কি?'

'কাল তোমাদের কথা থেকেই আইডিয়াটা পেয়েছি আমি,' কিশোর বলল। 'সেটাই জানতে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম, আমার ধারণাই ঠিক।'

'কিন্তু এই রাইমিং স্ল্যাং জিনিসটা কি?' রবিনের প্রশ্ন।

'এটা এক ধরনের অদ্ভুত-স্ল্যাং। যে শব্দটা বলতে চাও, সেটা বলার দরকার নেই, অন্য আরেকটা শব্দ দিয়ে সেটা বোঝাতে পারবে। শব্দের মানে এক হওয়ারও দরকার নেই, ছন্দের মিল থাকলেই হল। কবিতার মত করেও বলতে পার। এই যেমন, স্নো বোঝানোর জন্যে তুমি বলতে পার, ফল অ্যাণ্ড থ্রো।'

'মারছেরে! গ্রীক না, একেবারে মঙ্গল গ্রহের ভাষা,' আবার নাক কুঁচকাল মুসা। 'তারমানে বেসবল বোঝাতে হলে আমাকে বলতে হবে, থ্রো দ্য বল?'

'বলতেই হবে, এমন নয়, তবে ইচ্ছে করলে ওরকম করে বলে বোঝোতে পার। তবে বেসবল বোঝাতে হলে স্ল্যাঙে বল বলতে পারবে না, বলতে হবে অন্য কিছু। এই যেমন ডাউন দ্য ওয়াল, কিংবা শর্ট অ্যাণ্ড টল, অথবা আর কিছু।'

'বুঝেছি,' রবিন বলল। 'কিন্তু এই স্ল্যাঙের সঙ্গে ককনি আর কারমলের সম্পর্কটা কোথায়? দাঁড়াও দাঁড়াও, ওর বাবা ছিল ককনি!'

'এবং অস্ট্রেলিয়ান। ককনিরা ওই স্ল্যাঙের আবিষ্কারক, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। অন্য লোককে বোকা বানাতে নিজেদের মধ্যে এখনও ওই স্ল্যাঙের মাধ্যমে কথা বলে ককনিরা।'

'কারমলের ধাঁধার মত করে,' বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'রকি বীচের পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম আমি প্রথমে। তারপর লস অ্যাঞ্জেলেসের লাইব্রেরিতে। রাইমিং স্ল্যাঙের ওপর যত বই পেয়েছি সব ঘেঁটেছি।' ধাঁধার নকলটা টেনে নিল সে। 'প্রথমেই ধর, অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস। তারমানে, বুঝিয়েছে, স্টেয়ারস।'

'স্টেয়ারস? সিঁড়ি!' হাঁ হয়ে গেছে মুসা। 'জিন্দেগিতেও কল্পনা করতে পারতাম না আমি।'

'স্ল্যাঙের নিয়মকানুন না জানলে কেউই পারবে না,' কিশোর বলল। 'ইউ অ্যাণ্ড মি মানে কাপ অভ টি। ককনিতে ট্রাবল অ্যাণ্ড স্ট্রাইফ বলে ওয়াইফ, মানে স্ত্রী বোঝায়। তেমনি, বেড, অর্থাৎ বিছানাকে বলে আঙ্কেল নেড। কি বুঝলে?'

বিমল হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল কিশোরের।

'সমাধান তাহলে করে ফেললাম?' মুসার মুখেও হাসি।

'না না,' বেশ খুশি হয়েই যেন মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এত সহজ না। শয়তানী বুদ্ধিতে ঠাসা ছিল কারমলের মগজ। সমাধান এখনও অনেক দেরি। তবে রাইমিং স্ল্যাং থেকে কিছু সূত্র পেলাম এই যা। বাকিগুলো সমাধান করতে হবে যেখানে আমাদের যেতে বলা হয়েছে সেখানে গিয়ে।'

'কেন রাইমে সব জবাব নেই?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'না,' অস্বস্তি ফুটল কিশোরের কণ্ঠে। 'বলা যায় না, নতুন কোন কায়দা করে

রাখতে পারে কারমল?'

'বুঝব কি করে তাহলে?'

'রাইমের সূত্র আমাদেরকে যেখানে টেনে নিয়ে যায়, সেখানে গিয়ে হয়ত নতুন সূত্র পাওয়া যাবে। ধর, সিঁড়িতে যেতে বলা হয়েছে। যখন ওই সিঁড়ি পাব, হয়ত ওটার কাছে ধাঁধার পরের সূত্র "দ্য লেডি ফ্রম ব্রিস্টলের" মানে পেয়ে যাব।'

'চল তাহলে। হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস-এর মানে জানি আমরা, কারমলের বাড়ি। তারপর আসছে বটল অ্যাণ্ড স্টপার। মানে কি?'

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'সত্যিই তো। এর মানে তো জানি না।'

মিটিমিটি হাসল কিশোর। 'এটার মানে সব বইতেই পেয়েছি। সহজ। দণ্ড পাওয়া সব অপরাধীই জানে...'

'অপরাধী?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। 'বুঝেছি! স্টপার দিয়ে হবে কপার! কপ, অর্থাৎ পুলিশ!'

'ঠিক,' বলল কিশোর। 'বুড়ো কারমলের বাড়ির কাছে গিয়ে একজন পুলিশ খুঁজব।'

'চল, চল, দেরি করছি কেন তাহলে?' তর সইছে না আর মুসার।

সমস্ত নোট গুছিয়ে নিতে লাগল কিশোর। ওয়াকিটকি নিতে বলল সহকারীদের। বলা যায় না, দরকার হয়েও যেতে পারে।

সবে গিয়ে বেরোনোর জন্যে ট্র্যাপডোর তুলেছে মুসা, এই সময় বাজল টেলিফোন। কিশোর ধরল। 'তিন গোয়েন্দা বলছি। সরি, এখন কথা বলার সময় নেই, বাইরে বেরোচ্ছি।'

স্পীকারে ভেসে এল ভোঁতা একটা কণ্ঠ। 'না বেরোলেই ভাল করবে। সাবধান। অন্যের ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দিচ্ছি।'

খুট করে কেটে গেল লাইন। তারপর নীরবতা।

ঢোক গিলল রবিন। 'মহিলার গলা, কিশোর, তাই না?'

'ঠিক বুঝলাম না। তবে মহিলাই হবে, কথায় ব্রিটিশ টান।'

'জেনি এজটার?'

'তা কি করে হবে?' মুসা বলল। 'ওই বেটির সঙ্গে কথাই হয়নি আমাদের। আমাদের ফোন নাম্বার পেল কিভাবে? কারমলরা নিশ্চয় বলেনি।'

'জেনি নাহলে আর কে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আমাদের অচেনা কেউ? অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে?'

'এলমা কারমল হয়ত বলতে পারবে,' আশা করল রবিন।

অস্বস্তিভরে মাথা ঝাঁকাল অন্য দু'জন।

বাইরে বেরিয়ে সাইকেলে চাপল ওরা। গেট দিয়ে বেরোনোর সময় একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রাস্তার ওপাশের একটা বড় ঝোপের ধারে। বিশালদেহী। গলায় লাল টাই, হাসছে মনে হল। তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। যেন ভোলবাজি, এই ছিল এই নেই। পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা।

'স-সত্যিই ছিল?' ভূতের ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার।

'আমাদের ওপর নজর রাখছিল?' রবিনের প্রশ্ন।

'হয়ত,' বলল কিশোর। 'না-ও হতে পারে। সাধারণ কেউ, হয়ত বেড়াতে বেরিয়েছে।'

'তাহলে গেল কোথায়?' মুসা বলল।

'গেছে ওদিকেই কোথাও। রোদ বেশি, ছায়াও বেশি। ছায়ায় হারিয়ে গেছে বোধহয়।' রাস্তার সামনে পেছনে দু'দিকেই তাকাল। 'কেউ নেই। এস। ধাঁধার সমাধান করে রত্নগুলো বের করতে হবে আমাদের।'

'তা তো নিশ্চয়,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। 'তবে ডজনখানেক বটল অ্যাণ্ড স্টপার আমাদেরকে ঘিরে রাখলে এখন নিরাপদ বোধ করতাম আরকি।'

হেসে উঠল রবিন আর কিশোর। কিন্তু অস্বস্তি তাড়াতে পারল না।

পাঁচ

আগের দিনের চেয়ে বিচিত্র দৃশ্য কারমলের বাড়িতে। পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে হাত গুটিয়ে, কিছুই করার নেই ওদের। জিনিসপত্র ছড়াচ্ছে, লাথি মেরে বোতল ভাঙছে রত্নশিকারিরা। রেগে গেছে। যেন বুঝতে পারছে ঠকানো হয়েছে ওদেরকে।

কটেজের লিভিংরুমে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ওদের জন্যে নরিকে ফলের রস আনতে বলল এলসা। ওদের দিকে চেয়ে হাসল রস উড।

'বোকা বনেছ তো,' উকিল বলল। 'সবাই বনেছে। যা রাগা রেগেছে না ওরা। এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমরা ওদের পাওনা জিনিস কেড়ে নিয়েছি।'

মুসা বলে ফেলল, 'কিশোর বোকা বনেনি।'

'বলেছিলাম না!' চেঁচিয়ে উঠল নরি, ফিরে এসেছে। 'বলেছিলাম, বুঝে ফেলবে।'

'পাথরগুলো কোথায়, জেনেছ?' উড জিজ্ঞেস করল।

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে ধাঁধার সমাধানের চাবিকাঠি বোধহয় পেয়েছি। খানিকটার সমাধান করেও ফেলেছি। মিসেস কারমল, বিশেষ কোন

পুলিশম্যানকে কি চিনতেন আপনার শ্বশুর?'

'পুলিশ, মাথা খারাপ। পুলিশকে দু'চোখে দেখতে পারত না।'

'পুলিশ?' উড বলল, 'কেন, বোতল, বিলাবং আর নাশপাতি গাছের সঙ্গে পুলিশ খাপ খাচ্ছে নাকি?'

ফলের রস খেতে খেতে রাইমিং স্ল্যাঙের ব্যাপারটা জানাল কিশোর।

'এরকম আশ্চর্য কথা কখনও শুনিনি,' উকিল বলল। 'এলসা, তুমি শুনেছ?'

'না। আমি অস্ট্রেলিয়ানও নই, ইংলিশও নই,' এলসা বলল। 'তবে জেনি আর মাইক জানতে পারে, কারণ ওরা ইংরেজ।'

'সন্দেহ আছে,' বলল কিশোর। 'ককনিদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক থাকার কথা নয়।'

আগ্রহের সঙ্গে বলল নরি, 'মিস্টার সান আর দাদা মাঝে মাঝেই অদ্ভুত ভাষায় কথা বলত। কিশোর, সমাধান করে ফেলছি আমরা, তাই না?'

'তাই তো মনে হয়,' বলে নকলটা বের করে মেলল কিশোর। 'দেখি আলোচনা করে। প্রথমে, হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস, দ্য বটল অ্যাণ্ড স্টপার; শোজ দ্য ওয়ে টু দ্য বিলাবং। হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস রাইমিং স্ল্যাং নয়। এটা বোঝায় কারমলের বাড়ি। বই বলছে, বটল অ্যাণ্ড স্টপার মানে কপার, অর্থাৎ পুলিশ। বিলাবঙের মানে পুকুর কিংবা ডোবা কিংবা ঝর্না। তারমানে বলা হয়েছে, এখানে এসে একজন পুলিশম্যানকে খুঁজে বের করতে যে একটা বিশেষ জলাশয় চেনে।'

চেঁচিয়ে বলল উকিল, 'সেই পুলিশম্যানকে নিশ্চয় চেনার কথা তোমার!'

'কিন্তু চিনি না। তুমিও জানো পুলিশ দেখতে পারত না কারমল।'

'আছে নিশ্চয় একজন,' কিশোর বলল। 'থাক, সেটা পরে দেখা যাবে। পরের ধাঁধাটা দেখা যাক এবার। অ্যাবাভ দ্য অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস অল অ্যালোন; দ্য লেডি ফ্রম ব্রিস্টল রাইডস ফ্রম আ ফ্রেণ্ড। অ্যাপল অ্যাণ্ড পেয়ারস হল গিয়ে সিঁড়ি। তবে লেডি ফ্রম ব্রিস্টলের মানে কি জানি না আমরা এখনও। আর রাইডস ফ্রম আ ফ্রেণ্ডও রাইম মনে হচ্ছে না। এটা অন্য কোন ধরনের কোড।'

'তারমানে দাঁড়াল,' রবিন বলল, 'বিশেষ জলাশয়টার কাছে কোন সিঁড়ি পাব আমরা। এবং তার ওপরে ব্রিস্টলের মহিলা কোন একটা সূত্র দেবে একজন বন্ধুকে।'

'নাহ্,' গুঙিয়ে উঠল মুসা, 'এখন আর সহজ লাগছে না।'

'ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে এগোতে হবে,' বলল কিশোর। 'ফ্রেণ্ড বলেছেন বটে, কিন্তু বন্ধুর কথা হয়ত বোঝাননি। সে পরে দেখা যাবে। পরের ধাঁধাটা বলছেঃ

অ্যাট দ্য টেনথ বল অভ টোয়াইন, ইউ অ্যাণ্ড মি; সী আওয়ার; ও হ্যাণ্ডসাম মাগ অ্যাহেড।' ভুরু কোঁচকাল সে। 'কঠিন হচ্ছে আস্তে আস্তে। ইউ অ্যাণ্ড মি-এর মানে, আ কাপ অভ টি, বা এক পেয়ালা চা। কিন্তু বল অভ টোয়াইনের মানে বুঝতে পারছি না। আর, সী আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ অ্যাহেডও রাইম নয়। এই তিনটের তো কিছু কিছু মানে করতে পেরেছি, চার নাম্বারটা একেবারে দুর্বোধ্য। ওয়ান ম্যান'স ভিকটিম ইজ অ্যনাদার'স ডারলিন', ফলো দ্য নোজ টু দ্য প্লেস। এটাতে রাইম আছে কিনা সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'ইউ অ্যাণ্ড মি যদি এক কাপ অভ টি হয়,' এলসা বলল, 'হ্যাণ্ডসাম মাগ বলে হয়ত বিশেষ কোন চায়ের পাত্রের কথা বুঝিয়েছে।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে,' একমত হল কিশোর।

'কিন্তু,' রবিন প্রশ্ন তুলল, 'কারমল বলছেন, আওয়ার মাগ। দ্য মাগ কিংবা হিজ মাগ বলেননি। আর চতুর্থ ধাঁধায় তোমার নাক বা আমার নাক না বলে কেন দ্য নোজ বা নাকটি বললেন?'

'এখনও বুঝিনি,' স্বীকার করল কিশোর। 'তবে আমি শিওর, কারণ একটা নিশ্চয় আছে, যাই হোক, পঞ্চম ধাঁধা বলছে, হোয়্যার মেন বাই দেয়ার ট্রাবল অ্যাণ্ড স্ট্রাইফ, গেট আউট ইফ ইউ ক্যান। ট্রাবল অ্যাণ্ড স্ট্রাইফের মানে ওয়াইফ। কারমলের কথার মানে দাঁড়াচ্ছে, একজন স্ত্রী কিন। এর কোন অস্ট্রেলিয়ান মানে আছে, মিসেস কারমল? সেটেলাররা ইংল্যাণ্ড থেকে স্ত্রী কিনে নিয়ে যেত, না?'

'তা অনেকটা ওরকমই,' এলসা বলল। 'সেটেলারদের জন্যে জাহাজ বোঝাই করে মেয়েমানুষ পাঠানো হত। ওখান থেকে যার যার পছন্দমত স্ত্রী বাছাই করে নিত ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হুঁ, খাপ খাবে মনে হচ্ছে। গেট আউট ইফ ইউ ক্যান বলে হয়ত বিয়ে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে বলেছে। যদিও মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এবার আসা যাক ছয় নম্বর ধাঁধায়। ইন দ্য পশ কুইন'স ওল্ড নেড, বি ব্রাইট; অ্যাণ্ড নেচারাল অ্যাণ্ড দ্য প্রাইজ ইজ ইওরস। ওল্ড নেড মানে বিছানা। পশ হলোগে ফিটফাট। তারমানে পাথরগুলো পাওয়া যাবে ফিটফাট কোন রানীর বিছানায়।'

আনমনে মাথা নেড়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল উকিল, 'কোন্ রানী? কিসের বিছানা? কোন্ মিউজিয়মে আছে?'

'থাকতে পারে। তবে শেষ ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় হয়নি। আগেরগুলোর সমাধান করতে না পারলে এটা বোঝা যাবে না।'

'এখন তাহলে প্রথম কাজ,' রবিন বলল, 'বটল অ্যাণ্ড স্টপার খুঁজে বের করা,

যে জানে জলাশয়টা কোথায়।'

'হতে পারে, ওই জায়গাটা পছন্দ ছিল কারমলের,' অনুমান করল মুসা। 'সাঁতার কাটতে যেতেন, কিংবা পানি আনতে, কিংবা মাছ ধরতে...'

'মাছ ধরতে!' চেঁচিয়ে উঠল নরি। 'মা, আমাদের বাড়ির পাশের কাউন্টি পার্কে মাছ ধরতে যেত দাদা! ডেপুটি গ্যারেটকে নিয়ে যেত!'

'ডেপুটি শেরিফ!' কথাটা ধরল রবিন। 'তারমানে পুলিশম্যান! কাউন্টি পুলিশম্যান!'

'তাই তো,' উকিল বলল। 'পার্কের পুলিশ অফিসার।'

হঠাৎ ফিসফিসিয়ে মুসা বলল, 'কিশোর, রাস্তায়!'

সবাই দেখল, গাছের নিচে পার্ক করা একটা নীল গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশালদেহী একজন লোক।

'আরেকজন গুপ্তধন শিকারি হবে হয়ত,' আন্দাজ করল উকিল।

'হয়ত,' কিশোরের কণ্ঠে অস্বস্তি। ইয়ার্ড থেকে বেরিয়েও লোকটাকে দেখেছে, সেকথা জানাল।

দরজার দিকে রওনা দিল উড। 'জিজ্ঞেস করা দরকার।'

ছেলেরা দেখল, উকিল রাস্তায় নামতেই গাড়িতে উঠে বসল লোকটা। চলে গেল। ফিরে এল উড।

'ওই মজা দেখতেই এসেছে,' বলল সে। 'অনেক আসছে ওরকম।'

উঠে দরজার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। পেছনে এল নরি। 'আমিও তোমাদের সঙ্গে কাজ করছি, মনে আছে?'

'তোমার কাজের দরকার নেই, নরম্যান,' পেছন থেকে কড়া গলায় বলল তার মা।

'হ্যাঁ, তোমার মা ঠিকই বলেছেন,' মুসা বলল। 'তুমি এখনও নেহায়েতই শিশু।'

'শিশু!' চিৎকার করে বলল নরি। 'ফিরিয়ে নাও বলছি! ফিরিয়ে নাও কথাটা!'

'আসলে,' বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'তুমি আমাদের সঙ্গে এলে কাজের চেয়ে বাধাই সৃষ্টি করবে বেশি, নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

রাগে গাল ফুলিয়ে ফেলল নরি। 'আমি, আমি তোমাদের সবাইকে দেখিয়ে দেব দাঁড়াও...!' বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

বাইরে বেরিয়ে সাইকেলে চাপল গোয়েন্দারা। পকেটে চাপড় দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল কিশোর যে, ওয়াকিটকি আছে! বলল, 'চল।'

রাস্তায় পড়ে, বাঁয়ে মোড় নিল ওরা, মুখ ঘোড়াল কাউন্টি পার্কের দিকে।

জায়গাটা শহরের বাইরে। পথের ডানে গাছপালায় ছাওয়া প্রায় বুনো এলাকা। খানিক দূরে একটা বড় শপিং সেন্টার। বাঁয়ে গড়ে উঠেছে বোটানিক্যাল গার্ডেন, সুন্দর, দুর্লভ অনেক গাছও রয়েছে ওখানে। বাগানের পেছনে পাহাড়। কারমলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটা পথ, উঠে গেছে পাহাড়ী আবাসিক এলাকায়।

পার্কে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা। জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে উঠে চলল পাহাড়ী পথ বেয়ে। পেছনে একটা গাড়ি মোড় নেয়ার শব্দ হল, তারপর এগিয়ে আসতে লাগল। পেছনে তাকিয়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল মুসা। গাড়িটা সোজা এগিয়ে আসছে, থামার বা পাশ কাটানোর কোন লক্ষণ নেই।

'নাম, সরো রাস্তা থেকে!' চেঁচিয়ে উঠেই নিজের সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দিল মুসা। নেমে পড়ল পাশের খাদে। শাঁ করে ছুটে গেল একটা লাল স্পোর্টস কার, সময়মত সরতে না পেরে লেগে গেল রবিনের সাইকেলের সঙ্গে, ফেলে দিল ওটাকে। সাইকেল পড়ার আগেই লাফ দিয়ে খাদে পড়ল রবিন। গাড়িতে বসা হাসি হাসি মুখটার দিকে মুঠো নাচাল মুসা। চিৎকার করে বলল, 'শুঁটকি, রাখ, ধরতে পারলে মজা দেখাব!' বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'কাল সন্ধ্যায় ওকে বোকা বানানোর প্রতিশোধ নিল ব্যাটা।'

'ওটার শিক্ষা আর হবে না কোনদিন,' আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। রবিনকে টেনে তোলার জন্যে হাত বাড়াল। 'সব গড়বড় করে দিতে পারে। নজর রাখতে হবে ওর ওপর। বিপদেও ফেলে দিতে পারে।'

আর অল্প কিছুদূর উঠেই ডেপুটির অফিস চোখে পড়ল ওদের। কেউ নেই। বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাল।

হাত তুলে দেখাল রবিন, 'ওই দেখ, কতগুলো গাছ। আর ওই যে পুকুর।'

ঝড় বয়ে গেছে যেন পুকুর পাড়ের বাগানে। হাঁসের পুকুরের চারপাশে যত আপেল আর নাশপাতি গাছ আছে সবগুলোর সর্বনাশ করে ফেলা হয়েছে। ডালপালা একটারও নেই, সব ভাঙা। অসংখ্য হাঁস থাকার কথা পানিতে, অথচ আজ একটাও নেই।

শুধু গাছই নষ্ট করেনি, পুকুর পাড়ের মাটিও খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ছোট-বড় অনেক গর্ত। ওখানে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

'কে জানি আসছে,' বলতে বলতে একটা ডাল তুলে নিল মুসা। 'গুপ্তধন খুঁজতেই আসছে বোধহয়...'

'এই, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক!' ধমক দিয়ে বলল একটা কণ্ঠ।

পাঁই করে ঘুরল ওরা। ছোটখাট একজন মানুষ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে

ওদের দিকে। পরনে শেরিফের পোশাক। আবার বলল, 'অ্যারেস্ট করা হল তোমাদের।'

ছয়

শান্ত রইল কিশোর। 'আপনি কি ডেপুটি গ্যারেট?'

'হ্যাঁ,' বলেই গর্জে উঠল শেরিফ, 'অনেক জ্বালাতন হয়েছে! মরা মানুষের ধাঁধা, যত্তসব! তোমাদেরকে অ্যারেস্ট করলাম।'

'কিন্তু,' প্রতিবাদ জানাল রবিন, 'আমরা…'

শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'ভাল করে খেয়াল করে দেখুন, ডেপুটি, পাতাগুলো কেমন শুকিয়ে আছে। আমরা আসার অনেক আগে ভাঙা হয়েছে এসব ডাল, সম্ভবত গতকাল। আমরা এইমাত্র এসেছি।'

'তোমরা,' ডেপুটির কণ্ঠে সন্দেহ। 'কারমলের গুপ্তধনের জন্যে না এলে কিসের জন্যে এসেছ?'

'আমরা খুঁজতেই এসেছি…'

'বলেছিলাম না!' চেঁচিয়ে উঠল ডেপুটি। 'ঠিকই আন্দাজ করেছি আমি।'

'কিন্তু,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। 'এই পুকুর আর গাছপালার সঙ্গে গুপ্তধনের সম্পর্ক নেই। ভুল করে এগুলো নষ্ট করে দিয়ে গেছে লোকেরা। আমরা ওদের দলের কেউ নই। মিসেস কারমল আমাদের ভাড়া করেছেন তাঁদের জিনিস খুঁজে দিতে।'

'ভাড়া?' সন্দেহ যায়নি শেরিফের।

'আমরা গোয়েন্দা,' জানাল মুসা।

চীফ ইয়ান ফ্লেচারের দেয়া সার্টিফিকেট বের করে দেখাল কিশোর। 'ইচ্ছে করলে ফোন করে তাঁর কাছ থেকে আমাদের কথা জেনে নিতে পারেন। মিসেস কারমলকেও ফোন করতে পারেন।'

শ্রাগ করল ডেপুটি। 'চীফের সই বলেই মনে হচ্ছে। তাহলে তোমরা তিন গোয়েন্দা?' মাথা চুলকাল সে। 'তোমাদের বিশ্বাস কারমল সত্যিই কিছু লুকিয়েছে? ফালতু রসিকতা নয়?'

'না। আর আমরা আপনার সাহায্য চাই।'

'আমার সাহায্য? বলে কি! আমি কি সাহায্য করব?'

'বিলাবংটা কোথায় আমাদের বলবেন,' মুসা বলল।

হাঁ হয়ে গেল ডেপুটি। 'বিলাবং! সেটা আবার কি জিনিস?'

'ডোবা, কিংবা ঝর্না,' বলল কিশোর। 'কোন ধরনের জলাশয়। যেটাতে আপনি আর কারমল মাছ ধরতেন। পার্কে আছে ওরকম জায়গা?'

'আছে। পুরানো একটা দীঘি। আগে পর্বতের ওদিক থেকে পানি আনতে হত আমাদের। পরে ওয়াইনেজ ক্রিকে বাঁধ দিয়ে পানির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন আর পানির জন্যে ওখানেও যাওয়ার দরকার পড়ে না। মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যায় লোকে, বিশেষ পাওয়া যায় না। বসন্তে ছাড়া অন্য সময় পানি খুব কম থাকে। পুরানো সব ফিডার ক্রিকগুলোকে সিমেন্টে বাঁধ দিয়ে মুখ আটকে দেয়া হয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে ওই মেইন ক্রিকটা বাদে। ওখানে একটা পুরানো হাউসবোট আছে, তাতে উঠেই ছিপ ফেলতাম আমরা।'

'কোনদিক যেতে হবে, বলবেন স্যার?' অনুরোধ করল রবিন।

'সহজ। ওই যে পথটা, ওটার পাশেই পড়বে। পার্কের মেইন বাস স্টপের কাছে গিয়ে নিচে তাকালেই দেখতে পাবে।'

ডেপুটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাইকেলের দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। দ্রুত পেডাল ঘুরিয়ে চলল। খানিক পরেই দেখতে পেল বাঁধটা, ওদের ওপরে, ডান দিকে। বিশ ফুট চওড়া পানির ধারা বয়ে চলেছে সগর্জনে। উঠেই চলল ছেলেরা, বাঁধের পাশাপাশি এসে থামল। এখান থেকে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে ওয়াইনেজ ক্রিকে। মূল সড়কটা দীঘির পাশ দিয়ে গিয়ে পাক খেয়ে উঠে গেছে পর্বতের ওপরে।

কাঁচা রাস্তা ধরে কিছুদূর এগোতেই নজরে এল হাউসবোট। খাঁড়ির পাড়ে বাঁধা। ওখানে বাঁধের জলধারা তিরিশ ফুট চওড়া। তীব্র গতিতে ছুটছে বোটের পাশ দিয়ে।

'যাক,' সাইকেল কাত করে রাখতে রাখতে বলল রবিন, 'বটল অ্যাণ্ড স্টপার অবশেষে বিলাবং দেখাল আমাদের।'

'এখন অ্যাবাভ দ্য অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস অল অ্যালন খোঁজা দরকার,' বলল মুসা। 'সিঁড়ি। আমার মনে হয় ওটাই।'

খাড়া একটা কাঠের সিঁড়ি, বরং মই বলা ভাল, বোটের মেইন ডেক থেকে উঠে গেছে কেবিনের চ্যাপ্টা ছাতে। ছুটল মুসা। একটা তক্তা ফেলে বোটে ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওটা বেয়ে গিয়ে বোটে উঠল সে। তারপর সিঁড়িতে। রেলিঙে ঘেরা ছাত। পুরানো কাঠের বাক্স, মাছের খাবারের টিন, আর আরও নানারকম জঞ্জাল পড়ে রয়েছে।

'লেডি ফ্রম ব্রিস্টল খোঁজ,' কিশোর বলল।

খুঁজতে শুরু করল ওরা। বাক্স উল্টে, মাছের টিন ঝাড়া দিয়ে, জঞ্জাল সরিয়ে,

যত রকমে খোঁজা সম্ভব কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু কিচ্ছু পাওয়া গেল না। এমনকি আলগা কয়েকটা তক্তা সরিয়ে তার তলায়ও উঁকি দিল কিশোর।

'নাহে,' নিরাশ হয়ে মাথা নাড়ল মুসা, 'ব্রিস্টলের সঙ্গে রাইম মেলাতে পারছি না।'

'কিন্তু এখানেই থাকার কথা,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আমি শিওর, ঠিক পথেই এগোচ্ছি। গ্যারেট একজন পুলিশম্যান, কারমলকে চিনত। গ্যারেটই এই বিলাবঙের খোঁজ দিয়েছে আমাদের। ভুল হতে পারে না।'

'তীরে দাঁড়িয়ে কিছু দেখার কথা বলেনি তো কারমল?' রবিন প্রশ্ন তুলল।

রেলিঙের ছাতে দাঁড়িয়েই চারপাশে তাকাল ওরা। খাঁড়ির দু'তীরেই বন। দূরে উঠে গেছে পর্বতের ঢাল। শুকনো, সিমেন্টে তৈরি একটা নালা ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে। ব্রিস্টলের সঙ্গে ছন্দে মেলে, এরকম কিছু চোখে পড়ল না।

'আচ্ছা, হুইসল না তো?' বলে বোটের সামনের হুইলহাউসের ছাতে বসানো ছোট একটা এয়ার-হর্ন দেখাল কিশোর।

'হুইসল অবশ্য বলা যায়,' ধীরে ধীরে বলল মুসা। 'তবে আসলে ওটা হর্ন। তাছাড়া ব্রিস্টল আর হুইসলের মধ্যে ঠিক ছন্দে মিলছে না। কোনদিকে নির্দেশ করছে ওটা, কিশোর?'

'ওপরে,' রবিন বলল। 'আকাশের দিকে।'

'ঠিকই বলেছ, মুসা,' একমত হল কিশোর। 'আসলে আমরা যা খুঁজছি সেটা ব্রিস্টলের সঙ্গে পুরোপুরি মিলতে হবে। আর এমন কিছুকে নির্দেশ করবে, যা থেকে বেরিয়ে আসবে রাইডস ফ্রম আ ফ্রেন্ড-এর সমাধানের সূত্র। হয়ত ভুল করেছি আমরা, ভুল জায়গায়...'

সবাই শুনতে পেল শব্দটা। নিচে কোনখান থেকে এসেছে, ভারি একটা তক্তা মাটিতে পড়েছে বোধহয়।

রেলিঙের ধারে ছুটে গেল ছেলেরা। তীরে দাঁড়িয়ে আছে শুঁটকি টেরি। ওদের দেখে দাঁত বের করে হাসল।

'আবার দেখা হয়ে গেল, একেবারে ঠিক সময়ে,' বলে খিকখিক করে উঠল সে। 'সব শুনেছি, সিঁড়িটা কোথায় তা-ও জানি। ধাঁধার সমাধান এবার করেই ফেলব।' হাসি। 'এই সুযোগে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আস তোমরা।'

'কিশোওর!' চিৎকার করে বলল রবিন। 'হাউসবোটটা খুলে দিয়েছে!'

মাটিতে পড়ে আছে তক্তা, যেটা বেয়ে উঠেছে ওরা। যে দড়ি দিয়ে বোটটা বেঁধে রাখা হয়েছিল, ওটা খোলা, পানিতে পড়েছে। দুমদাম করে সিঁড়ি বেয়ে মেইন ডেকে এল ছেলেরা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই তীর থেকে দশ-

বারো ফুট সরে চলে এসেছে বোট, গা ভাসিয়ে দিয়েছে স্রোতে।

মুঠো পাকিয়ে দেখাল মুসা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'শুঁটকি, ধরতে পারলে...'

'যাও, বেড়িয়ে এস খোকাবাবুরা,' চেঁচিয়ে বলল টেরিয়ার। 'ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে তীরে উঠে আসতে পারবে।' খুব সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। ঘুরে দৌড় দিল কাঁচা রাস্তার দিকে।

'দাঁড়াও, ধরে নিই আগে!' শাসিয়ে বলল মুসা। 'ঘাড় মটকে না দিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়...'

'সব্বোনাশ!' আঁতকে উঠল রবিন। 'বাঁধ!'

মুসা আর কিশোরও ফিরে তাকাল। ভেসে যাচ্ছে বোট, গতি বাড়ছে দ্রুত। বাড়ছে পানির গর্জন। বাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে জলপ্রপাতের মত নিচে আছড়ে পড়ছে বিশাল এই জলরাশি।

সাত

ভেসে চলেছে হাউসবোট।

'ঝাঁপ দিয়ে পড়,' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'সাঁতরে উঠব।'

'নাআ!' সময়মত নেতৃত্ব নিয়ে নিয়েছে মুসা। 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। দু'জনেই।'

জমে গেল যেন কিশোর আর রবিন।

'স্রোত খুব বেশি,' মুসা বলল। 'টেনে নিয়েই যাবে, বুঝতে পারছি।' জরুরী কণ্ঠে নির্দেশ দিল, 'জলদি গিয়ে ওপরে ওঠ।'

মুসাকে অনুসরণ করে ওপরের ডেকে উঠে এল দু'জনে। ভয়ঙ্কর স্রোত। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে বাঁধটা।

'বাক্স-টাক্স যা আছে, সব জলদি ফেল পেছন দিকে,' আবার বলল মুসা।

ফেলতে ফেলতে হাঁপিয়ে গেল ছেলেরা। সবে ফেলা শেষ করেছে, এই সময় আওয়াজ হল বোটের তলায়, ঘষা লেগেছে কোন কিছুর সঙ্গে। থেমে গেছে বোট। কিশোর বলল, 'আমরা...আমরা বাঁধের ওপর চলে এসেছি!'

সামনে শুধুই শূন্যতা। অনেক নিচ থেকে কুয়াশা উঠছে, যেখানে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে পানি। ঢোক গিলল রবিন, চেহারা ফ্যাকাসে। বাঁধের ওপর প্রায় ঝুলে থেকে দুলছে বোটটা, সেদিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল কিশোর।

জোরে কেঁপে উঠল একবার বোট, ঝটকা দিয়ে আগে বাড়ল, তারপর আবার

থেমে গেল। দুই ধার দিয়ে বয়ে গিয়ে ঝরে পড়ছে পানি।

'গুড। বাঁধের ওপর আটকা পড়েছি আমরা,' শান্তকণ্ঠে বলল মুসা।

চোখ মেলল কিশোর। পা বাড়াতে গেল।

'না না, নড়ো না!' তাড়াতাড়ি বাধা দিল মুসা।

থেমে গেল আবার গোয়েন্দাপ্রধান।

'পেছনটা আটকেছে,' মুসা বলল। 'জিনিসপত্র ফেলে ভারি করে ফেলেছি। আমাদেরও ভার রয়েছে। নাহলে আটকাত না।' নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে ছেলেরা। চারপাশে তাকাল। বাঁধের কিনারে আটকেছে বোট, তীর দু'দিকেই দশ ফুট দূরে। ঠিক মাঝখানে রয়েছে ওরা।

'কি করা এখন?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে মুসা, ভেবে দেখল কি করা যায়। 'সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছতে পারব না। লাফিয়েও পেরোতে পারব না এতদূর। মাথার ওপরে এমন কোন ডালও নেই যে ধরে বেয়ে বেয়ে চলে যাব। তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গেলে বোটটা যাবে পড়ে।'

'কি করা যায়, বল তো মুসা?' গলা কাঁপছে কিশোরের।

'নিচে দড়ি দেখতে পাচ্ছি,' মুসা বলল। 'ওটার মাথায় ফাঁস বানিয়ে ল্যাসোর মত তীরে ছুঁড়ে মারা গেলে, কোন ভাঙা গাছের গুঁড়িতে আটকানো যাবে। তারপর ওই দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে পেরিয়ে যেতে পারব। রবিন, তোমার ওজন সব চেয়ে কম। যাও, দড়িটা নিয়ে এস।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দড়ির জন্যে রওনা হল রবিন। দুলে উঠল বোট, ঘ্যাস্‌স্‌ করে আওয়াজ হল নিচে, ঝটকা দিয়ে আগে বাড়ল খানিকটা।

'ওদিক দিয়ে নয়!' হুঁশিয়ার করল মুসা। 'পেছন দিয়ে যাও, রেলিঙের ওপর দিয়ে বেয়ে নামো। আমরা আরও পেছনে সরে ভার চাপাচ্ছি।'

আরেকবার মাথা ঝাঁকিয়ে রেলিঙে উঠে পড়ল রবিন। রেলিঙ ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর আলগোছে ছেড়ে দিল হাত। খুব আস্তেই পড়ল নিচের ডেকে। দড়ির বাণ্ডিল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ওপরে।

দড়ি খুলে একমাথায় একটা ফাঁস বানিয়ে ফেলল মুসা। শরীর যথাসম্ভব কম নেড়ে, কম ঝাঁকিয়ে ফাঁসটা ছুঁড়ে মারল একটা গাছ সই করে। গাছের তিন ফুট দূরে পড়ল ফাঁসটা।

টেনে এনে আবার চেষ্টা করল সে। ভাঙা গাছের গোড়ায় পড়ল ফাঁসটা। ভীষণ দুলে উঠল বোট। টাল সামলাতে না পেরে পড়েই যাচ্ছিল কিশোর, কোনমতে রেলিঙ ধরে সামলাল। পানি যেদিক থেকে আসছে সেদিকে চোখ

পড়তেই রক্ত সরে গেল মুখ থেকে। তোতলাতে শুরু করল, 'মু-মুসা, গাছ। এসে বাড়ি মারলে গেছি…'

ভেসে আসা বিশাল গুঁড়িটার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল মুসা, আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে খুলে ফেলতে লাগল বাণ্ডিলের বাকি দড়ি। তারপর সাবধানে নিশানা করে ছুঁড়ে মারল আবার ফাঁস। এইবার কাজ হল, ভাঙা গাছের কাণ্ড গলে আটকে গেল ফাঁস। দড়িটা টান টান করে এদিকের মাথা শক্ত করে বেঁধে ফেলল রেলিঙে। বলল, 'রবিন, তুমি আগে যাও।'

সরে গিয়ে ওপরে হাত তুলে দড়িটা ধরল রবিন। ঝুলে ঝুলে এগোল। খুব তাড়াতাড়িই তীরের মাটিতে গিয়ে দাঁড়াল সে। তাড়াতাড়ি ফাঁসটা টেনে নামিয়ে দিল গাছের গোড়ার দিকে। যাতে আরও শক্ত হয়ে আটকে থাকে।

'কিশোর, এবার তুমি যাও,' মুসা বলল।

দ্বিধা করল কিশোর। দেখল, ছুটে আসছে গাছের গুঁড়িটা। একবার ঢোক গিলে, দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। ভাবছে, সময়মত পেরোতে পারবে তো? পারল। কিছুক্ষণ পরেই রবিনের পাশে এসে দাঁড়াল সে।

দু'জনের ভার সরে যাওয়ায় অনেক হালকা হয়ে গেল বোটের পেছনটা। আটকা পড়া কুটোর মত দুলতে শুরু করল, এপাশ ওপাশ নড়ছে গলুই। গাছের গুঁড়িটাও প্রায় এসে গেছে। দেরি করল না আর মুসা। দড়ি ধরে ঝুলে পড়ে সড়সড় করে নেমে চলে এল অনেকখানি। তার পা-ও মাটি ছুঁল, গুঁড়িটাও এসে ধাক্কা মারল বোটটাকে।

ছেলেদের ভার সরে যাওয়ায় এমনিতেই সরি সরি করছিল বোট, ধাক্কা খেয়ে আর আটকে থাকতে পারল না। সড়াৎ করে পেরিয়ে গেল বাঁধের বাকি অংশ, হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে গেল দড়ি।

পাথরে বাড়ি খেয়ে বোট ভাঙার মড়মড় শব্দ কানে এল ছেলেদের, কাঁটা দিল গায়ে।

'হউফ,' করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল রবিন।

এতক্ষণে রাগ দেখা দিল মুসার মুখে। 'শুঁটকি!' মুঠো শক্ত হয়ে গেল তার। 'দাঁড়া, আগে ধরে নিই…'

'শুঁটকি,' ঘোর ভাঙল যেন কিশোরের, 'আমাদের আগে চলে গেছে! সে বলেছে, সিঁড়িটা কোথায় জানে। এস।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আবার গোয়েন্দাপ্রধানের চোখের তারা। বিপদ কেটে গেছে, তার মগজও চালু হয়ে গেছে পুরোদমে।

'আশেপাশেই কোথাও আছে সিঁড়িটা,' বলল সে। 'আলাদা আলাদা হয়ে খুঁজব

আমরা। ওয়াকিটকিতে যোগাযোগ রাখব। কারও চোখে কোন সিঁড়ি পড়লেই অন্যকে জানাব।'

ওয়াইনেক ক্রিকের ধার ধরে খুঁজতে শুরু করল ওরা। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে খুঁজল, কিছুই চোখে পড়ল না।

'ভুল হয়েছে কোথাও,' ওয়াকিটকিতে বলল কিশোর।

'কি জানি!' জবাব দিল মুসা।

'কিশোর,' রবিন বলল, 'প্রথম ধাঁধাটার সঠিক সমাধান হয়েছে তো? তুমি কি শিওর, বিলাবং মানে জলাশয়?'

'নিশ্চয়...,' থেমে গেল কিশোর। দ্বিধায় পড়েছে। 'ডিকশনারিতে অবশ্য দেখিনি। অন্য কোন মানে থাকতেও পারে। কাছাকাছি টেলিফোন কোথায় বল তো?'

'ডেপুটির অফিসে,' জবাব দিল মুসা। 'যাব নাকি? সাইকেলের কাছাকাছি রয়েছি আমি।'

'যাও। লাইব্রেরিয়ানকে ফোন করে জিজ্ঞেস কর, কি কি মানে হয়। কুইক।'

মুসা গেছে অনেকক্ষণ হয়েছে। পশ্চিম দিগন্তে নেমে যাচ্ছে সূর্য। অন্ধকার হয়ে যাবে শিগগিরই, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কিশোর। ভাবছে, মুসাকে খুঁজতে যাবে কিনা, এই সময় হঠাৎ ওয়াকিটকিতে শোনা গেল তার কণ্ঠ।

'কিশোর? রবিন? আছ ওখানে?'

'আছি, সেকেণ্ড,' জবাব দিল কিশোর। 'কি জানলে?'

'অনেক মানেই হয় বিলাবঙের। মূল জলধারা থেকে বেরোনো উপ-জলধারা, যেটা আর কোন জলধারার সঙ্গে মিশতে পারে না, কোথাও গিয়ে বুজে কিংবা মরে যায়, তাকে বলে বিলাবং।'

'নেই ওরকম,' রবিন বলল। 'এখানে দেখিনি।'

'তাহলে আরেক রকমের কথা বলি। শুধু বর্ষাকালে পানি বহন করে এরকম জলধারাকেও বিলাবং বলে।'

'হ্যাঁ, হয়েছে, এইটাই!' বলে উঠল কিশোর। 'সিমেন্টে তৈরি ওই নালাটা, পর্বতের ঢাল বেয়ে যেটা নেমে এসেছে বাঁধে। বৃষ্টি হলেই শুধু পানি বহন করে ওটা, এমনিতে থাকে শুকনো। মুসা, ওখানে মিলিত হব আমরা।'

কয়েক মিনিট পর নালাটার মুখের কাছে এসে দাঁড়াল রবিন আর কিশোর। ওয়াইনেজ ক্রিক এখানে সব চেয়ে চওড়া। সিমেন্টে তৈরি নালাটা বাঁকা হয়ে উঠে গেছে ঢাল বেয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে। নালার দু'পাড় ধরে

ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল দু'জনে।

'কিছুই নেই,' মাথা নাড়ল রবিন। 'সিঁড়ির চিহ্নও দেখছি না।'

'থাকতেই হবে। আমি এখন শিওর, বুড়ো কারমলের বিলাবং এটাই। এস।'

কমে আসছে দিনের আলো। আবার আগের জায়গায় নেমে আসতে শুরু করল দু'জনে। খানিকটা নেমেছে, হঠাৎ ওয়াইনেজ ক্রিকের অন্য পাড় থেকে শোনা গেল মুসার চিৎকার।'এই, পেয়েছি, কোথায় তোমরা?'

প্রায় ছুটে নেমে এল দু'জনে। হাত তুলে ঝর্নার ভাটির দিকে দেখাল মুসা, ওদের বাঁয়ে।

'কই?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'আমি তো কিছু দেখছি না।'

'এখান থেকে দেখা যাবে না,' কিশোর বলল। 'চল ওখানে যাই।' ঝোপঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ছুটতে শুরু করল। তার পিছে রবিন। কয়েক মিনিট পরেই সিঁড়িটা দেখল ওরাও। অনেক পুরানো, কাঠের তৈরি। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে আসা পড়ন্ত রোদে সোনালি দেখাচ্ছে। আশেপাশে ঝোপ গজিয়ে উঠেছে। পর্বতের গা থেকে অর্ধেক নেমে এসেছে সিঁড়ি, নিচের অংশ নেই।

'প্যানির তোড়ে ভেঙে চলে গেছে,' কিশোর আন্দাজ করল, 'কিংবা পুরানো হতে হতে আপনাআপনিই ভেঙে পড়েছে। সিঁড়ির অবস্থা খুব খারাপ।'

আরেক দিক দিয়ে ঘুরে এসে ওদের পাশে দাঁড়াল মুসা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মহা ধড়িবাজ ছিল কারমলটা। ক্রিক থেকে হাজার চেষ্টা করেও দেখা যাবে না। আমি পলকের জন্যে দেখেছি রাস্তার ওপর থেকে।'

'আশা করি,' হেসে বলল কিশোর, 'তোমার মত ঈগল চোখ নেই শুঁটকির। এস।'

পুরানো নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে পর্বতের ওপরের একটা খোলা চত্বরে উঠে এল ছেলেরা। বড় বড় ঘাস জন্মে রয়েছে, তৃণভূমিই বলা চলে জায়গাটাকে। অনেক দূর দিয়ে ওটার পাশ কাটিয়েছে পার্কের মেইন রোড। পঞ্চাশ গজমত দূরে একটা বাস স্টপেজ। চত্বরের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রোঞ্জের একটা ছোট মূর্তি।

'কিশোর!' রবিন বলল, 'মূর্তিটা!'

কাউবয়ের মূর্তি, দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানাইটের বেদির ওপর। গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গিতে পিস্তল তুলে রেখেছে কাউবয়।

'পিসটল,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'দ্য লেডি ফ্রম ব্রিস্টল, অ্যাণ্ড অল আলোন, অর্থাৎ একা!'

'পিস্তলটা কোনদিক নির্দেশ করছে?' নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন কিশোর।

বেদিতে চড়ে কাউবয়ের হাতে গাল লাগিয়ে পিস্তল কোনদিকে নিশানা করছে

দেখল মুসা। তারপর চোখ মিটমিট করতে করতে মাথা নাড়ল। 'না, তেমন কিছুই তো দেখলাম না।'

রবিনও উঠে দেখল। বলল, 'শুধু গাছপালা।'

বেদির দিকে তাকাল কিশোর। একবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। মাথা দোলাল, 'হুঁম্‌ম্‌।' ঘোরানো যায় মূর্তিটা। ভূমিকম্প হলে ঝাঁকুনি লেগে ঘুরে যায়।'

'মানে?' ভ্রূকুটি করল মুসা। 'ইদানীং তো ভূমিকম্প হয়নি।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, ভূমিকম্পে নয়। পায়ের গোড়ায় তাজা চিহ্ন, পাথরের গুঁড়োও পড়ে আছে। ঘোরানো হয়েছে।'

'শুঁটকি!' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'তাছাড়া আর কে?' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'এটাকে ঘুরিয়ে রেখে গেছে, যাতে আমরা বুঝতে না পারি কোনদিক নির্দেশ করছে।'

'তাহলে পরের ধাঁধার সমাধান কি করে করব?' রবিন বলল।

'শুঁটকির ঘাড় চেপে ধরে।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরল ওরা। গাছের তলায় গোধূলির ছায়া। সেখান থেকে বেরিয়ে পার্কের রাস্তার দিকে ছুটে গেল একটা ছায়ামূর্তি।

'আমাদের ওপর চোখ রাখছিল!' রবিন বলল।

'ধর ব্যাটাকে,' বলেই দৌড় দিল কিশোর।

গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটল ওরা। সামনে রাস্তায় গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হল। ওরা রাস্তায় পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক দূরে চলে গেল গাড়িটা।

'গাড়িটা চিনেছ?' কিশোরের প্রশ্ন।

'না,' মুসা বলল, 'তবে শুঁটকির নয় এটা ঠিক।'

আবার তৃণভূমিতে ফিরে এল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে ঢালে নেমে এল ওয়াইনেজ ক্রিকের কাছে। ঘনায়মান সাঁঝের ম্লান আলোয় সাইকেল চালাতে চালাতে রবিন বলল, 'কিশোর, নিশ্চয় সেই দৈত্যটা।'

'কিন্তু ছায়ামূর্তিটা তো ছোট দেখলাম। না রবিন, অন্য কেউ।'

পথের পাশে গাছপালার আড়ালে ঘন ছায়া। সেদিকে তাকিয়ে অস্বস্তি লাগল মুসার। মনে পড়ল, টেলিফোনে হুঁশিয়ারির কথা।

'শুঁটকিকে কোথায় খুঁজব?' রবিন জানতে চাইল। 'আর ধরে জিজ্ঞেস করলেই কি বলবে নাকি আমাদেরকে?'

'না, বলবে না,' একমত হল কিশোর। 'তবে উল্টোপাল্টা কথা শুরু করবে। আর বেশি কথা বলতে গিয়েই কিছু ভুল করে ফেলবে, সব সময় যা করে। চলো আগে ওর বাড়িতে দেখি। দেরি এমনিতেই হয়ে গেছে আমাদের, আর কয়েক

মিনিটে কিছু হবে না।'

বাড়িতে নেই শুঁটকি। তার মা বললেন, বাবার সঙ্গে নাকি কোথায় বেরিয়েছে।

'এবার?' রবিন বলল।

'নজর রাখব ওর ওপর,' বলল কিশোর। 'আমার মনে হয় না আজ রাতে আর গুপ্তধন খুঁজতে বেরোবে ও। রাইমিং স্ল্যাঙের কথা বলতে শুনেছে আমাদেরকে। বলা যায় না, শুঁটকির পক্ষেও এখন ধাঁধার সমাধান করে ফেলা হয়ত সম্ভব।'

'কিশোর,' মুসা প্রশ্ন তুলল। 'শুঁটকিকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে পারব না আমরা। ওর গাড়ি আছে। আমাদের নেই।'

'দরকারও নেই। ভূত-থেকে-ভূতের সাহায্য নেব আমরা।'

আট

কয়েক ঘন্টা পর রিসিভার রেখে আপনমনেই বলল মুসা, 'যাক, ভূতকে টেলিফোন করা শেষ।' পেছনে যে বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়াল করেনি।

'কি বললে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান। 'ভূতকে ফোন করেছ? তোমার শরীর ভাল তো?'

'অ্যাঁ...না না, ভূত নয়, ভূত-থেকে-ভূতে। কিশোরের আবিষ্কার। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খবর পৌঁছে যাবে রকি বীচের সমস্ত ছেলেমেয়ের কাছে।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত ছেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমান। মাঝে মাঝেই দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলে তিন গোয়েন্দা, জানা আছে তাঁর। এ-নিয়ে আর চাপাচাপি করলেন না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কি জানি, হবে হয়ত।'

হাসল মুসা। শুঁটকির ব্যবস্থা করা গেছে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে লাগতে আসার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাবে এবার। শহরের কয়েকশো জোড়া চোখ এখন সর্বক্ষণ থাকবে তার ওপর। কোথায় যায়, কি করে, সব জেনে যাবে ওরা, ফোনে জানাবে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে।

পরদিন খুব ভোরে উঠল মুসা। কিশোরকে ফোন করল নাস্তার আগেই। 'ভূতের খবর আছে?'

'দুটো,' জবাব দিল কিশোর। 'একটা ভুল গাড়ির খবর দিয়েছে। আরেকটা ঠিকই দিয়েছে, বলেছে শুঁটকির লাল গাড়িটা ওদের বাড়ির ড্রাইভওয়েতেই রয়েছে।'

'তারমানে বাড়িতেই আছে। ঠিক আছে, নাস্তা সেরেই চলে আসছি।'

খুব তাড়াহুড়া, তাই বেশি খেতে পারল না মুসা, গোটা তিনেক ডিম আর ছ'টা মোটা মোটা পাঁউরুটির টুকরো দিয়ে শেষ করতে হল। ইতিমধ্যে টেবিলে হাজির হয়ে গেল দুধ, ঢক ঢক করে গিলে নিল বড় এক গেলাস।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকে মুসা দেখল, কিশোর একা বসে আছে।

'রবিন আটকে গেছে, মায়ের কিছু কাজ করে দিতে হবে,' কিশোর জানাল। 'ধাঁধাগুলো নিয়ে আরও মাথা ঘামিয়েছি। কারমলের শব্দ ব্যবহার অবাক করেছে আমাকে। কখনও কখনও বেশ অদ্ভুত। এই যেমন বলছে, দ্য লেডি ফ্রম ব্রিস্টল রাইডস ফ্রম আ ফ্রেণ্ড।'

'তাতে কি?'

'বন্ধুর কাছ থেকে এসেছে বলাটা কেমন যেন অদ্ভুত। কারণ পিস্তল নির্দেশ করেছে কোন কিছু, তারমানে পিস্তলের তরফ থেকে কিংবা দিক থেকে হচ্ছে বলা যায়। তাহলে তো বলার কথা রাইডস টু আ ফ্রেণ্ড।'

'কি জানি,' মাথা চুলকাল মুসা।

'আরপরে, তিন নাম্বার ধাঁধায় বুড়ো লিখেছে আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ, চার নাম্বারে ফলো দ্য নোজ, আর পাঁচ নাম্বারে বাই আ ওয়াইফ।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ, বলা উচিত ছিল ফলো ইওর নোজ, সি মাই মাগ কিংবা দ্য মাগ? এবং হু বাইজ আ ওয়াইফ?'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছ। ওরকম করেই কি বলা উচিত ছিল না? ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলে আরও জটিল করে দিয়েছে ধাঁধাগুলো।'

'জটিল করার জন্যেই তো করেছে কুটিল বুড়োটা,' মুখ বাঁকাল মুসা।

উজ্জ্বল হল কিশোরের চোখ। 'তারমানে গুপ্তধন সত্যি সত্যি আছে। সে-কারণেই জটিল করেছে, যাতে সহজে পাওয়া না যায়।'

'এবং সে সফল,' মুসা বলল। 'আমাদের এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুঁটকিকে খুঁজে বের করতে হবে...'

'কিশোর! মুসা! মৃদু ডাক শোনা গেল।'

'রবিন মনে হচ্ছে?'

সর্ব-দর্শনে গিয়ে চোখ রাখল কিশোর। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেরিস্কোপের চোখে রবিনকে দেখতে পেল। 'ওয়ার্কশপের দিকেই আসছে। সঙ্গে আরেকজন। বাইরে চলো। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোনো ঠিক হবে না। চার নাম্বার দিয়ে যাব।'

চার নাম্বার দরজাটা ট্রেলারের পেছনে। একটা স্লাইডিং ডোর। খুললেই চোখে পড়বে জঞ্জালের গাদা, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু করিডর। সেটা দিয়ে বাইরে

বেরোল দু'জনে, ঘুরে চলে এল ওয়ার্কশপে। রবিনের সঙ্গে রয়েছে জেনি এজটার।

'কি ব্যাপার···?' বলতে গিয়ে বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা।

'যাক,' বলে উঠল একটা কণ্ঠ, কথায় কড়া ব্রিটিশ টান, 'সবাই আমরা এখানে।'

পাঁই করে ঘুরল কিশোর আর মুসা। ওয়ার্কশপের দরজায় দেখা দিল মাইক এজটার। বুড়ো কারমলের হোঁৎকা ভাগ্নের হাতে একটা কালো ওয়াকিং স্টিক।

'এখানে কি আপনার?' গরম হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হিইছিছিছি,' লাল হয়ে গেল মাইকের গোল আলুর মত মুখ। 'আমেরিকান ছেলেগুলো একেবারেই বেয়াদপ, আদব কায়দা কিচ্ছু শেখে না। কথা বলতে এসেছি, বুঝেছ? আর কিছু না। তাই না, জেনি?'

'আপাতত,' মুখ গোমড়া করে বলল রোগাটে মহিলা।

'কিভাবে কথা বলছ?' বোনকে তিরস্কার করল মাইক। 'হুঁশিয়ার হয়ে যাবে তো ওরা। ভদ্রভাবে ওদেরকে বোঝানো দরকার···'

'হুঁশিয়ার আমরা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছি,' কিশোর বলল, 'কাল থেকেই। ফোনে হুঁশিয়ার করার পর থেকে।'

'ফোনে হুঁশিয়ার!' ভুরু কোঁচকাল জেনি। 'কি বলছ? শাসিয়েছে নাকি কেউ? বুঝেছি। উকিল ব্যাটাকে গিয়ে ধমক লাগাও।'

'আমরা আপনাদেরও বন্ধু নই,' বলেই ফেলল মুসা।

'নও,' জেনি বলল। 'কিন্তু হতে অসুবিধে কি? আমাদের ওপর ভুল ধারণা হয়েছে তোমাদের। এর জন্যে দায়ী এলসা আর উড।'

'আমাদের মা, মানে বুড়ো কারমলের বোন অনেকদিন শেয়ারে ব্যবসা করেছে,' মাইক বলল। রাগ ফুটল চেহারায়। 'কিন্তু বুড়ো তাকে ঠকিয়েছে। আমাদের ভাগ এখন আমরা ফেরত চাই।'

'ভুল লোকের সঙ্গে কাজ করছ তোমরা,' ভাইয়ের কথার পিঠে বলল জেনি। 'আমাদের সঙ্গে চলে এস। ভাল টাকা দেব।'

'দেখুন,' রেগে গিয়ে কিছু বলতে চাইল রবিন। বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল কিশোর, 'কত ভাল দেবেন?'

'অনেক,' তাড়াতাড়ি বলল জেনি। 'যা পাওয়া যাবে তার দশ পার্সেন্ট। অনেক, অনেক টাকা হবে তাতে, বুঝেছ।'

'হুম্‌ম্‌।' বিড়বিড় করল কিশোর, 'সত্যিই অনেক।'

অবাক হয়ে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকিয়ে আছে দুই সহকারী।

'কাউকে বলবে না। খুঁজে পেলে আমাদেরকে দিয়ে দেবে,' জেনি বলল, ধরেই

নিয়েছে ছেলেরা রাজি।

'কাউকে বলব না মানে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল হঠাৎ কিশোরের কণ্ঠ। 'চুরি করবেন নাকি?'

'না না, ইয়ে মানে…'

'আর মানে মানে করতে হবে না। কোর্টে গিয়ে তো আদায় করতে পারবেন না, চুরি করতে চান।'

কালো হয়ে গেল মাইকের মুখ। বিড়বিড় করে কি বলল জেনি, বোঝা গেল না। শাসানির ভঙ্গিতে হাতের লাঠিটা নাড়ল তার ভাই।

'বেশ, তাহলে যা যা জেনেছ, শুধু তাই বল,' জেনি বলল। 'আমরা বুঝতে পারছি, সঠিক পথে এগোচ্ছ তোমরা। রাইমিং স্ল্যাঙের ব্যাপারে জানি। ক্রিকে গিয়েছিলে কাল, জানি। রোগাটে ঢেঙ্গা ছেলেটাকেও কাল দেখেছি ওখানে। যা যা জানো বলে ফেল।'

'অ, আপনিই তাহলে কাল গুপ্তচরগিরি করছিলেন আমাদের ওপর,' রবিন ধরল। 'মূর্তিটার কাছে।'

'মূর্তি?' মাইক জিজ্ঞেস করল, 'কিসের মূর্তি?'

কিশোর বলল, 'বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটা মূর্তির কাছে ঢেঙ্গা ছেলেটাকে দেখেছিলেন তো? কি করেছে দেখেননি?'

'মূর্তি-টুর্তি দেখিনি আমরা,' জেনি বলল। 'তবে তোমাদেরকে ক্রিকের কাছে দেখেছি। রোগাটে ছেলেটার পিছু নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে উধাও হয়ে গেল। তোমরা…'

'রাইমিং স্ল্যাঙের কথা কি করে জানলেন? আর কিভাবেই বা জানলেন আমরা মিসেস কারমলের হয়ে কাজ করছি?'

হেসে উঠল মাইক। 'নরি ছেলেটা আস্ত বোকা। আমাদের ওপর এত রেগে গিয়েছিল, আমরা যে ভুল করছি প্রমাণ করতে গিয়ে ফাঁস করে দিয়েছে সব।'

'বুড়োটা যে মহা শয়তান ছিল, এই স্ল্যাংই তার প্রমাণ,' জেনি বলল। 'আমরা…'

'এই জেনি, চুপ কর,' হঠাৎ গর্জে উঠল মাইক। 'অনেক হয়েছে। আমি প্রশ্ন করছি। এই ছেলেরা, যা যা জানো ঝটপট বলে ফেল।'

'না, মিস্টার,' কিশোর মাথা নাড়ল, 'কিছুই বলছি না আমরা আপনাদের।'

'তাহলে যাতে আর কাউকেই না বলতে পার সেই ব্যবস্থা করছি,' হাতের লাঠিটা তুলে এগিয়ে এল মাইক। তার কুতকুতে চোখের তারা জ্বলছে। 'কিছু সময়ের জন্যে আটকে রাখব তোমাদেরকে। আমরা মাল নিয়ে চলে যাওয়ার আগে

ছুটতে পারবে না।'

মাইক আর জেনি আরেক কদম এগোল। পিছিয়ে গেল ছেলেরা।

'এই, কি হচ্ছে কি এখানে?' পেছনে ধমক শোনা গেল।

ঘুরে তাকাল মাইক, হাতের লাঠি নেড়ে বলল, 'সরুন, সরে যান বলছি!'

টকটকে লাল হয়ে গেল মেরিচাচীর মুখ। একটানে মাইকের লাঠি কেড়ে নিয়ে ধাঁ করে বসিয়ে দিলেন তার মাথায়। 'গেছিরে!' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে গেল মাইক। লাফ দিয়ে এসে ভাইয়ের জায়গা দখল করল জেনি। লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেরিচাচী। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। 'মারবে নাকি? এস দেখি কে কাকে মারে!' মেরিচাচীর উগ্রমূর্তি দেখে আর এগোতে সাহস করল না জেনি। 'যাও, বেরোও! ভাল চাও তো এক্ষুনি বেরোও!'

হৈ-চৈ শুনে সেখানে এসে দাঁড়ালেন রাশেদ পাশা। তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল বোরিসের কৌতূহলী মুখ।

'আর কক্ষনও যেন এখানে না দেখি!' আবার ধমক লাগালেন মেরিচাচী।

বিশালদেহী বোরিসের দিকে তাকিয়ে চুপসে গেছে মাইক। বোনের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল। মার খাওয়া কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে যেন মেরিচাচীর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ছেলেদের হো হো হাসি পিত্তি জ্বালিয়ে দিল তাদের। কিন্তু সাহস করে আর কিছু বলতেও পারল না।

কড়া চোখে ছেলেদের দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে? বেতমিজগুলো এরকম ব্যবহার করল কেন?'

খুলে বলল সব কিশোর। এজটাররা কে, তা-ও জানাল।

নাক সিঁটকালেন মেরিচাচী। 'সব পাগল! বদ্ধ উন্মাদ একেকটা! কে কবে শুনেছে এমন পাগলামির কথা? মরার আগে গুপ্তধন লুকিয়ে উইল করা…ওই ধাড়ি শকুনটা ছিল আরেক পাগল। যাকগে, তোদের ভয় পাবার আর কিছু নেই। জেনি আর মাইক তোদেরকে আর বিরক্ত করতে সাহস করবে না।'

মুচকি হেসে, বোরিসকে নিয়ে চলে গেলেন রাশেদ পাশা। মেরিচাচীও চলে গেলেন অফিসের দিকে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ল ছেলেরা।

আচমকা জ্বলতে নিভতে শুরু করল ওয়ার্কশপের দেয়ালে লাগানো লাল আলো। সঙ্কেত। তারমানে হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন বাজছে। হুড়াহুড়ি করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল ওরা। ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। চুপচাপ ওপাশের কথা শুনে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।' কেটে দিল লাইন। বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'শুঁটকিকে দেখা গেছে, বাস ডিপোর কাছে।'

আবার হুড়াহুড়ি করে বেরোনোর পালা। সাইকেল নিয়ে ছুটতে হবে ডিপোতে।

নয়

কিশোর বলল, 'আমাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে।'

বাস ডিপো থেকে ব্লকখানেক দূরে রয়েছে ওরা। ট্রাফিক লাইটের কারণে বাধ্য না হলে থামত না, পেছনেও তাকাত না কিশোর, দেখতও না।'

'কই?' রবিন বলল। 'আমি তো কিছু দেখছি না।'

'একটা গাড়ির পেছনে বসে পড়েছে। সাইকেল নিয়ে আসছিল। অদ্ভুত পোশাক আর হ্যাট পরেছে। পাশের গলিতে ঢুকে পড়বে।'

আলো জ্বলতেই আবার সাইকেল চালাল ওরা। ডানে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। বড় বড় কয়েকটা ডাস্টবিন দেখে তার আড়ালে লুকিয়ে পড়তে ইশারা করল কিশোর।

সাইকেল চালিয়ে আসছে অদ্ভুত পোশাক পরা লোকটা। মুখ দেখা যাচ্ছে না। খাট শরীর, ঝুঁকে রয়েছে হ্যাণ্ডেলের ওপর, কুঁজো মানুষের মত ঠেলে বেরিয়ে আছে পিঠ। ঢোলা, কালো কোট গায়ে, মাথায় বিচিত্র কানাওয়ালা হ্যাট।

ফিসফিসিয়ে মুসা বলল, 'একেবারে দেখি শার্লক হোমস সেজেছে।'

'ভাঁড়!' বলল রবিন।

'আরি!' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'নরি কারমল। তুমি এখানে কি করছ?'

এতই চমকে গেল নরি, হাত কেঁপে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঘুরে গিয়ে লাগল দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির ওপর, কোটের সঙ্গে সাইকেল জট পাকিয়ে হুড়ুম করে পড়ল মাটিতে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল আবার, লাথি দিয়ে ঠিক করল কোটের ঝুল। বলল, 'আমি তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। যা খুশি বল, কিচ্ছু মনে করব না।'

হেসে ফেলল মুসা। 'এই পোশাক পরে?'

'গোয়েন্দারা তো এরকমই পরে!' চেঁচিয়ে উঠল নরি।

'আমাদের খুঁজে পেলে কি করে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'পিছু নিয়েছিলাম,' গর্বের হাসি ফুটল নরির মুখে। 'খুব সকালে উঠে গিয়ে বসে ছিলাম স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাছে। ইহ্, এজটারদের যা খেপতে দেখলাম না। তোমরা এখানে কেন? সূত্রও পেয়েছ?'

'সে দেখতেই পাবে,' কিশোর বলল। 'এই,' রবিন আর মুসাকে বলল, 'চলো,

যাই।' সাইকেলে চেপে আবার গলির মুখের দিকে রওনা হল সে।

'এই, যাচ্ছি কোথায়?' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল নরি। জোরে জোরে পেডাল ঘুরিয়ে কিশোরের পাশে চলে এল।

'তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

'না না, আমি যেতে চাই না…'

ঘ্যাঁচ করে একটা গাড়ি এসে থামল পথের পাশে। দরজা খুলে প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এল রস উড। 'এই যে, পাওয়া গেছে, এখানে। তোমার মা খুব রাগ করেছে।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'না পেয়ে এলসা ঠিকই আন্দাজ করে ফেলেছে, কোথায় গেছে। কিশোর, তোমার চাচীকে কোথায় যাচ্ছ বলে এসে ভাল করেছ। নইলে খুঁজে পেতাম না।'

'আমি বাড়ি যাব না!' চিৎকার করে বলল নরি। 'আমি থাকব! কাজ করব ওদের সঙ্গে!'

'নরি,' বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'এজটাররা জেনে গেছে আমরা তোমাদের কাজ করছি। রাইমিং স্ল্যাঙের কথাও জেনেছে। কি করে জানল? তুমি বলেছ। গোয়েন্দাদের পয়লা পাঠ, কক্ষনও অযথা কথা বলা উচিত নয়। মস্ত ভুল করেছ তুমি।'

'মাপ চাই, কিশোর, সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। আমার মায়ের নামে খারাপ কথা বলছিল, তাই খুব রেগে গিয়েছিলাম। আর ভুল করব না। কসম!'

'সরি, নরি,' কিশোর বলল। 'তুমি থেকে কোন উপকার করতে পারবে না, অসুবিধেই করবে। মিস্টার উডের সঙ্গে চলে যাও।'

কালো মেঘ জমল নরির মুখে, দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে বর্ষণ শুরু হতে পারে। সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে গেল গাড়ির কাছে। ওটা তুলতে তুলতে উকিল জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কিছু অগ্রগতি হয়েছে?'

'নিশ্চয় হয়েছে,' মুসা জবাব দিল। 'দ্বিতীয় ধাঁধাটার সমাধানও খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলব।'

'গুড। কোর্টে উইলটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি আমি। এখন যত তাড়াতাড়ি পাথরগুলো বের করতে পার, ভাল। তোমাদের কপাল ভাল, বেশির ভাগ লোকই গুপ্তধন খোঁজা বাদ দিয়েছে। যোগাযোগ রাখবে।'

'রাখব,' রবিন বলল।

গাড়ি নিয়ে চলে গেল উকিল। যতক্ষণ তিন গোয়েন্দাকে দেখা গেল, পেছনে ফিরে ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল নরি।

বাস ডিপোতে পৌঁছে ছেলেটার দেখা পেল ওরা, যে শুঁটকির খবর দিয়েছিল।

ওর নাম ডিক ব্রাউন। ডিপোর পাশের একটা বাড়ির দরজায় তিন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা করল সে, যাতে শুঁটকি ওদের দেখে না ফেলে।

ডিক বলল, 'সারা সকাল বাসে করে ঘুরেছে টেরি, ডিপো ম্যানেজার বলেছে আমাকে। দুটো রুট ঘুরে এসেছে ইতিমধ্যেই, তৃতীয় আরেকটায় যাবার জন্যে বাসে চড়েছে।'

যেন তার কথার প্রমাণ দিতেই ডিপো থেকে বেরিয়ে এল একটা বাস, ছেলেদের সামনে দিয়ে চলে গেল। দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে গেল ওরা। সামনের একটা সিটে বসেছে টেরি, চেহারা থমথমে।

'খুব চিন্তিত মনে হল,' মুসা বলল।

'যা খুঁজছে পাচ্ছে না বোধহয়,' বলল ডিক। 'যে দুটো বাসে করে ঘুরে এসেছে, দুটোরই ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। দু'জনকেই নাকি জিজ্ঞেস করেছে সে, ফ্রেণ্ড-এর সঙ্গে ছন্দের মিল আছে, এরকম কিছু আছে কিনা পথে। ড্রাইভাররা কিছু বলতে পারেনি।' হাসল ছেলেটা। 'যাওয়ার মময় হল আমার। তোমাদের দৌলতে অনেক মজা পেলাম। ধন্যবাদ।'

'তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ, ডিক,' কিশোর বলল। 'যদি পুরস্কার পাই, তোমাকেও ভাগ দেব।'

ডিক চলে গেছে। উজ্জ্বল রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছে মুসা, কিসের সঙ্গে ছন্দ মেলে ফ্রেণ্ড-এর?

'কিশোর,' রবিন বলল, 'পিস্তল এমন কি নির্দেশ করেছে, যে-জন্যে বাস ডিপোতে আসতে হয়েছে শুঁটকিকে?'

'হতে পারে কাউন্টি পার্ক বাস স্টপেজের দিকে নির্দেশ করেছিল পিস্তল,' কিশোর বলল। 'মূর্তির কাছেই ওটা। ধাঁধায় "রাইড" শব্দটাও রয়েছে। শুঁটকি হয়ত মনে করেছে বাসে "চড়তে" বলা হয়েছে।'

'কিন্তু তাহলে এখানে কেন এল? পার্কের স্টপেজ থেকে কেন চড়ল না?'

'আর এত ঘোরাঘুরি করছে কেন?' ওদের আলোচনায় যোগ দিল মুসা।

'হুঁম্‌ম্‌, ঠিকই বলেছ,' কিশোর বলল। 'চলো তো, রুটের নকশাগুলো দেখি। প্রশ্নের জবাব মিলতেও পারে।'

ডিপোর ভেতরে ঢুকে, নকশা দেখায় মন দিল ওরা।

'এই দেখ,' বলল কিশোর। 'তিনটে রুট দিয়ে বাস যায় পার্কের মেইন স্টপেজে।'

'তারমানে কোন রুটের কথা বলেছে কারমল,' রবিন বলল, 'শুঁটকি জানে না।'

'আমরাও জানি না,' নিরাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা।

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'বিশেষ কোন রুটের কথা বলেছে, যেটা ধাঁধা সমাধানে সাহায্য করবে। দেখি তো আরেকবার ধাঁধাগুলো,' পকেট থেকে নকলটা বের করল সে। পড়ল, 'অ্যাবাভ দ্য অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস অল অ্যালোন; দ্য লেডি ফ্রম আ ব্রিস্টল রাইডস ফ্রম ফ্রেণ্ড।'

'কোন রুটের নাম্বার ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ছন্দ মেলায় না তো?' মুসা বলল।

'শব্দটার উচ্চারণ ফ্রেন হলে টেন-এর সঙ্গে মিলত। কিন্তু ডি-টা বাদ দিই কি করে? কিশোর, বইতে কি রাইড ফ্রম আ ফ্রেণ্ড-এর কোন মানেই লেখা নেই?'

'না, আমি অন্তত পাইনি। যতদূর মনে হচ্ছে বাসের কথাই বলেছে কারমল। সেই বাসে চড়ে হয়ত কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যেত। হয়ত এটা স্ল্যাং নয়, যা বলেছে তা-ই বুঝিয়েছে। কার সঙ্গে দেখা করতে যেত, সেটা জানতে পারলে...'

থেমে গেল কিশোর। চোখ মিটমিট করল কয়েকবার। জেনি এজটার এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। চোখের তারায় ভয় ফুটেছে। 'ঠিকই বলেছ তুমি, ইয়াং ম্যান। মনে হয় বুঝতে পারছি কোন বন্ধুর কথা বলেছে।'

মুসা বলল, 'কিশোর, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না। ভাঁওতা দিয়ে...'

'না না, ভাঁওতা দিচ্ছি না,' তাড়াতাড়ি বলল জেনি। 'তোমাদেরও দোষ নেই। সন্দেহ করার মত কাজই করেছি আমরা। আমাকে বাধ্য করেছিল মাইক। ভয়ানক লোক। সাঙঘাতিক ভয় করি ওকে। তবে এবার ওকে থামানোর সময় হয়েছে,ওর ভালর জন্যেই।'

'থামাবেন?' কিশোর বলল।

'কাউকে দিয়ে ধাঁধার সমাধান করিয়ে, যাতে সত্যিকারের স্বত্বাধিকারীরা রত্নগুলো পায়। জানো, স্যালভিজ ইয়ার্ডে আবার গিয়েছিলাম আমি, তোমাদের কাছে, তোমার চাচীর কাছে মাপ চাইতে। আর আমি সাহায্য করছি না মাইককে, যতই ভয় দেখাক।'

'খাইছে,' মুসা বলল, 'আপনাকে মারধোর করেছে নাকি?'

'ওর পক্ষে সব সম্ভব,' কেঁপে উঠল জেনি। 'সে-জন্যেই তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি, ওকে ঠেকানোর জন্যে। আমাকে সাহায্য করবে? কারমলের বন্ধুর আসল ঠিকানা আমি জানি না, তবে তোমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে পারব।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'লোকটি কে, মিস এজটার?'

'বলছি...তুমি কিশোর, তাই না? আর তুমি রবিন, তুমি মুসা।'

মাথা ঝাঁকাল তিনজনেই। সন্দেহ যাচ্ছে না।

হাসল জেনি। 'গুড। আমার মামা প্রায়ই গিয়ে দাবা খেলত মিস্টার মারফি নামে একটা লোকের সঙ্গে।'

'তার কাছে বাসে করে যেতেন কারমল?' মুসা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। তবে বলতে পারব না কোন রুটের কোন বাসে করে যেত।'

'থাকে কোথায়?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'বললাম না, ঠিকানা জানি না। তবে মামার বাড়ির পাশে পার্কের ধারে একটা বাড়ি আছে মারফির।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তিনটে বাস রুটই গেছে ওই এলাকার ভেতর দিয়ে। বলল, 'মিস্টার মারফির কথাই হয়ত বলেছেন কারমল। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। তা যাব কিভাবে?'

জেনি বলল, 'অনেক দূর, সাইকেলে করে যেতে অসুবিধে হবে। আমাকে যদি বিশ্বাস কর, আমার গাড়িতে করে নিয়ে যেতে পারি।'

'বেশ...' দ্বিধা যাচ্ছে না কিশোরের।

'বাড়িটা কোথায় বলে দিতে পারি তোমাদের,' দ্বিধা দেখে বলল জেনি। 'তোমাদের সঙ্গে বাসে যেতেও আমার আপত্তি নেই।' হাসল সে।

পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা।

'গাড়িতে গেলে অবশ্যই সময় বাঁচবে,' মুসা বলল।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। 'সময়ের দাম আছে। ঠিক আছে, মিস এজটার, গাড়িতেই যাব।'

'গুড,' জেনি বলল, 'ডিপোর পার্কিং লটে গাড়ি রেখেছি। তোমাদের সাইকেল ওখানেই রেখে নাও।'

গাড়িতে আর কেউ নেই, ওঠার আগে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল ছেলেরা। সতর্ক থাকল। বোটানিক্যাল গার্ডেন ছাড়িয়ে এল গাড়ি, পাহাড়ের ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কতগুলো ছোট ছোট কটেজের দিকে এগোল। কিছুক্ষণ পর সরু একটা রাস্তা দেখিয়ে জেনি বলল, 'ওপথেই যেতে হবে।'

বসন্তের চমৎকার রোদ। পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে পড়ল কিশোর আর মুসা, সতর্কতা চলে গেল। আরাম করে হেলান দিয়ে বসল ওরা।

পুরানো একটা কটেজের সামনে গাড়ি থামাল জেনি। বলল, 'এটাই।'

বেরিয়ে এল ছেলেরা। মুগ্ধ হয়ে দেখছে। সুন্দর জায়গা। পাখির গানে মুখরিত।

সন্দেহ কিছুটা থেকেই গেল রবিনের, সাবধানে ডাকল, 'মিস্টার মারফি? মিস্টার মারফি আছেন? মিস্টার কারমলের কথা আলোচনা করতে এসেছিলাম, যদি...'

কাঁপা কাঁপা বৃদ্ধ-কণ্ঠ ভেসে এল কটেজের ভেতর থেকে, 'কে? কারমলের কথা বলছ? দাবা খেলতে আসত, কক্ষনও পারত না আমার সঙ্গে। সব সময়

হারত। এস, ভেতরে এস।'

আর দ্বিধা রইল না। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে কিশোর বলল, 'স্যার, কারমল এখানে বাসে করে আসতেন, তাই না? কখনও কি বাস আর আ বল অভ টোয়াইন সম্পর্কে কিছু বলেছেন?'

ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে বুককেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ, ছেলেদের দিকে পেছন করে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'হাল্লো, গর্দভের দল!'

এ-কি! কোথায় বৃদ্ধ মিস্টার মারফি! বুড়োর ছদ্মবেশ পরে রয়েছে মাইক এজটার, হাতে সেই ওয়াকিং স্টিক, মুখে কুৎসিত হাসি। ওদের পেছনে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল জেনি এজটার।

দশ

খেঁকিয়ে উঠল জেনি, 'মনে করেছ এত সহজে হাল ছেড়ে দেব?'

এতই চমকে গেছে, কথা হারিয়ে ফেলেছে রবিন আর মুসা। রাগে কাঁপছে কিশোর। তবে জিভ সংযত রাখল। দেখতে চাইছে, কি ঘটে।

'ভালই অভিনয় করেছ, জেনি, বোঝা যাচ্ছে,' বোনকে বলে, ছেলেদের দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচাল মাইক।

'তুমিও কম করনি,' হেসে উঠল জেনি। 'তবে ছেলেগুলো বেশি সৎ, আর আগ্রহী। যে কেউ ঠকাতে পারবে এখন ওদের।'

'মিস্টার মারফির বুদ্ধিটা ভালই হয়েছে, কি বল? হাহ্ হাহ্,' নিজের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে হাত কচলাল মাইক।

'তুমি, তুমি…!' রাগে কথা আটকে গেল মুসার মুখে।

'থাম, থাম, মেজাজ ঠাণ্ডা কর,' হাত তুলল মাইক। 'ভাল একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, পাত্তা দাওনি। এখন আর তোমাদেরকে দরকার নেই আমাদের, অন্য লোক পেয়েছি। বল অভ টোয়াইন বলতে কি বুঝিয়েছে, তা-ও জানি। আমরা কাজ করি গিয়ে, এই ঘরে তোমরা বিশ্রাম নাও। তবে অবশ্যই দরজায় তালা লাগানো থাকবে।' মেয়েমানুষের মত হি-হি করে হাসল সে। 'নিরাপদেই থাকবে। কাছাকাছি আর কোন কটেজ নেই, চেঁচিয়ে সুবিধে করতে পারবে না, কারও কানে যাবে না চিৎকার। এক মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছি এটা, কাজেই ততদিন বাড়িওয়ালাও আসবে না। একমাস অবশ্য থাকছি না আমরা এখানে…'

'ব্যস ব্যস, আর বলার দরকার নেই,' বাধা দিল জেনি। 'ওদের ঘরে নিয়ে

যাই।'

লাঠি তুলে ইশারা করল মাইক, ভেড়ার পালকে যেমন চলার নির্দেশ দেয় রাখাল।

'যার যেদিকে খুশি,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে, চোখের পলকে ঘুরে, দু'দিকে দৌড় দিল রবিন আর মুসা। কিশোর ঘুরল আরেক দিকে। ছোটাছুটি শুরু করল। ধরার জন্যে হাত বাড়াল ভাইবোন। কিন্তু ছুঁতেও পারল না। ওদেরকে হতবাক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তিন কিশোর, একজন সামনের দরজা খুলে, একজন পেছনের দরজা, আর আরেকজন জানালা দিয়ে।

সরু পথ ধরে আগে আগে ছুটল মুসা। ছুটতে ছুটতে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, লুকানোর মত জায়গা খুঁজছে, অন্তত একটা ঘন ঝোপ পেলেও হয়। কিন্তু পথের দু'পাশে এখানে খোলা অঞ্চল।

পেছনে টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। পেছনে তাকিয়ে ঢোক গিলল রবিন। বলল, 'ব্যাটারা আসছে আমাদের ধরতে!'

'নেমে পড়ো রাস্তা থেকে,' নির্দেশ দিল মুসা।

লাফিয়ে পথের পাশের খাদে পড়ল তিনজনে। সেখান থেকে উঠে দৌড় দিল মাঠের ওপর দিয়ে। পেছনে আবার টায়ারের আর্তনাদ, ধাতব বস্তু আছড়ে পড়ার শব্দ। ছেলেরা ভাবল, খাদ পেরিয়ে মাঠের ওপর দিয়েই ওদের তাড়া করতে আসছে গাড়ি। কিন্তু ফিরে তাকিয়ে দেখল সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য।

খাদে কাত হয়ে পড়ে আছে গাড়িটা। জানালার কাঁচ চুরচুর। একটা চাকা ফেটে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে কোনমতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ছুটন্ত আরেকটা নীল গাড়ির দিকে তুলে লাঠি নাচাচ্ছে মাইক।

'খাইছে! হল কি?' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার গাড়ির কাছে গিয়ে বোনকে বের করার চেষ্টা চালাল মাইক।

দ্রুত মোড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল নীল গাড়িটা। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিশোর বলল, 'ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। গাড়িটা চেনা চেনা লাগল। ভেতরে কে ছিল দেখেছ?'

'দু'জন মনে হল,' বলল রবিন। 'ড্রাইভার বেশ বড়সড় মানুষ···বিশালদেহী।'

'আবার সেই দৈত্য!' মুসা বলল।

'হয়ত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'কিংবা বেপরোয়া কোন ড্রাইভার।'

'যে-ই হোক, আমাদের বড্ড উপকার করেছে।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল রবিন। 'যাকে চিনিই না, কেন যেচে পড়ে উপকার করতে এল আমাদের, যদি বেপরোয়া ড্রাইভার না হয়ে থাকে?'

'এ, দেখ,' হেসে উঠল মুসা।

খোঁড়াচ্ছে ভাইবোন দু'জনেই, রওনা দিয়েছে কটেজের দিকে। এদিকেই তাকিয়ে আছে মাইক, হাতের লাঠি নাচাচ্ছে ছেলেদের দিকে।

রবিন আর কিশোরও হাসল। তারপর শহরে রওনা হল ওরা। মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে দেখে নেয়, এজটাররা পিছু নিল কিনা। কিন্তু মোটা মাইক আর তার রোগাটে বোনের ছায়াও দেখা গেল না আর।

লাথি মেরে রাস্তার একটা পাথর সরাল কিশোর। 'আমি একটা আস্ত গর্দভ! নইলে জেনির মত একটা মেয়েমানুষ এভাবে বোকা বানায়। দশ বছর ধরে এখানে আসে না ওরা, একথাটা মনেও হল না একবার। শেষ জীবনে কারমল কি করেছে না করেছে জানার কথা নয় জেনি আর মাইকের। ভুল করা একদম সহ্য করতে পারে না সে। অথচ এই কেসটায় একের পর এক ভুল করে চলেছে। মনে মনে কষে কয়েক ডজন লাথি মারল নিজেকে।

'আস্ত শয়তান,' মুসা বলল। 'কি রকম বানিয়ে বানিয়ে বলল, বিশ্বাস না করে উপায় ছিল? কটেজটাও নিয়েছে কারমলের বাড়ির পাশে। ওদেরও কপাল ভাল বলতে হবে, একেবারে জায়গামত ভাড়া পেয়েছে।'

'তবে এবার খারাপ হতে শুরু করেছে,' হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। 'গাড়ি ভেঙেছে। কোম্পানি পুরো ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছাড়বে। দিতে না পারলে দেবে ওদের নামে কেস করে। কারমলের বন্ধুকে খুঁজে বের করাও ওদের কম্মো নয়।'

'কেন?'

'কারণ, কারমলের বন্ধুদের কথা জানার কথা শুধু এলসা আর উডের। ওরা কিছুতেই বলবে না ভাইবোনকে।'

'কিন্তু আমাদের বলবে!' বলে উঠল রবিন।

'ঠিক!' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'চলো, ওদের সঙ্গেই কথা বলি। বাস স্টপ খোঁজ।'

বেশিদূর আর এগোতে হল না, মেইন রোডে এসে উঠল ওরা। বাস কোথায় থামে দেখল। কিন্তু বাস আসার আগেই এল একটা গাড়ি, স্টেশন ওয়াগন, চালাচ্ছেন এক মহিলা, ওদেরই এক সহপাঠীর মা। ছেলেদেরকে বাস স্টপেজে দেখে থেমে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাবে।

লিফট পেয়ে গেল ওরা।

কারমলের বাড়িতে কটেজেই পাওয়া গেল এলসাকে। একা।

'নরি বোধহয় পেছনের বাগানে,' এলসা বলল। 'ওকে নামিয়ে দিয়ে উড গেছে লস অ্যাঞ্জেলেসে। আমি খেতে বসতে যাচ্ছিলাম। তোমরাও বসে যাও না? খেতে খেতে সব কথা বলবে আমাকে।'

স্যাণ্ডউইচ চিবুতে চিবুতে কি ঘটেছে বলল রবিন।

ভীষণ রেগে গেল এলসা। 'এমন শয়তান লোক জীবনে দেখিনি। বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে তোমাদের।'

'এই শেষ,' মুসা বলল, 'আর না।'

'আচ্ছা, এবার ধাঁধার কথা বলি,' কিশোর বলল। 'বাসে চড়ে বন্ধুর কাছে যাবার কথা বলেছেন কারমল। কার কথা বলেছেন, আন্দাজ করতে পারেন?'

ভেবে বলল এলসা, 'তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দু'জনই আছে। ড্যাম সান, আর ডোরা কেমপার। ডোরা কাছেই থাকে, হেঁটেই যাওয়া যায়। বাসে করে যেতে হলে সানের কথাই বলেছে। হপ্তায় দু'একবার যেত ওখানে। বাড়ির সামনে থেকেই বাস ধরত।'

'তাহলে তিনিই হবেন,' কিশোর বলল। 'উইলে সাক্ষীও তো হয়েছেন ড্যাম সান। ভুলে গিয়েছিলাম। কোথায় থাকেন তিনি?'

'কাউন্টি পার্কের মাইল দুয়েক দূরে। পথের পাশের একটা ছাউনিতে। মেইন রোড থেকে দেখা যায় না। তবে সাইনপোস্ট লাগানো রয়েছে পথের মোড়ে, বাস থেকেই দেখবে। আট নাম্বার বাস যায়।'

আর দেরি করল না ছেলেরা। খাওয়া শেষ। তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে রাস্তা পেরিয়েই থমকে দাঁড়াল কিশোর।

'কি হল?' রবিন বলল।

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখের তারা। 'বাসের সূত্রের মানে বুঝে গেছি! আর বাসে কি খুঁজতে হবে, তা-ও!'

এগারো

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কী, কিশোর?'

'শোন,' পকেট থেকে নকলটা বের করল কিশোর। 'তিন নাম্বার ধাঁধায় বলছেঃ অ্যাট দ্য টেনথ বল অভ টোয়াইন, ইউ অ্যাণ্ড মি; সী আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ অ্যাহেড।' হাসল সে। 'বাস থেকে অনেক কিছু দেখা যায়। তার মধ্যে একটার ছন্দ মিলে যায় বল অভ টোয়াইনের সঙ্গে। এবং সেটা বাস থেকেই দেখা

যাবে বলেছে কারমল।'

মাথা নাড়ল মুসা, 'সানের ছাউনি নয়। ওটা বাস থেকে দেখা যাবে না...'

'কিন্তু সাইনপোস্ট দেখা যাবে!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'টোয়াইনের সঙ্গে সাইনের ছন্দও মেলে।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'টেনথ বল অভ টোয়াইন মানে, দশ নাম্বার সাইন। প্রথম থেকে এক দুই করে গুনে যেতে হবে।'

বাস এল। উঠে বসল ছেলেরা। বোটানিক্যাল গার্ডেন আর শপিং সেন্টারের পাশ কাটিয়ে এল, এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে।

আট নাম্বার সাইনটা গোনার পর মাথা নাড়ল রবিন, 'কিশোর, কোথায় বুঝি একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে।'

আট নাম্বার সাইনটা সানের বাড়ির কাছে। বাস থামল ওখানে।

'হ্যাঁ,' কিশোরও রবিনের সঙ্গে একমত। গম্ভীর।

'ভুলটা কি?' মুসার প্রশ্ন। 'দশ নাম্বারে তো এখনও যাইইনি।'

'সেটাই ভুল। কারমল যেখানে নামত, সেটা ছাড়িয়ে যাবার কথা নিশ্চয় বলবে না,' জবাব দিল রবিন।

'ভাড়া?'

নিজেদের আলোচনায় এতই মগ্ন ছিল ছেলেরা, বাস ড্রাইভার এসে দাঁড়িয়েছে, বলতেই পারবে না।

'দিলাম তো একবার,' মুসা বলল।

'এখানে নামলে আর লাগবে না। কিন্তু সামনে গেলে আরও দশ সেন্ট করে দিতে হবে।'

'তাহলে নেমেই যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়াতে গেল মুসা।

'রাখ,' বাধা দিল কিশোর। 'দশ নাম্বার সাইনটা গিয়ে দেখেই আসি না। কারমলের কোন ব্যাপারেই শিওর হওয়া যাচ্ছে না, অসম্ভব চালাক।' পকেট থেকে পয়সা বের করে ড্রাইভারের হাতে ফেলল সে।

আবার চলল বাস। দেখা গেল দশ নাম্বার সাইন। ফ্রিওয়ে থেকে ঢোকার আরেকটা পথ, সাইনবোর্ডে লেখাঃ ডু নট এনটার। আনমনে মাথা নেড়ে বাস থামানোর শেকল ধরতে গেল কিশোর, থামানোর ইঙ্গিত দেবে, নেমে যাবে ওরা।

'কিশোর!' তার হাতে হাত রাখল মুসা, 'টেনো না!'

হাত তুলে দেখাল সে। ফ্রিওয়ের প্রবেশমুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে চকচকে একটা গাড়ি। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেনি আর মাইক। কোন ব্যাপারে ভীষণ তর্ক জুড়েছে। ওদের অলক্ষ্যে পেরিয়ে যাবার সময় ছেলেরা দেখল, জোরে

সাইনপোস্টে লাথি মেরে নিজের আঙুলেই ব্যথা পেয়ে সেটা চেপে ধরল মাইক।

'সর্বনাশ!' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'হাল ছাড়েনি ব্যাটারা!'

মুসা হাসল। 'কিন্তু আসল সাইনটাও পায়নি।'

'তবে বুঝে ফেলেছে,' কিশোর বলল, 'সাইনের কথাই বলেছে বুড়ো। পরের স্টপেজে নেমে যাব আমরা। এরপর জলদি কাজ সারতে হবে।'

বাস থামলে নেমে পড়ল ওরা। ওটা চলে যেতে দেখে অস্বস্তিতে কাঁধ ঝাঁকাল মুসা। 'এবার কি করব?'

'ভাবব,' বলল কিশোর। 'সানের ছাউনির পরে আরও দুটো সাইন পেরিয়ে এসেছি। তারমানে এসব সাইনপোস্টে কিছু নেই। কারমল লিখেছে রাইডস ফ্রম আ ফ্রেণ্ড। ফ্রম লিখল কেন? এখন বুঝেছি। আসলে কারমল বোঝাতে চেয়েছে, সানের বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার পর দশ নাম্বার সাইন।'

'নিশ্চয়ই!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'রাস্তার অন্য পাশের সাইন। পরের বাসেই ফিরে যাব।'

বাস এল। আবার বাড়তি ভাড়া দিতে হল, উঁচু এলাকায় ওঠার কারণে এই বিশেষ ভাড়া।

'ব্যাটারা খামোকা পয়সা নেয়,' নালিশের সুরে বলল রবিন।

'যেখানে যা নিয়ম,' কিশোর বলল। 'যাক ওসব কথা। এখন সাইনের ওপর নজর দাও।'

ফ্রিওয়েের প্রবেশমুখের কাছে এসে জেনি আর মাইককে দেখা গেল না। নেই ওরা। আবার সাইন গোনায় মন দিল তিন গোয়েন্দা।

আট নাম্বার সাইন এল। কাউন্টি পার্কের মেইন বাস স্টপের কাছেই ওটা। নয় নাম্বারটাতে লেখা রয়েছেঃ স্লো। পাহাড়ের গায়ে বসানো সাইনপোস্টের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা বেঁকে চলে গেছে বাঁধের দিকে।

'মনে হচ্ছে পার্ক আর বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যেই যত ব্যাপার,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর, 'সে-রকই লাগছে।'

পরের সাইনটা আসার অপেক্ষায় অধীর হয়ে রইল ওরা।

দূর থেকে বলে উঠল মুসা, 'খাইছে!'

রবিন বলল, 'হায় হায়!'

'আমি…আমি…,' চুপ হয়ে গেল কিশোর।

কাউন্টির সীমানা শেষ ওখানে, শহর শুরু, আর তা-ই লেখা রয়েছে ওখানকার সাইনেঃ ওয়েলকাম টু রকি বীচ।

'কিশোর, কারমল মোটেও ওটার কথা বলেনি,' জোরে হাত নাড়ল রবিন, যেন বাতাসে খাবলা মারল। 'না!' ধীরে ধীরে বলল কিশোর, 'আবারও ভুল করেছি আমরা!'

'আমরা একাই নই,' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল মুসা। 'ওই দেখ।'

বাইরে তাকিয়ে পরিচিত একটা লাল গাড়ি নজরে পড়ল। সাইনের পাশের মাটি খুঁড়ছে শুঁটকি টেরি, উন্মাদ হয়ে গেছে যেন। হতাশা আর পরিশ্রমে লাল মুখ। অনেকক্ষণ ধরে খুঁড়ছে বোঝা যায়। বাসটা ওর পাশ কাটানোর আগেই রাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতের শাবলটা।

'যাক, শুঁটকিও পায়নি, শিওর হওয়া গেল,' রবিন বলল। 'পায়নি, তবে আমাদের ঘাড়ের কাছেই হুমড়ি খেয়ে আছে,' কিশোর বলল। 'সে আর এজটাররা। সময় খুব কম আমাদের হাতে।'

'কিন্তু করবটা কি? ভুলটা কোথায় করলাম?'

'জানি না। সাইন খোঁজা বাদ দিয়ে গিয়ে সানের সঙ্গে দেখা করা দরকার,' বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে শেকল ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর।

আধ ঘন্টা পর, ড্যাম সানের ছাউনির রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। দেখা গেল ছাউনি। পুরানো, রঙ নেই। সামনে বেশ বড়সড় একটা কাঁচা চত্বর, ধুলোয় ঢাকা।

চলতে চলতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মুসা, 'মাথা নোয়াও!'

মস্ত এক পাখির মত শাঁ করে ওদের মাথার সমান্তরালে ছুটে এল বিচিত্র জিনিসটা।

বারো

ওদের মাথার ওপরে এসে আচমকা আবার উঠতে শুরু করল জিনিসটা। বেশ চওড়া এক চক্কর নিয়ে ঘুরে আবার রওনা হয়ে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। অদৃশ্য হয়ে গেল ছাউনির আড়ালে।

'ও-ওটা কি?...ভূ-ভূ...' তোতলাতে লাগল মুসা।

অট্টহাসি শোনা গেল ছাউনির পেছন থেকে। বেরিয়ে এল এক বুড়ো, ছোটখাট শরীর, মাথায় কুঁচকানো তারের মত ধূসর রঙের চুল। গায়ে বুশজ্যাকেট, পরনে মোটা কাপড়ের প্যান্ট, পায়ে মাইনার'স বুট। হাতে ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মত দেখতে বিচিত্র একটা জিনিস, এটাই উড়ে এসেছিল ছেলেদের দিকে।

'খুব ঘাবড়ে দিয়েছি, না?' ফ্যাকফ্যাক করে হাসল বুড়ো। হাতের জিনিসটা

নাচাল। 'এটা দিয়ে পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে ক্যাঙারু ফেলে দিতে পারি।'

'বুমেরাঙ!' বিড়বিড় করল রবিন।

'আমাদের গায়ে লাগতে পারত!' কড়া গলায় বলল মুসা।

নেচে উঠল বুড়োর নীল চোখের তারা। 'লাগানোর জন্যে তো মারিনি। তাহলে বাঁচতে পারতে না। আমার সময়ে কুইনসল্যাণ্ডে সবচে ভাল বুমেরাঙ ছুঁড়তে পারতাম আমি।'

'সব সময়ই কি আপনার হাতে ফেরত যায়?' জানতে চাইল রবিন।

'ছুঁড়তে জানলে সব সময়ই আসবে।'

'যদি নিশানা ব্যর্থ হয়, তাহলেই শুধু আসবে, তাই না মিস্টার সান?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। চালাক ছেলে। তা, এখানে কি চাই?'

কি জন্যে এসেছে বলতে শুরু করল রবিন আর মুসা।

বাধা দিয়ে সান বলল, 'জানি, আর বলতে হবে না। তোমরাই উড আর এলসাকে সাহায্য করছ। আমার কাছে কি চাই? আমি তো জানি না ওগুলো কোথায় আছে। আর জানলেও বলতাম না।'

'তা না জানুন, দু'একটা ধাঁধার সমাধানে তো অন্তত সাহায্য করতে পারবেন?'

'কেন করব, বল? ডেন যদি চাইত, রত্নগুলো তার ছেলের বৌ পাক, তাহলে তো দিয়েই যেতে পারত। দিল না কেন? ইচ্ছে নেই বলে। নতুন একটা উইল করল, আমাকে সাক্ষী রাখল। অনুরোধ জানিয়ে রাখল, যদি হঠাৎ সে মরে যায় তাহলে ওটা যেন পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করি...'

'হঠাৎ মরে যাবেন আশা করছিলেন নাকি?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল রবিন।

'কি জানি। তবে হার্ট খারাপ ছিল, প্রচুর ওষুধ খাচ্ছিল। কারণও আছে। সারাজীবন ওটাকে কম খাটায়নি তো। খাটিয়েছি আমরা সবাই। বুশরেঞ্জার, মাইনার, প্রসপেক্টর, কি কাজ করিনি...'

'আপনার কি মনে হয়?' জানতে চাইল রবিন। 'কারমল ধাপ্পা দিয়েছেন?'

'রসিকতা সে পছন্দ করত।' চোখ সরু সরু হয়ে এল বুড়োর। 'ওর মনে কি ছিল, আমি বলতে পারব না।'

'আপনিও গুপ্তধন চান?' মুসা বলল। 'রাইমিং স্ল্যাং আপনি ভাল জানেন।'

'দেখ ছোকরা, মুখ সামলে কথা বল!' রেগে গেল সান। 'ও আমার বন্ধু ছিল। ওর জিনিস মরে গেলেও নিতে যাব না আমি। তাছাড়া, স্ল্যাং জানি বটে, কিন্তু

উইলের সমস্ত রাইম আমিও জানি না।'

'নিশ্চয় মূল্যবান কিছু জানেন আপনি,' স্বর নরম করে বলল কিশোর। 'কারমল নিয়মিত আসতেন আপনার কাছে। তিনি...'

'দেখ, আমি এলসাকে সাহায্য করব না!'

'দেখুন,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'কারমল নিশ্চয় চেয়েছেন আপনি সাহায্য করবেন, যে ধাঁধার জবাব জানতে আসবে তাকেই। মাথা খাটিয়ে বের করার কথা বলেছেন আপনার বন্ধু। এলসা যদি মাথা খাটিয়েই নিতে চায়, অসুবিধে কি? উত্তরাধিকার সূত্রে তো আর পাচ্ছে না।'

'তা ঠিকই বলেছ,' নরম হল বুড়ো। 'বেশ, বল কি জানতে চাও।'

'ধাঁধার জবাব খুঁজতে খুঁজতে আপনার কাছে পৌছেছি,' কিশোর বলল। 'আমাদের মনে হয়েছে, বল অভ টোয়াইন মানে রোড সাইন। আপনি কি বল্লেন?'

'ছন্দ তো মেলে। তবে বল অভ টোয়াইনের রাইমার স্ল্যাং সাইন কিনা বলতে পারব না।' হাসি দেখা গেল বুড়োর নীল চোখের তারায়। 'নিজে নিজেই বানিয়ে থাকতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার কোন দুর্গম অঞ্চলে কিছু শুনে এসে সেটা দিয়েই বানিয়েছে কিনা কে জানে। ওর পক্ষে সম্ভব।'

'কারমল ইঙ্গিত দিয়েছেন, বাসে চড়ে সাইন গুনতে গুনতে যাবার। তাঁর বাড়ি আর আপনার বাড়ির মাঝের পথে। নিশ্চয় দশ নাম্বার সাইনটা কোন সূত্র।'

'তাহলে ওখানে গিয়ে না খুঁজে আমাকে কেন বিরক্ত করছ?'

'খুঁজেছি,' মুসা বলল। 'পাইনি।'

'তাই নাকি? শয়তানী বুদ্ধিতে মগজ বোঝাই ছিল ওটার,' আবার ফ্যাকফ্যাক করে হাসল বুড়ো।

'তা ছিল,' মানতে বাধ্য হল কিশোর। 'কিন্তু বাস রুটে কিছু একটা রয়েছে, যেটা শুধু আপনি জানেন, মিস্টার সান।'

'জানি? কি সেটা?' নেচে উঠল আবার বুড়োর চোখের তারা।

'সেটা আপনি জানেন।'

'চালাক ছেলে,' মাথা ঝাঁকাল সান। 'হ্যাঁ, বাসে চড়ে আসার মধ্যেও তার বিশেষত্ব ছিল। ওকে চিনলে, ওর কাজকর্মে আর কেউ অবাক হবে না।'

'কি করতেন?' জানতে চাইল রবিন।

হাসল সান। 'সাঙঘাতিক কিপটে ছিল তো, কায়দা করে বাসের পয়সা বাঁচাত। শহরে যাবার পথে আমার বাড়ির কাছের স্টপেজটাই হায়ার জোন-এর শেষ স্টপেজ, উচ্চতার জন্যে বেশি পয়সা দিতে হয়। এর পরেরটা থেকে আর দিতে হয় না। তাই ওখানে হেঁটে চলে যেত সে, তাতে সাত সেন্ট বাঁচত।'

স্তব্ধ হয়ে গেল তিন কিশোর। সবার আগে কথা ফুটল মুসার, 'তারমানে আপনার দোরগোড়া থেকে নয়, সাইন গুনতে হবে পরেরটা থেকে?'

'হ্যাঁ,' কুটিল হাসিতে নেচে উঠল বুড়োর চোখ। 'তাই বুঝিয়েছে।'

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না তিন গোয়েন্দা। ঘুরে দৌড় দিল বাস ধরার জন্যে। পেছনে শোনা গেল সানের অট্টহাসি।

'আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল,' কিশোর বলল। 'এখানে উঠলে পয়সা বেশি দিতে হয়।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়?' মুসা বলল। 'কারমলের মত আমরাও এক স্টপেজ হেঁটেই যাই। পয়সা বাঁচবে, হয়ত কিছু চোখেও পড়তে পারে।'

'উত্তম প্রস্তাব,' রবিন বলল।

সুতরাং এক স্টপেজ হেঁটে এসে বাসে উঠল ওরা। পথে নতুন কিছু অবশ্য চোখে পড়ল না।

প্রথমবার দশ নাম্বার সাইন যেটাকে ধরেছিল, সেটার কাছে এসে গর্ত দেখল অনেকগুলো, তবে শুঁটকিকে আর দেখা গেল না। বোটানিক্যাল গার্ডেন পেরোল···ডেপুটির অফিস গেল···অনেক পরে পার্ক রোড যেখানে কারমলের বাড়ির রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে এসে দেখল পরের লাইনটা। লেখা রয়েছেঃ টার্ন লেফট হিয়ার ফর ফেয়ারভিউ শপিং মল। অর্থাৎ বাঁয়ে ঘুরলে ফেয়ারভিউ শপিং মল পাওয়া যাবে।

'লাভটা কি হল?' হতাশ হয়ে হাত ওল্টাল মুসা। 'যে গোলকধাঁধা সেই গোলকধাঁধা। বাজারে খোঁজা সম্ভব নাকি? ক'জায়গায় খুঁজব?'

'আমি শিওর, এটাই সঠিক সাইন,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'এখান থেকেই পরের সূত্র খুঁজে বের করতে হবে।'

বাস থেকে নেমে শপিং সেন্টারের দিকে হাঁটতে শুরু করল ওরা। বিরাট এলাকা নিয়ে মস্ত সুপারমার্কেট করা হয়েছে। নানারকম দোকান ছাড়াও রয়েছে রেস্টুরেন্ট, স্ন্যাক-বার। সেদিকে চেয়ে দমে গেল তিন গোয়েন্দা।

তেরো

পকেট থেকে নকলটা বের করল গোয়েন্দাপ্রধান। আপনমনেই বলল, 'টেনথ বল অভ টোয়াইন আমাদেরকে নিয়ে এসেছে শপিং সেন্টারে। তারপরে? ইউ অ্যাণ্ড মি; সী আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ অ্যাহেড।'

রবিন বলল, 'ইউ অ্যাণ্ড মি হল আ কাপ অভ টী।'

'মরেছে,' সেন্টারে গিজগিজ করছে লোক, সেদিকে তাকিয়ে বলল মুসা। 'এক কাপ চা নিয়ে ওখানে কেউ বসে আছে নাকি আমাদের জন্যে।'

'বসে হয়ত নেই,' কিশোর বলল। 'তবে চা কোথায় পাওয়া যাবে, তা জানি। ওই দেখ।'

একটা পনিরের দোকান আর একটা কার্পেটের দোকানের মাঝের দোকানটা চায়ের নাম লেখা রয়েছে দ্য স্ট্যাটফোর্ড টী শপ্পে। নামটার মতই অক্ষরও ইংরেজি পুরানো ধাঁচে লেখা। জানালার ওপাশে দেখা যাচ্ছে কেকের সারি।

'ছোট রেস্টুরেন্ট,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'আর আমরা কারমল্লের বাড়ি থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে রয়েছি। নিশ্চয় এখানে চা খেতে আসত সে।'

ভেতরে ঢুকল ছেলেরা। ছোট ছোট একসারি ঘর রয়েছে, নিচু ছাত। একেবারে খাঁটি ইংলিশ টী শপ। স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করানো রয়েছে স্টাফ করা মাছ, দেয়ালে শোভা পাচ্ছে জন্তুজানোয়ারের মাথা, রকি বীচের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। ছোট ছোট টেবিলগুলোকে ঘিড়ে ভিড় করে বসেছে লোকে, চা কেক খাচ্ছে।

ছেলেদের দিকে এগিয়ে এল এক সুন্দরী ওয়েইট্রেস। হেসে জিজ্ঞেস করল কিছু লাগবে কিনা।

'ক'টা কথা জানতে এসেছিলাম,' সৌজন্য দেখিয়ে খুব ভদ্রভাবে বলল কিশোর। 'মিস্টার কারমল কি প্রায়ই আসতেন এখানে?'

'আসতেন। হপ্তায় অন্তত তিন-চার দিন।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা ছিল। নিশ্চয় নির্দিষ্ট একটা মগে চা খেতেন। ওটা দেখতে পারি?'

'মগ?' অবাক হল ওয়েইট্রেস। 'কোন মগ তো ছিল না। তাছাড়া মগ ব্যবহার করি না আমরা, কাপে চা দিই...'

'ছিল না? তাহলে...তাহলে...'

রবিন বলল, 'এখানে কখন আসতেন তিনি, কি কি করতেন, কি খেতেন বলতে পারবেন?'

'নিশ্চয় পারব। বিকেলের দিকেই আসতেন, ঠিক এই সময়। দু'তিন কাপ ওলোং আর একটা নরম রোল খেয়ে চলে যেতেন।'

'ওলোংটা কি জিনিস?' মুসা জানতে চাইল।

'চীনা চা। ভাল তৈরি হয় আমাদের এখানে, লোকে খায়ও প্রচুর।'

'মিস্টার কারমল কোন নির্দিষ্ট চেয়ারে বসতেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, এসেই ছয় নাম্বার টেবিলটার খোঁজ করতেন। ওটা খালি না থাকলে অন্য

টেবিলে বসতেন।'

'টেবিলটা দেখতে পারি?' কিশোর বলল।

'তা পার। খালিই আছে এখন।'

ওয়েইট্রেসের পিছু পিছু কোণের একটা টেবিলের কাছে চলে এল ছেলেরা। টেবিলের পাশে দেয়ালে বসানো একটা দানবীয় তলোয়ার মাছ। চেয়ারে বসল মুসা। 'খাইছে! এখানে বসে উল্টোদিকের দেয়াল ছাড়া তো আর কিছুই দেখা যায় না।'

রবিন বসল আরেকটা চেয়ারে। 'শুধু সামনের দেয়াল দেখা যায়, কিশোর। একটা হরিণের মাথা, বড় একটা আয়না আর গোটা দুই ছবি, ব্যস। মগটগ নেই।'

'কিশোর,' প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা। 'হরিণটার নাক আছে! পরের ধাঁধায় নাকের কথা বলা হয়েছে না?'

নকল বের করে পড়ল কিশোর, 'ওয়ান ম্যান'স ভিকটিম ইজ অ্যানাদার'স ডারলিন', ফলো দ্য নোজ টু দ্য প্লেস। মানে হল, একজনের শিকার আরেকজনের প্রিয়, নাক অনুসরণ করে জায়গামত যাও। বেশ। হরিণটা অবশ্যই একজনের শিকার। হরিণ ইংরেজি ডিয়ার, প্রিয় ইংরেজিও ডিয়ার, দুটো শব্দের বানান আলাদা হলেও উচ্চারণ এক। প্রিয়, অর্থাৎ ডিয়ারের প্রতিশব্দ ডারলিং। আবার ডারলিংকে অনেকে উচ্চারণ করে ডারলিন।'

'করে,' রবিন বলল। 'কিন্তু হরিণের নাক তো এই টেবিল ছাড়া আর কোনদিকে নির্দেশ করছে না।'

আশা ছাড়তে পারল না কিশোর। 'ওই ছবিগুলোতে কিছু নেই তো?'

এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো কাছে থেকে দেখল তিনজনে। একটাতে রয়েছে রকি বীচের একটা হোটেল, যেটা বহু বছর আগেই ভেঙে ফেলা হয়েছে। আরেকটাতে আগের বছরের ফিয়েস্টা ডেপরেডের দৃশ্য।

'টেবিলে কিছু লুকানো নেই তো?' রবিন বলল।

টেবিলের ওপরে নিচে তন্ন তন্ন করে দেখা হল। কিছু পাওয়া গেল না। ঘড়ি দেখল ওয়েইট্রেস। 'দেখ, এখন আমরা খুব ব্যস্ত।'

বেরিয়ে যেতে বলা হচ্ছে, বুঝল ছেলেরা। খুবই নিরাশ হয়ে বেরিয়ে এল চা দোকান থেকে। দেরি হয়ে গেছে অনেক, ডিনারের সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

'ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি,' ঘোষণা করল মুসা। 'অযথা এসব খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে চল বাড়ি চলে যাই। সাইকেলগুলোও নিতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই চলো,' এভাবে বিফল হয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। 'তবে চলো আগে এলসার সঙ্গে দেখা করে যাই। চা দোকানের

ব্যাপারে হয়ত কোন তথ্য দিতে পারবে।'

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছেলেদের কথা শুনল এলসা। 'কি জানি। ওই দোকানের কথা আমি কিছু জানি না।'

'ওলোঙের কোন বিশেষ মানে হয়?' রবিন জানতে চাইল।

'কি?' অন্যমনস্ক মনে হল এলসাকে। 'অ্যাঁ...আসলে কোন কথায়ই মন দিতে পারছি না। সেই দুপুরের পর থেকে আর নরির খবর নেই।...কি যেন বলছিলে, ওলোং? এক জাতের চা, কারমলের খুব প্রিয় ছিল...ওফ, বাঁচা গেল! ওই যে নরি আসছে, সঙ্গে রস!'

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল এলসা। ঘরে ঢুকল নরি আর উড। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।

'এদিকেই আসছিলাম,' উড জানাল। 'শপিং সেন্টারে ঘুরঘুর করতে দেখলাম ওকে।'

ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'নিশ্চয় আবার আমাদের পিছু নিয়েছিল।'

'রাস্তার ইঁটকেও বিশ্বাস কোরো না তোমরা!' চেঁচিয়ে উঠল নরি। 'আমি...'

'চুপ কর, নরি!' ধমক দিল এলসা। 'সকালেই তোমাকে মানা করেছি, একা একা বাড়ি থেকে না বেরোতে।'

'থাক, হয়েছে,' হাত তুলল উড। 'ছেলেরা, এবার বল তো কতখানি এগোলে।'

ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে করতে ছেলেদের কথা শুনল সে। বলল, 'চা দোকানে মগ নেই, তোমরা শিওর?'

'শিওর,' কিশোর বলল। 'তাঁর ঘরে নেই তো?'

থমকে দাঁড়াল উড। তারপর কি মনে করে ছুটল কারমলের ঘরের দিকে। পিছু নিল অন্যেরা। ধুলোয় ঢাকা ঘরটায় গরুখোঁজা করা হল। মগ একটা পাওয়া গেল বটে, ধূসর রঙের সাধারণ মগ, কোন চিহ্নটিহ্ন নেই।

'নাহ, এটা না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

মগটা রাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল উড। 'ইস, এগোনোই যাচ্ছে না,' মুঠো করে ফেলল হাত। 'অথচ তাড়াতাড়ি করা দরকার। এজটাররা আর ডয়েলদের ওই ছেলেটা যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, আমাদের আগেই না পেয়ে যায়!'

'মা,' নরি বলল, 'দাদা...'

তাকে থামিয়ে দিল তার মা। 'তোমার গোসলের সময় হয়েছে। যাও।'

তার কথা শুনল না দেখে রাগ করে দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল নরি।

'ধুলোয় ঢাকা ঘরটাতেই পায়চারি শুরু করল আবার উকিল।'মাগ-এর সঙ্গে

ছন্দ মেলে এরকম আর কি কি শব্দ আছে?'

'চা দোকানে ওরকম তো কিছু চোখে পড়ল না,' কিশোর বলল। 'মাগের সঙ্গে মেলে বাগ, হ্যাগ, লাগ, রাগ...'

'কি হয়, সেটা তুমি মিলিয়ে নিয়ো,' আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল উডের কণ্ঠ। 'জলদি সমাধানের চেষ্টা কর। নইলে অন্য গোয়েন্দা ভাড়া করতে হবে আমাকে।'

মনমরা হয়ে কারমলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। বাস ধরে ডিপোতে ফিরে যেতে হবে। স্টপেজের দিকে এগোতে এগোতে চমকে উঠল রবিন। 'এই, দেখ, সেই গাড়িটা!'

পরিচিত নীল গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। পেছনে গাছের ছায়ায় নড়ছে দানবীয় ছায়া।

'এই নিয়ে তিনবার দেখা হল,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'আর কাকতালীয় বলা যাবে না। নিশ্চয় আমাদের ওপর নজর রাখছে, কিংবা...'

'কিশোর,' মুসা বলল, 'আরেকজন!'

ছোট আরেকটা ছায়ামূর্তি যোগ দিল বড়টার সঙ্গে।

'চলো, শুনি, ওরা কি বলে,' কিশোর বলল। 'এমন ভাব দেখাবে, কিছু দেখিনি আমরা। খানিক দূর গিয়ে ঘুরে আবার ফিরে আসব।'

খানিক দূর এগিয়ে, রাস্তা থেকে নেমে গাছপালার ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। ঘুরে, ফিরে এল গাড়িটার কাছাকাছি। আস্তে মাথা তুলল মুসা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'দৈত্যটা আবার একা হয়ে গেছে।'

পেছনে মট করে একটা কুটো ভাঙল। ঝট করে মাথা ঘোরাল ছেলেরা। জ্বলন্ত চোখে তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হালকা-পাতলা একজন মানুষ। টুপির কানা সামনের দিকে নামানো। কালো জ্যাকেটের বুক খোলা। ভেতরে হোলস্টারে পিস্তল দেখা যাচ্ছে। কঠিন গলায় ধমক দিল, 'এখানে কি?'

আরেক ধার থেকে উদয় হল দৈত্যটা। ছয় ফুট নয় ইঞ্চির কম হবে না লম্বায়, ভোঁতা নাক, ছড়ানো বড় বড় কান, অস্বাভাবিক লম্বা হাত।

'আমাদের ওপর চোখ রাখছিলেন কেন?' বেপরোয়া হয়ে গেল মুসা। 'কে বলল চোখ রাখছি?' কর্কশ কণ্ঠে বলল পাতলা লোকটা।

'তাহলে কি করছেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল রবিন।

'নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে, খোকা। যাও, ভাগ।'

এত সহজে ছাড়া পাবে ভাবেনি ছেলেরা, দৌড় দিল গাছপালার ভেতর দিয়ে। বাস আসার শব্দ শুনল। স্টপেজে এসে বাসটা ধরল ওরা। শহরমুখো অর্ধেক রাস্তা যাবার আগে কথা বেরোল না কারও মুখ দিয়ে।

রবিন বলল, 'লোকগুলো কে?'

'কি জানি,' হাত নাড়ল কিশোর। 'ছোটটার কাছে তো পিস্তল দেখলাম। গোয়েন্দা হতে পারে। চোর-ডাকাতও হতে পারে।'

'গোয়েন্দা? এজটাররা ভাড়া করেনি তো?'

'করতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন সী আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগের মানে বের করতে হবে আমাদের।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'মাগের সঙ্গে থাগ, অর্থাৎ ঠগেরও ছন্দ মেলে। ওই দৈত্যের মত ঠগের কাছাকাছি মগ খুঁজতে গিয়ে আর বিপদে পড়তে চাই না।'

চোদ্দ

'বাবা, মাগ মানে কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

পরদিন সকালে, খবরের কাগজ পড়ছিলেন মিস্টার আমান। কাগজটা নামিয়ে বললেন, 'মাগ মানে মগ।' কাগজ আবার তুলতে তুলতে বললেন, 'অবশ্য যদি সেকেণ্ড-রেট কোন লোকের কথা না বল...'

'মানে?'

'রাস্তায় ধরে পথিককে পিটিয়ে যে জিনিসপত্র কেড়ে নেয় তাকেও বলে মাগ।'

'নাহ্।'

'মাগ শট বলে আরেকটা শব্দ আছে,' বললেন তিনি। 'পুলিশের তোলা ছবি, চোর-ডাকাতের ক্লোজ আপ...তাছাড়া আয়না...'

'মাগ শট? আয়না!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল গোয়েন্দা সহকারীর। সজোরে চাপড় মারল উরুতে। 'তাই হবে!'

'কি হবে?' কাগজের ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান। জবাব না পেয়ে কাগজ নামিয়ে দেখলেন, রিসিভার তুলে ততক্ষণে ডায়াল শুরু করে দিয়েছে মুসা।

হেডকোয়ার্টারে কিশোরকে পেল না মুসা। ঘরে রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। তাকে ওখানে ধরল সে। চেঁচিয়ে বলল, 'সুখবর আছে! রবিনকে আসতে বল!'

রিসিভার নামিয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল মুসা।

কয়েক মিনিট পর হেডকোয়ার্টারে ঢুকে দেখল, কিশোর বসে আছে। রবিন এসে পৌঁছায়নি।

'এসে যাবে,' কিশোর বলল। 'তা কি সুখবর?'

'সী আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ অ্যাহেড-এর জবাব,' হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে

চেয়ারে হেলান দিল মুসা। 'জানি এখন।'

'কী?'

মুসা জবাব দেয়ার আগেই টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে নিল কিশোর। এলসা করেছে। 'নরি আবার হারিয়েছে,' বলল উৎকণ্ঠিত মা। 'আজ সকালে উঠে বলল, মাগের মানে জানে। আমার মনে হয় চায়ের দোকানটাতে গিয়েছে সে। অনেকক্ষণ হল, এখনও ফিরছে না, ভয় লাগছে আমার। বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে কিছু আজব লোক। এজটারদের গাড়ি দেখেছি বলেও মনে হল।'

'আজব মানুষগুলোর একজন কি দৈত্য?'

'হ্যাঁ। আগেও দেখেছি তাকে। রসকে ফোন করেছিলাম, পাইনি।'

'এক্ষুনি শপিং সেন্টারে যাচ্ছি আমরা,' কথা দিল কিশোর। 'মাগের মানে কি, বলেছে কিছু নরি?'

'না। প্লীজ, তাড়াতাড়ি কর, কিশোর।'

করবে, বলে রিসিভারও রাখল কিশোর, রবিনও ঢুকল ট্রেলারে। কি হয়েছে জানানো হল তাকে। গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর, 'নরির যদি কিছু ঘটে যায়, তাহলে কারমলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে এজটাররা।'

'কিন্তু মুসা কি যেন জানাবে বললে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'সেটার দিকেই তো তাকিয়ে আছি এখন,' হেসে বলল মুসা।

'কোথায়?' চারপাশে খুঁজল রবিন, কিশোরও খুঁজছে।

'তোমাদের দু'জনের সামনেই!'

ভ্রূকুটি করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ঠাট্টার সময় নয় এটা, সেকেণ্ড।'

'কই,' রবিন বলল, 'শুধু তো দেখছি ডেস্ক, দেয়াল, পুরানো আয়না, শেকসপীয়ারের মূর্তি...'

'বুঝেছি!' নাকমুখ এমনভাবে কুঁচকে ফেলল কিশোর, যেন নিমের তেতো খেয়েছে। কেউ তার ওপর টেক্কা দিক এটা সইতে পারে না সে। 'আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ। কারমলের আরেকটা শয়তানী।'

'কই?' আবার বলল রবিন। 'দেখছি না তো কিছু।'

'আয়না, রবিন,' কিশোর বলল। 'আমরা আমাদের চেহারা দেখতে পাচ্ছি। মাগ হল চেহারার স্ল্যাং। চা দোকানের দেয়ালেও একটা বড় আয়না লাগানো আছে। সী আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ অ্যাহেড বলে আয়নার ভেতর দেখতে বলা হয়েছে।'

'চলো, জলদি,' মুসা তাগাদা দিল।

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে সাইকেলে চাপল ওরা। রওনা হল কারমলের প্রিয়

চায়ের দোকানে। পৌঁছে দেখল খোলাই আছে, তবে ভিড় কম, অল্প কয়েকজন খরিদ্দার, দুপুরের আগে বাড়বে না। নরি নেই ওখানে। আগের দিনের ওয়েট্রেসকেও দেখতে পেল ওরা। প্রশ্নের জবাবে বলল, 'হ্যাঁ, ওই বয়েসের একটা ছেলেকে দেখেছি। ঘন্টাখানেক আগে এসে বসেছিল ছয় নাম্বার টেবিলে, কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেছে।'

'আর কাউকে দেখেছেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'মোটা এক লোক, আর রোগাটে এক মহিলা। ছেলেটা আসার আগে এসেছিল, মিস্টার কারমলের কথা জিজ্ঞেস করল, আমি বললাম ছয় নাম্বার টেবিলে বসতে। ওরাও বসল। তবে ছেলেটার মত সন্তুষ্ট মনে হয়নি ওদেরকে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস,' বলে বন্ধুদের দিকে ঘুরল কিশোর।

'কি মনে হয়, এজটাররা নরিকে ধরে নিয়ে গেছে?' রবিন বলল।

'তার পিছুও নিয়ে থাকতে পারে।'

'আগের জবাব নিশ্চয় পেয়ে গেছে নরি, নইলে সন্তুষ্ট মনে হত না,' মুসা বলল। 'তাকে খুঁজে বের করতে হলে এখন তাড়াতাড়ি পরের ধাঁধাটার জবাব জানতে হবে আমাদেব।'

ছয় নাম্বার টেবিলের পাশে গিয়ে বসল কিশোর। আয়নার ভেতরে তাকাল। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল মুসা আর রবিন।

'নিজের চেহারা দেখতে পাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'আর, টেবিল, তলোয়ার মাছ, দেয়ালে ঝোলানো পুরানো একটা খাদ্য তালিকা, দুটো ছবি...এই তো।'

'পরের ধাঁধাটা পড়ে দেখ, কিশোর,' পরামর্শ দিল রবিন।

নকলটা বের করে পড়ল কিশোর, 'ওয়ান ম্যান'স ভিকটিম ইজ অ্যানাদার'স ডারলিন', ফলো দ্য নোজ টু দ্য প্লেস।'

রবিন বলল, 'বিশেষ কোন চেহারার কথা বোঝায়নি কারমল। সে জানত না কখন কোন মুখটা উঁকি দেবে আয়নার ভেতর।'

মুসা বলল, 'ছবি দুটোও বন্দরের। শিকার কিংবা প্রিয় কিছুই নেই ওগুলোতে। আর নাকও তো আমাদের তিনটে ছাড়া আর কারও দেখছি না।'

'পুরানো খাদ্য তালিকাটার ব্যাপারে কি মনে হয়?' রবিনের প্রশ্ন।

'না,' জোরে জোরে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'মনে হয় বুঝতে পারছি। শিওর হওয়া দরকার। এস।'

ওয়েট্রেসের কাছে গিয়ে পাবলিক টেলিফোন কোথায় জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমাদের এখানে নেই,' ওয়েট্রেস বলল। 'রাস্তার ওপারে পেট্রল পাম্পটায় গিয়ে দেখতে পার।'

পেট্রল পাম্পটা বন্ধ। তবে বুদটা দেখা গেল, বাইরে। ডিরেক্টরিতে ড্যাম সানের নাম্বার খুঁজে বের করে তাকে ফোন করল।

'আবার তুমি,' খসখসে কণ্ঠে বলল বুড়ো।

'স্যার,' নরম গলায় বলল কিশোর। 'আপনি বলেছেন, মিস্টার কারমলের সব স্ল্যাঙের মানে আপনি জানেন না। কিন্তু আমি যদি স্ল্যাঙের শব্দটা কি হবে আপনাকে বলে দিই, কি শব্দ দিয়ে সেটা বোঝানো হয় তা তো বলতে পারবেন?'

'মানে?'

'মানে মারলিন বলে ডারলিন বোঝানো হয়। কিন্তু উল্টোটা বলেছেন মিস্টার কারমল। ডারিলন বলেছেন মারলিন বুঝে নেয়ার জন্য। রাইমিং স্ল্যাং যদিও হয় না এটা,তাই না?'

ফিকফিক করে হাসল বুড়ো। 'তুমিও তাহলে বুঝে ফেলেছ। চালাক ছেলে।'

'আমিও মানে!' সতর্ক হয়ে গেল কিশোর। 'আরও কেউ বুঝেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, কারমলের নাতি। খুব চালাক। দাদার চেয়ে কম ধড়িবাজ না।'

বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। ফিরে চলল চায়ের দোকানে। সঙ্গে চলল দুই সহকারী।

'মারলিন মানে কি, কিশোর?' মুসা বলল।

'বড় জাতের মাছ, তলোয়ার মাছেরই প্রজাতি।'

'খাইছে! নাক আছে নাকি ওগুলোর?'

আবার চায়ের দোকানে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। সোজা এগিয়ে গেল দেয়ালের মাছটার কাছে। কিছুটা অবাক হয়েই ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ওয়েইট্রেস।

'মাছের নাক একটা ছবির দিকে,' রবিন বলল।

সামনের দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধাই ছবিটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

'আরি,' মুসা বলল, 'রকি বীচ টাউন হলের ছবি দেখি।'

'ফলো দ্য নোজ টু দ্য প্লেস,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'নাক অনুসরণ করে ওই জায়গা, মানে ওই টাউন হলে যেতে বলছে!'

'হোয়্যার,' বুঝে ফেলল রবিন, 'মেন বাই দেয়ার ট্রাবল অ্যাণ্ড স্ট্রাইফ। দ্য ম্যারিজ লাইসেন্স ব্যুরো। বিয়ের ব্যাপার-স্যাপার। বাই বলেছে সে-কারণেই।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'নরি নিশ্চয় ওখানে চলে গেছে। ওর মা'কে জানানো দরকার।'

আবার পেট্রল পাম্পে এল ফোন করার জন্যে। ডায়াল করছে কিশোর, হঠাৎ কান খাড়া করে ফেলল মুসা। 'এই শোন শোন! শুনছ?'

ডায়াল থামিয়ে কিশোরও কান পাতল। তিনজনেই শুনতে পেল বিচিত্র শব্দ।

ধাতব কিছুর ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নেয়া হচ্ছে ভারি কিছু।

'কী…?' বুঝতে পারছে না মুসা।

'ওই ঘরের ভেতরে,' পেট্রল পাম্পের অফিসটা দেখাল রবিন।

অফিসের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে আছে তিনজনে। এই সময় শোনা গেল চাপা মৃদু চিৎকার, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

পনেরো

বন্ধ ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল মুসা। 'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'বাঁচাও, বাঁচাও!' শোনা গেল আবার।

'অফিসের পেছন থেকে আসছে!' বলে উঠল রবিন।

পেছনে তিনটে পার্ক করা কার আর একটা ভ্যান দেখা গেল। আবার শোনা গেল হিঁচড়ানোর আওয়াজ।

'মনে হচ্ছে ভ্যানের ভেতরে,' মুসা অনুমান করল।

'বাঁচাও!' শোনা গেল আবার চাপা চিৎকার।

'নরি!' কিশোর বলল। 'ভ্যানটা খুলতে হবে!'

দরজায় তালা নেই। টেনে খুলতেই দেখা গেল, মেকানিকরা মাটিতে যে ক্যানভাস বিছিয়ে কাজ করে, তার একটা বড় বাণ্ডিল। নড়ে উঠল বাণ্ডিলটা, ভ্যানের ছাত থেকে ঝুলে থাকা ভারি একটা পুলিতে বাড়ি লাগল, ওটা ঘষা লাগল ধাতব দেয়ালে। হিঁচড়ানোর মত আওয়াজ করছে ওটাই।

ক্যানভাসের বাণ্ডিল নিয়ে টানাটানি শুরু করল ছেলেরা। ভেতর থেকে বেরোল নরি। হাত-পা বাঁধা। বাঁধনমুক্ত হয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে, চেহারা ফ্যাকাসে। তবে সাহস হারায়নি।

'কি হয়েছিল, নরি?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, দাদা বলত, কিছু লোকের মাগ কুৎসিত, আর কিছু লোকের সুন্দর। আয়নার কথা আন্দাজ করলাম,' গর্বের সঙ্গে বলল নরি। 'মাছটা দেখলাম, বুঝলাম মারলিনের কথা বলেছে। কারণ, প্রায়ই ওই মাছের গল্প করত সে। দেখলাম, ওটার নাক একটা ছবির দিকে। টাউন হলের ছবি। মিস্টার সানকে ফোন করে জেনে নিলাম আমার অনুমান ঠিক কিনা। আমিও রিসিভার রাখলাম, এই সময় পেছন থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা ব্যাগ ঢুকিয়ে দিল লোকটা। চেহারা দেখিনি। তারপর হাত-পা বেঁধে গাড়িতে ফেলে রেখে চলে গেল। তোমাদের সাড়া পেয়েই চেঁচাতে শুরু করলাম।'

'ভাল করেছ,' মুসা বলল।

'এজটারদের আর টেরিকে ঘুরঘুর করতে দেখেছি শপিং সেন্টারে। বোধহয় ফোনে বেশি জোরে কথা বলে ফেলেছিলাম, ওরা পেছন থেকে শুনেছে আমার কথা। এত কষ্ট সব মাঠে মারা গেল আমার,' হতাশ দেখাল নরিকে।

'ধাঁধার চমৎকার সমাধান করেছ তুমি,' প্রশংসা করল কিশোর। 'আর খুব সাহস তোমার। ভুল আমরা সবাই করি, বুঝলে। এতে এত দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। তবে ভবিষ্যতে আরও হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবে।'

'এখন তো তাহলে তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারি?' অনুরোধ করল নরি। 'প্লীজ! তোমাদের সব কথা মেনে চলব। যা করতে বলবে তাই করব। বিপদে ফেলব না।'

'কিন্তু...'

'অসুবিধে কি?' মুসা বলল। 'ছেলেটা প্রমাণ করে দিয়েছে, তার সাহস আছে। তাছাড়া বুদ্ধিও কম নয়, একটা ধাঁধার সমাধান তো আমাদের আগেই করে ফেলল।'

'নেয়া যায়,' রবিনও নরির পক্ষ নিল।

'বেশ,' অবশেষে রাজি হল কিশোর। 'নিতে পারি, যদি তোমার মা অনুমতি দেন।'

নরি ভাল আছে শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তার মা। কিন্তু কিশোর যখন বলল, ছেলেকে সঙ্গে নেবে কিনা, দ্বিধা করল এলসা।

'বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ ভালই আছে আপনার ছেলের,' কিশোর বলল। 'তাছাড়া বাড়িতে রেখেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না। যখন তখন আপনাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বরং বিপদেই পড়ছে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ঠিক আছে। যাক। তবে ওর ওপর কড়া নজর রাখবে, প্লীজ।'

সুখবরটা নরিকে শোনাল কিশোর।

চায়ের দোকানের কাছে পার্ক করে রাখা সাইকেলগুলো নিয়ে রকি বীচে চলল ওরা। রোববারের জনবিরল পথ। কোর্টহাউস আর টাউনহলের কাছে লোকজন বিশেষ নেই, দু'চারজনকে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। রোববারে বিক্রি বন্ধ, কিন্তু তবু টুরিস্ট আকর্ষণের জন্যে দোকানপাটগুলো খুলে রাখা হয়েছে।

ম্যারিজ লাইসেন্স ব্যুরোর ছোট ঘরটা টাউন হলের দোতলায়, বাঁয়ে, পেছনে একেবারে শেষ মাথায়। শূন্য ঘরটায় ঢুকল ছেলেরা। নকল বের করে পড়ল কিশোর, 'হোয়্যার মেন বাই দেয়ার ট্রাবল অ্যাণ্ড স্ট্রাইফ, গেট আউট ইফ ইউ

ক্যান।'

নীরব ঘরটায় চোখ বোলাল ওরা। ডানে বিজনেস উইনডোগুলো বন্ধ। বাঁয়ে দেয়ালের সমান্তরালে লম্বা উঁচু একটা রাইটিং কাউন্টার। সামনের দিকে গরাদওয়ালা দুটো জানালার নিচে একটা কাঠের বেঞ্চ। নানারকম নোটিশ, আর গভর্নর এবং মেয়রের ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে।

'এখানেই তাহলে স্ত্রী কেনে লোকে,' মুসা বলল। 'মানে বিয়ের লাইসেন্স জোগাড় করে। কথা হল, গেট আউট ইফ ইউ ক্যান দিয়ে কি বুঝিয়েছে?'

'আবার উল্টো কথা বলেনি তো?' রবিন বলল।

'বোঝা যাবে,' কিশোর বলল। 'আগে পরের ধাঁধাটা পড়ে দেখি কিছু বোঝা যায় কিনা। ইন দ্য পশ কুইন'স ওল্ড নেড, বি ব্রাইট অ্যাণ্ড নেচারাল, অ্যাণ্ড দ্য প্রাইজ ইজ ইওরস। এ-ঘরের কোন জিনিস হয়ত কোন রানী কিংবা বিছানা দেখাবে আমাদের।

'কোথায়?' নরি বলল। 'ওরকম কিছু তো দেখছি না।'

'না,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর, 'পশ কুইন'স ওল্ড নেড এঘরে থাকবেই এমন কোন কথা নেই। গেট আউট ইফ ইউ ক্যান দিয়ে কি বোঝায়, বোঝার চেষ্টা করে দেখি। গেট আউটের মানে এসকেপ বা পালানো হয়।'

'তবে কি ফায়ার এসকেপ?'

কিন্তু ঘরটা দোতলায়। কাছাকাছি কোন ফায়ার এসকেপ নেই।

'এসকেপ যদি হয় তাহলে তো রাইম হল না,' রবিন বলল।

'না হলে নেই, মানে হলেই হল,' বলল মুসা। 'জানালা? ওটা দিয়েও পালানো যায়। তবে এখানকারগুলো দিয়ে বেরোনো খুব মুশকিল।'

তবু জানালার কাছে এসে বাইরে তাকাল ওরা। বাড়ন্ত ঝোপ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

'ক্যান-এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে শব্দ বল তো,' কিশোর বলল।

'ব্যান, ফ্যান, ম্যান, প্যান, র‍্যান, ট্যান,' গড়গড় করে বলে গেল রবিন।

'এই, দেয়ালটা ট্যান কালারের,' নরি বলল।

'তাতে কোন সুবিধে হচ্ছে না ধাঁধা সমাধানের,' বলল কিশোর। 'তবে এখানে ম্যান আছে, দু'জন, গর্ভনর আর মেয়র।'

'নোটিশে কোন "ব্যান"-এর ঘোষণা নেই তো?' রবিনের প্রশ্ন।

নোটিশগুলো পড়তে ছুটল সবাই। বেশ কিছু নতুন নিয়ম জারি করা হয়েছে, নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিছু কিছু ব্যাপার, তবে ওগুলো থেকে ধাঁধার সমাধান হবে না।

অবশেষে কিশোর ঘোষণা করল, 'আমার মনে হয় না এটা রাইমিং স্ল্যাং।'

'কারমলের আরেক শয়তানী বুদ্ধি!' গোঁ গোঁ করে বলল মুসা।

'এখান থেকে বেরোনোর কথাই বলা হয়েছে মনে হয়।'

'কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'জানালা আটকানো। ফায়ার এসকেপ নেই। দরজা মাত্র একটা, যেটা দিয়ে ঢুকলাম। তাতে স্পেশাল কিছু নেই।'

'এই দেখ!' দরজার কাছের মেঝে দেখিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'মেঝে কেমন ক্ষয়ে গিয়েছে দেখছ লোক যাতায়াতের ফলে?'

শ্রাগ করল রবিন। 'তাতে কি? এটা স্বাভাবিক।'

'কিন্তু বেঞ্চের কাছের মেঝে দেখ।'

সবাই দেখল। ক্ষয়া একটা সরু পথ যেন গিয়ে ঠেকেছে পাশের দেয়ালে।

'গোপন দরজা!' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল রবিন আর মুসা।

দেয়ালের কাছে দৌড়ে এল ছেলেরা। খুঁজতে শুরু করল। কিন্তু দেয়ালের অন্যান্য জায়গার মতই এখানেও মসৃণ, প্লাস্টারের ওপর রঙ করা, সামান্যতম চিড় ধরেনি কোথাও। আশা আবার নিভে গেল ওদের।

'শূন্য দেয়াল,' কেঁদে ফেলবে যেন রবিন, 'আর কিছু নেই!'

আরও ভালমত দেখে মুসা বলল, 'মনে হয় দরজা-টরজা ছিল এককালে। রঙ দেখ। আশেপাশের দেয়ালের চেয়ে হালকা। নিশ্চয় গত দু'তিন মাসের মধ্যে বন্ধ করা হয়েছে দরজাটা, কিংবা এখানে নতুন করে রঙ লাগানো হয়েছে। এখানে দরজা থাকলে বেরোনো মোটেই কঠিন হত না।'

'দেয়াল গেঁথে বোজানো হয়েছে?' বিড়বিড় করল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে করতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বাইরের রাস্তাটা কোন রাস্তা? এটা দিয়ে বেরোলে যেটাতে পড়া যাবে?'

'রাস্তা?' অবাক হল রবিন। 'কেন স্যালসিপুয়েডস স্ট্রীট, তাই তো হবার কথা। কিন্তু...'

কথা শেষ হল না তার। ঝড়ের গতিতে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কিশোর।

ষোলো

সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে টাউন হলের একপাশে চলে এল কিশোর। পেছনে ছুটছে তার সহকারীরা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই, চোখ উজ্জ্বল। থমকে দাঁড়াল গোয়েন্দাপ্রধান। দেয়ালে একটা খিলানমত দেখা গেল, দরজা ছিল এককালে বোঝা যায়, ম্যারিজ লাইসেন্স ব্যুরো থেকে বেরোনোর।

'কি করব এখন, কিশোর?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দরজার ইঁট নতুন,' আনমনে বলল কিশোর। 'তারমানে মুসার কথাই ঠিক, কয়েক মাস আগে বন্ধ হয়েছে। তারমানে কয়েক মাস আগে এলেও ওই পথে আমরা বেরোতে পারতাম। বোঝা যাচ্ছে, কারমল যখন শেষ দেখেছে এই দরজাটা, তখনও এটা খোলা ছিল।'

'কিন্তু,' নরি বলল, 'ধাঁধার সঙ্গে মিলটা কোথায়? স্যালিসপুয়েডস...'

'কিশোর!' বড় বড় হয়ে গেল রবিনের চোখ। 'স্যালিসপুয়েডস স্প্যানিশ শব্দ, মনে পড়েছে! এর ইংরেজি মানে করলে দাঁড়ায়ঃ গেট আউট ইউ ক্যান!'

'তারমানে স্যালিসপুয়েডস স্ট্রীটে বেরিয়ে পশ কুইন'স ওল্ড নেডের খোঁজ করতে বলছে,' কিশোর বলল।

বন্ধ করে দেয়া দরজার আশেপাশে ঘন ঝোপঝাড় জন্মে আছে। বিল্ডিঙের পেছনে গাছও আছে বেশ কিছু। সরু একটা পথ দরজার গোড়া থেকে লন পেরিয়ে গিয়ে উঠেছে স্যালিসপুয়েডস স্ট্রীটে। বন্ধ করে দেয়া দরজাটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ছেলেরা, কোন গোপন সূত্র লুকিয়ে রেখেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। কিছু না পেয়ে, সরু পথ ধরে দ্রুত পা চালাল বড় রাস্তার দিকে।

খোলা জায়গায়, দুপুরের রোদে বেরিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। ঠিক ওপাশেই চেম্বার অভ কমার্সের অফিস। ডিসপ্লে উইণ্ডোতে বড় বড় অক্ষরে লেখাঃ

সী আ লিজেণ্ড অভ দ্য সী!!
এস. এস. কুইন অভ দ্য সাউথ
ফুললি রিস্টোরড টু
ইটস অরিজিন্যাল গ্লোরি
নাউ ওপেন
স্যাভনির রিফ্রেশমেন্টস
রকি বীচ হারবার হোয়ার্ফ

'দ্য কুইন! মানে রানী! টুরিস্টদের জন্যে নতুন আকর্ষণ!' মুসা বলল।

'তাই?' নরি জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'নিশ্চয় এটা পশ কুইন। আর সমুদ্রগামী জাহাজে বিছানা থাকবেই।'

'তারমানে এরপর আমাদেরকে যেতে হবে কুইন জাহাজে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'বিছানা খোঁজার জন্যে,' বলল রবিন।

'দাদার জিনিস পেয়ে গেছি! দাদার জিনিস পেয়ে গেছি!' হাততালি দিয়ে সুর

করে গেয়ে প্রায় নাচতে আরম্ভ করল নরি।

নীরবে দাঁত বের করে হাসল কিশোর। ঘুরে রওনা হল টাউন হলের পার্কিং লটের দিকে, যেখানে ওদের সাইকেলগুলো রেখেছে। থেমে গেল আচমকা যেন হোঁচট খেয়ে।

ঝোপের ভেতর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে কে যেন। লনে বেরোল। টেরিয়ার ডয়েল!

'ধর, ধর ব্যাটাকে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'নিশ্চয় আমাদের কথা শুনে ফেলেছে!'

'শুঁটকি কোথাকার, শুঁটকি! আজ ভর্তা বানিয়ে খাব!' মুসার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে চেঁচিয়ে বলল রবিন।

বিল্ডিং ঘুরে পার্কিং লটে পৌছার আগেই টেরিয়ারকে হারিয়ে ফেলল ওরা। যখন পৌছল, দেরি হয়ে গেছে। গাড়ি বের করে ফেলেছে টেরিয়ার। গর্জন করতে করতে ওদের দিকে ছুটে এল গাড়িটা। লাফ দিয়ে সরে গেল ওরা। পেছনে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল দেখাল শুঁটকি, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে হাসিতে।

'জলদি! সাইকেল!' ছুটতে শুরু করল আবার কিশোর।

'কিন্তু...কিন্তু...,' চেঁচিয়ে বলল নরি, 'সাইকেল নিয়ে গাড়ি ধরতে পারব না! জিনিসগুলো নিয়েই যাবে!'

'এত সহজ না। আগে আসল বিছানাটা খুঁজে বের করতে হবে তো। চলো চলো, জলদি চলো।'

'আরি, সাইকেল কোথায়!' চোখ কপালে উঠে গেল মুসার।

বোকা হয়ে পার্কিং লটের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেরা।

'নিশ্চয় শুঁটকি সরিয়েছে,' রবিন বলল।

'দাঁড়াও,' হাত তুলে দেখাল কিশোর, 'ওই যে।'

পার্কিং লটের একপ্রান্তে হালকা ঝোপের মধ্যে ভরে রাখা হয়েছে সাইকেল-গুলো। লুকানো যায়নি ভালমত, বেশির ভাগই বেরিয়ে আছে। দৌড় দিল আবার ওরা। এই সময় নরির জুতোর ফিতে গেল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁধতে বসে গেল সে। ঝোপ থেকে সাইকেল বের করে জলদি করার জন্যে তাগাদা দিতে লাগল ওকে তিন গোয়েন্দা।

'আরে, এই নরি, জলদি কর না,' অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা। 'দেরি করলে...'

কথা শেষ হল না তার। সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন লোক। একজন সেই দৈত্য, আরেকজন তার পিস্তলধারী খুদে সঙ্গী।

খপ করে মুসার হাত চেপে ধরল দানবটা। আরেক হাতে কিশোরকে। রবিনকে ধরল খাটো লোকটা। অনেক চেষ্টা করেও তিনজনের একজনও ছুটতে

পারল না। একটা গাড়ির দিকে তিন গোয়েন্দাকে টেনে নিয়ে চলল লোকগুলো।

ঝোপের কাছে সাইকেল সরিয়ে আনার কারণটা এতক্ষণে বুঝতে পারল ছেলেরা। ওদেরকে ধরার জন্যে।

সতেরো

'চুপচাপ থাক, তাহলে জখম হবে না,' ড্রাইভারের সিট থেকে বলল খাটো লোকটা।

পেছনের সিটে গাদাগাদি করে বসেছে চারজনে, দৈত্যটার একপাশে মুসা, আরেক পাশে রবিন আর কিশোর। পেছনের জানালার পর্দা টেনে দেয়া হয়েছে।

'আরেকটা ছেলে কোথায়, মিস্টার হিউগ?' দানবটা জিজ্ঞেস করল।

'পার্টি তো বলল শুধু এই তিনজনের কথাই,' খাটো লোকটা জবাব দিল। 'এদেরকে চুপ করিয়ে রাখ, বিগ, অন্য কাউকে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আরও ছেলে থাকলে থাকুক গে।'

'ঠিক আছে,' বিগ জবাব দিল।

চুপ করে রইল ছেলেরা। গাড়ি চালাচ্ছে হিউগ, খুব সাবধানে, গতি বাড়াচ্ছে না, অযথা পুলিশের চোখে পড়ার ইচ্ছে নেই। রকি বীচের অলিতে গলিতে ঘুরছে গাড়ি। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে ছেলেরা, ভয় কাটছে। ওদেরকে মারার জন্যে ধরেনি হিউগ আর বিগ, এটা বুঝে গেছে। অবশেষে জিজ্ঞেসই করে ফেলল কিশোর, 'আমাদের ধরেছেন কেন?'

হেসে উঠল হিউগ। 'এমনি।'

'না, জানতে চাইছি, কার হুকুমে ধরেছেন?'

'সেটা কেন বলব? একজন বন্ধুকে সাহায্য করছি, ব্যস।'

বিগ বলে উঠল, 'ঠিক পথেই তো যাচ্ছিলেন, মিস্টার হিউগ, আবার ঘুরছেন...'

'চুপ!' ধমক লাগাল খাটো।

আবার নীরবতা। কয়েকটা ব্লক পেরোল গাড়ি। তারপর রকি বীচের পশ্চিম অংশের একটা বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ঢুকল। বেশ বড় একটা বাড়ির পেছনের ছোট একটা কটেজের সামনে এসে থামল। বড় বাড়িটার জন্যে রাস্তা থেকে কটেজ দেখা যায় না।

'বেরোও,' আদেশ দিল হিউগ।

কটেজের পেছনে ছোট একটা ঘরে এনে ঢোকানো হল ছেলেদের। ঘরে তিনটে ছোট খাটিয়া। একমাত্র জানালাটায় ভারি পাল্লা লাগানো। দরজা দুটো,

একটা ঘরে ঢোকার জন্যে, আরেকটা লাগোয়া বাথরুমের। ঢোকার দরজাটার পাল্লা ধাতব। বাথরুমটা ছোট, জানালা নেই।

'ও-কে,' হিউগ বলল, 'এখন...'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'কোন বন্ধুর কথায় ধরেছেন, বললেন তো না। আচ্ছা, যার কথায়ই ধরে থাকেন, তার চেয়ে বেশি টাকে দেবেন আপনাদেরকে মিসেস এলসা কারমল...'

'তোমাদেরকে কিছু সময়ের জন্যে সরিয়ে রাখতে বলা হয়েছে,' কিশোরের কথায় কান না দিয়ে বলল হিউগ।

'কিন্তু একথা বলে কিডন্যাপিঙের দায় এড়াতে পারবেন না,' রবিন বলল।

'এই ছেলে,' গর্জে উঠল দৈত্য, 'কিডন্যাপার কাদেরকে বলছ?'

ভুরু কোঁচকাল হিউগ। 'আমরা কিডন্যাপার নই।'

'যেভাবেই বলুন,' কিশোর বলল, 'আপনারা...'

'হয়েছে, থাম,' খেঁকিয়ে উঠল হিউগ। 'দেখ, তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ বা রাগ নেই আমাদের। বুঝেছ? শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখছি আমরা, ব্যস।'

'কি স্বার্থ?' মুসা জানতে চাইল।

'অবশ্যই টাকা, আর কি থাকতে পারে? অনেক টাকা পাই আমরা পার্টির কাছে। দিতে পারে না। অনেক দিন হল। কত আর অপেক্ষা করা যায়।'

হেসে উঠল বিগ। বিশাল এক ভালুক যেন মাথা নাড়ল। 'খেলতে বসে যারা ঠিকমত তাস খেলতে জানে না, তাদের না খেলাই উচিত, তাই না, বস্?'

'চুপ!' ধমক দিল হিউগ। 'বেশি কথা বল তুমি।'

ঢোক গিলল রবিন। 'আপনারা...আপনারা জুয়াড়ী?'

'মোটেই না, খোকা,' হিউগ বলল। 'জুয়াড়ী হল তারা, যারা খেলে। আমরা ব্যবসায়ী। লোকে জুয়া খেলতে চায়, আমরা তাদের জায়গা দিই, খেলার সুযোগ করে দিই। আমরা নিজেরা কক্ষনও খেলি না।'

'মিস্টার হিউগ,' কিশোর বলল। 'আপনার বন্ধু যে-ই হোক, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমাদেরকে ছেড়ে দিলে তার চেয়ে বেশি টাকা দেবে আপনাকে মিসেস কারমল। সে না দিলে আমার চাচা দেবে...'

'দেখ, খোকা, প্রথমেই বলেছি আমরা কিডন্যাপার নই। তোমাদেরকে জিম্মি রেখে তোমাদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার জন্যে ধরে আনিনি। পার্টির কাছে যে টাকা পাই, সেটাই শুধু আদায় করে নিতে চাই, ব্যস। তোমাদের কাছ থেকে একটা কানাকড়িও নেব না, বেশি নেবারও ইচ্ছে নেই। চুপ কর এখন। বড় বেশি কথা বলছ।' দৈত্যের দিকে চেয়ে ইশারা করল 'বিগ!'

দরজার দিকে ঘুরল বিগ। কি মনে হতে ফিরে চেয়ে বলল, 'তোমরা এখানে ভালই থাকবে।'

'হ্যাঁ,' হিউগ বলল, 'বিছানা আছে, টয়লেট আছে। ওই আলমারিতে খাবার আছে। জগ ভর্তি পানি আছে। একেবারে নিজের বাড়ির মত লাগবে তোমাদের। খাও-দাও, আলাপ কর, বিশ্রাম নাও। শুধু বেরোতে পারবে না।'

বেরিয়ে গেল দু'জনে। দরজায় তালা লাগানোর শব্দ শুনতে পেল ছেলেরা। তালা লাগিয়ে, দরজার ভারি দণ্ডটা আড়াআড়ি লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল ওরা। বন্দি হল তিন গোয়েন্দা।

সামনের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শোনা গেল। তবে গাড়ির ইঞ্জিন চালু হল না। বাইরের ঘরে কে যেন নড়াচড়া করছে। ভারি মানুষ বসায় মড়মড় করে উঠল একটা কাঠের চেয়ার। তারপর শোনা গেল ভারি নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ, ভালুকের দীর্ঘশ্বাসের মত।

'বিগ এখনও রয়েছে,' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।

নিচু গলায় কিশোর বলল, 'বেরোনোর পথ খুঁজে বের করতে হবে আগে। তারপর দৈত্যটাকে ফাঁকি দেয়ার কথা ভাবব।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। জানালা পরীক্ষা করতে লাগল রবিন। কিশোর গিয়ে ঢুকল জানালাবিহীন বাথরুমটায়।

সবার আগে পরাজয় মেনে নিল মুসা।

'দরজায় ডাবল তালা,' জানাল সে। 'ইস্পাতের পাল্লা, কাজেই তক্তা খুলে যে ফোকর করব তারও উপায় নেই। কব্জাগুলো বাইরের দিকে।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। 'ভেন্টিলেটরের ফোকরও নেই।'

'জানালার পাল্লার কব্জাও বাইরের দিকে,' রবিন বলল। 'বাইরে থেকে লোহার চ্যাপ্টা ডাণ্ডা লাগানো, খোলা যাবে না।'

'মেঝে দেখা বাকি এখনও,' মুসা বলল।

দেখতে বেশিক্ষণ লাগল না।

'নাহ্,' মাথা নেড়ে বলল সে, 'পুরো ঘরটা কংক্রিটের একটা বাক্স। দেয়ালে কোন ফোকরই নেই।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'কিশোর, বেরোতে পারব না। এসব পরিশ্রম না করে এস শুয়ে থাকি।' এবং তা-ই করল সে।

'ওরা পেশাদার লোক,' কিশোর বলল, 'ফাঁক রাখবে কেন?' মুসার পাশের বিছানাটায় শুতে শুতে রবিন বলল, 'চমৎকার এই রত্নশিকারের এটাই সমাপ্তি। আমাদেরকে আটকে রাখার আদেশ যে দিয়েছে, সে নিশ্চয় এখন রওনা হয়ে গেছে কুইন অভ দ্য সাউথ-এর উদ্দেশে।'

'ওয়াকিটকিগুলো আনার কথাও মনে হল না আজ।'ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে কিশোরের।

'আনলে কি হত?' রবিন বলল। 'তিনজনকেই তো ধরেছে।'

'নরির কাছে রাখতে পারতাম একটা।'

'নরি!' লাফিয়ে উঠে বসল মুসা। 'হয়ত আমাদের ধরা পড়তে দেখেছে। তাহলে নিশ্চয় পুলিশে খবর দেবে।'

'হয়ত ইতিমধ্যে খুঁজতে আরম্ভ করেছে আমাদেরকে,' আশা করল রবিন।

'এত আশা কোরো না,' সাবধান করল কিশোর। 'নরি না-ও দেখে থাকতে পারে। ও তখন ফিতে বাঁধায় ব্যস্ত। আর যদি দেখেও, অত দূর থেকে গাড়ির নাম্বার নিশ্চয় দেখতে পায়নি। শুধু বলতে পারবে, নীল গাড়ি দেখেছে। আর নীল গাড়ি রকি বীচে হাজারটা আছে।' হতাশ ভঙ্গিতে ধপ করে খাটিয়ায় বসে পড়ল সে।

'এমনও হতে পারে, জাহাজে চলে গেছে নরি,' রবিন বলল। 'পরের ধাঁধাটার সমাধান করতে ব্যস্ত। বুদ্ধি আছে ছেলেটার। ওল্ড নেড বের করেও ফেলতে পারে।'

'বিপদেও পড়তে পারে!' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'এজটাররা খুবই বিপজ্জনক ওর জন্যে।'

'তাহলে নরির আশাও নেই!' ধীরে ধীরে আবার শুয়ে পড়ল মুসা।

কিশোরও শুয়ে পড়ল। আর কিছু করার নেই। শুধু প্রার্থনা করা ছাড়া—নরি ভাল থাকুক, কিছু একটা করুক ওদের জন্যে।

ঘন্টার পর ঘন্টা পেরোল। জানালার পাল্লার ফাঁক দিয়ে এসে পড়া রোদের রশ্মি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল। ইতিমধ্যে একবার হিউগের সাড়া পেয়েছে ছেলেরা, বিগের সঙ্গে কথা বলে আবার চলে গেছে। খিদে লাগল মুসার। আলমারি থেকে খাবার বের করে খেতে শুরু করল। অন্যদের খিদে নেই, তবু খানিকটা রুটি আর পনির নিয়ে চিবাতে লাগল। গায়ের বল ঠিক রাখতে হবে।

খাওয়ার পর চিত হয়ে শুয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর, 'একটা ব্যাপার সত্যি অদ্ভুত।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আমাদের কথা জানল কি করে হিউগ আর বিগ? চোখ রাখল কেন দিনের পর দিন? তখন থামানোর চেষ্টা করল না কেন? একবার এমনকি আমাদের সাহায্যও করেছে, এজটারদের গাড়ি খাদে ঠেলে ফেলে। ভাবটা এমন, আমাদের দিয়ে পাথরগুলো বের করিয়ে নিতে চাইছিল। তারপর সময় বুঝে ধরেছে। ঠিক

সময়টা কি করে বুঝল? কে বলেছে ওদেরকে? কে চায় ওই পাথর?'

'এজটাররা?' মুসা বলল।

'ওরা তো চায়ই। কিন্তু ওরা এসেছে দিন কয়েক আগে, জুয়ায় হেরে হিউগের কাছে অনেক দিন ধরে ঋণী থাকার কথা নয় ওদের।'

'এমন কেউ, যাকে চিনি না আমরা,' রবিন বলল।

'হতে পারে,' আবার ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর।

রোদ আসা বন্ধ হয়ে গেল। কমে আসছে বদ্ধ ঘরের আলো। সারা বিকেলটাই আটকে রয়েছে ওরা। অন্য ঘরে নাক ডাকাতে শুরু করেছে বিগ। এইবার বুঝি সত্যিই পরাজিত হল ওরা। এত কষ্ট করে ধাঁধার সমাধান করে দিল, এখন গুপ্তধনগুলো বের করে নেবে অন্য লোক। ওদেরকে ঠকিয়েছে কেউ!

বদ্ধ ঘরের নীরবতায় শুয়ে শুয়ে ওদেরও তন্দ্রা নামল চোখে। কি করারই বা আছে আর?

হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মুসা। 'কিসের শব্দ!'

কান পাতল তিনজনেই। বাড়ি কাঁপিয়ে নাক ডাকাচ্ছে বিগ। কিন্তু সে-শব্দ নয়। টোকার আওয়াজ!

'জানালায়!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

আবার হল টোকার শব্দ। তারপর ফিসফিসিয়ে কথা, 'তোমরা ওখানে? কিশোর? মুসা?'

'হ্যাঁ,' জানালায় মুখ লাগিয়ে জবাব দিল মুসা।

মৃদু মচমচ করে উঠল জানালা। পাল্লার বাইরে দণ্ড খোলার চেষ্টা করছে কেউ, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে, বোধহয় উত্তেজনা আর পরিশ্রমে। অবশেষে খুলে গেল পাল্লা। হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'নরি!' প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল ওরা। তবে কণ্ঠস্বর নামিয়েই বলল।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' হাসল ছেলেটা। 'আস্তে। ভালুকটা দরজা জুড়ে চেয়ার ফেলে ঘুমোচ্ছে। যে-কোন সময় জেগে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি কর।'

সেকথা আর দ্বিতীয়বার বলতে হল না ওদেরকে। জানালা গলে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার ছায়া নামছে তখন। নিঃশব্দে বাড়ির পাশ ঘুরে এসে দ্রুতপায়ে রাস্তার দিকে এগোল ওরা।

'কি করে খুঁজে পেলে আমাদের, নরি?' কিশোর জানতে চাইল।

রাস্তায় পৌঁছে গেছে ওরা। নরি জানাল, 'তোমাদেরকে ধরে নিয়ে গেলে দৌড়ে গিয়ে আমি মিস্টার উডকে ফোন করলাম। কিন্তু বাড়িতে কিংবা অফিসে কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। আমার মা'কে কিংবা তোমাদের বাড়ির লোককে ঘাবড়ে

দিতে চাইনি। তবু অনেক ভেবেচিন্তে শেষে তোমার চাচাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, এই সময় বুদ্ধিটা এল মাথায়।'

'কি বুদ্ধি?' হাঁপাচ্ছে কিশোর, প্রায় দৌড়ে চলছে এখন ওরা।

'ভূত-থেকে-ভূতে।'

ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। আবার চলতে চলতে বলল, 'তুমি...তুমি আমাদের ভূত...'

'তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই এর কথা শুনেছি আমি। সুযোগ পেয়েই আর দেরি না করে কাজে লাগলাম। সাময়িক হেডকোয়ার্টার হিসেবে বেছে নিলাম একটা ফোন বুদ। অবশেষে কয়েকটা ছেলে খুঁজে পেল গাড়িটা।'

'আশ্চর্য! গাড়িটার নাম্বারও তো জানো না তুমি!'

'জানি,' গর্বের হাসি হাসল নরি। 'আমাদের বাড়ির সামনে কয়েকবার দেখেছি ওদের। এত বেশি, শেষে সন্দেহ হয়ে গেছে আমার। আজ সকালেই লিখে নিয়েছি ওদের নাম্বারটা। আসলে গোয়েন্দারা...'

কথা শেষ হল না। পেছনে শোনা গেল জোর গর্জন, প্রচণ্ড ধুড়ুম ধুড়ুম।

'দৈত্যটা বেরিয়ে পড়েছে!' চেঁচিয়ে বলল নরি। 'দরজার সামনে ময়লা ফেলার টিন বসিয়ে রেখে এসেছিলাম। দৌড় দাও জলদি!'

ছুটতে ছুটতে ব্লক পেরোল ওরা, আরেকটা রাস্তা পেরিয়ে মোড় ঘুরে ছুটে চলল প্রাণপণে।

'আরও জোরে!' মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে বলল রবিন। 'গাড়ি নিয়ে আসবে।'

'পারবে না,' এতই হাঁপাচ্ছে, ঠিকমত কথা বলতে পারছে না নরি। পকেট থেকে কালো একটা জিনিস বের করে দেখাল। 'ডিসট্রিবিউটর ক্যাপটা খুলে নিয়ে এসেছি।'

থেমে গেল ওরা। রবিন, মুসা আর কিশোর হাসতে শুরু করল পাগলের মত। মনের পর্দায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওরা, গাড়িটা স্টার্ট না নেয়ায় রেগে গিয়ে কি করছে বিগ। পাশ দিয়ে যাবার সময় অবাক চোখে ওদের দিকে তাকাল পথিক, পরোয়াই করল না ওরা।

'চমৎকার, নরি, দারুণ দেখিয়েছ তুমি!' হাসতে হাসতে বলল কিশোর। অবশেষে হাসি থামল। বলল, 'আশা করি দেরি হয়ে যায়নি।'

হঠাৎ সকলের হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

কিশোর বলল, 'চলো, সাইকেল নিয়ে ওল্ড নেড খুঁজতে যাই।'

আঠারো

টাউন হলের সামনেই রয়েছে সাইকেলগুলো। তাড়াতাড়ি বন্দরে রওনা হল ওরা। বন্দরের এক কোণে ঘাটে বাঁধা রয়েছে বিশাল এক সমুদ্রগামী জাহাজ। কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে ওটাতে। ছেলেরা পৌঁছে দেখল, সারি দিয়ে লোক নেমে আসছে ওটা থেকে।

'শুঁটকি আর এজটারের খেয়াল রেখ,' সাবধান করে দিল কিশোর।

লোকের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ভিড় ঠেলে চওড়া টুরিস্ট গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের সামনে টিকেট বুদের দিকে এগোল ওরা। টেরিয়ার বা এজটারদের চেহারা চোখে পড়ল না।

টিকেট বুদের কাছে পথ আটকাল অ্যাটেনডেন্ট। 'সরি, আজকের মত বন্ধ হয়ে গেছে। আর ওঠা যাবে না।'

'কিন্তু আমাদের এখুনি ওঠা দরকার,' চেঁচিয়ে বলল নরি।

'কোন উপায় নেই, খোকা,' বলে ঘুরে দাঁড়াল অ্যাটেনডেন্ট। 'দেখতে চাইলে আবার আগামী হপ্তার শেষে।'

হতাশ চোখে অ্যাটেনডেন্টের চলে যাওয়া দেখছে ওরা। ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে, টুরিস্টদের শেষ দলটা তখন নেমে আসছে জাহাজ থেকে।

'পরের হপ্তা!' মাথা নাড়ল রবিন হতাশ ভঙ্গিতে। 'রোজ দেখানোর বন্দোবস্ত করে না কেন?'

'দর্শক হয় না হয়ত,' আন্দাজ করল কিশোর।

হঠাৎ হাত তুলে দেখাল মুসা, 'এই দেখ, জাহাজের ওপর!'

একেবারে ওপরের ডেকে দেখা যাচ্ছে একটা লম্বা মূর্তি। ঝিক করে উঠল দাঁত। নাকটা যেন সরাসরি ওদেরই দিকে ঠেলে দিল দূরের মূর্তিটা।

'শুঁটকি,' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

দ্রুত চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। ঘাটের ডানে চওড়া একটা গেট খোলা এখনও, মাল আনা নেয়ার কাজে ব্যবহার হয় ওটা। চট করে একবার অ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকাল সে, টুরিস্টদের শেষ দলটাকে প্রায় খেদিয়ে নিয়ে চলেছে গেটের দিকে।

'এই, কুইক,' সঙ্গীদের বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

চওড়া গেটটা দিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা, দৌড় দিল গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের দিকে। সবার আগে রয়েছে মুসা। ধাক্কা খেল গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক দিয়ে নেমে আসা লম্বা একজন মানুষের

সঙ্গে। 'আউফ' করে উঠল। পড়েই যাচ্ছিল, ধরে ফেললেন তাকে জাহাজের ক্যাপ্টেনের পোশাক পরা লোকটা।

'কি ব্যাপার, খোকা?' ভারি কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'তাড়াহুড়ো করে লাভ হবে না। প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেছে।'

'জানি, স্যার,' এগিয়ে গেল কিশোর, 'কিন্তু আমরা...'

'জানো? তাহলে চলে যাবার অনুরোধ করব আমি তোমাদেরকে।'

পেছনে তাকিয়ে কিশোর দেখল, কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে আছে কয়েকজন অ্যাটেনডেন্ট, সে তাকাতেই বেরিয়ে যাবার ইশারা করল একজন।

'ক্যাপ্টেন,' মরিয়া হয়ে বলল কিশোর, 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'দেখ,' হাসলেন লম্বা মানুষটা, 'আমি আসল ক্যাপ্টেন নই। একজিবিশন ম্যানেজার। তবে ক্যাপ্টেন ডাকতে পার, আপত্তি নেই। জাহাজ দেখতে আসা যে কারও সাথে আলাপ করতে দ্বিধা নেই আমার, কিন্তু এখন...'

'আমরা দর্শক নই,' চেঁচিয়ে উঠল নরি। 'আমরা স্যার গোয়েন্দা। এখন একটা কেসে কাজ করছি। কিশোর, কার্ড দেখিয়ে দাও।'

কার্ড বের করে দেখাল কিশোর। 'আমরা জেনেছি আপনার জাহাজে কিছু জিনিস লুকানো আছে।'

কার্ডটা পড়ে মুখ তুললেন ক্যাপ্টেন। 'লুকানো?'

'অনেক টাকার মূল্যবান পাথর, স্যার,' মুসা বলল। 'রত্ন।'

'রত্ন, না? এটাই তাহলে ব্যাখ্যা!'

অধৈর্য হয়ে এগিয়ে এল কয়েকজন অ্যাটেনডেন্ট। হাত নেড়ে তাদেরকে সরে যাবার ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন। ছেলেদের দিকে ফিরলেন আবার। 'জাহাজের কেবিনের অনেকগুলো বেড আজ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমরা ভেবেছি মজা করার জন্যে করেছে কেউ।'

'না, স্যার,' কিশোর বলল, 'মজা করার জন্যে নয়। রত্ন খুঁজেছে। বিছানার ভেতর কিংবা আশেপাশে লুকানো রয়েছে পাথরগুলো।' সংক্ষেপে জানাল ডেন কারমলের আজব উইলের কথা। 'ধাঁধাগুলোর সমাধান আমরা করে ফেলেছি। এখন সঠিক বিছানাটা শুধু পেলেই হল। দেরি হয়ে না গিয়ে থাকলেই হয়।'

'বোধহয় হয়ে গেছে। অনেকগুলো বিছানা সরানো হয়েছে। কিন্তু যদি পাথরগুলো এখনও পেয়ে না গিয়ে থাকে, তুমি কি করে পাবে? ঠিক বিছানাটা বের করবে কিভাবে? পাঁচশো বিছানা আছে জাহাজে।'

ঢোঁক গিলল কিশোর। দমে গেল অন্যেরা।

'পাঁ-পাঁচশো?' তোতলাল রবিন।

'কোন কোন কেবিনে দু'তিনটে করেও আছে। মোট পাঁচশো।'

'বিশেষ কোন বিছানা আছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'কোন রানী-টানীর জন্যে সংরক্ষিত?'

'না, ওরকম কিছু নেই।'

'কুইন-সাইজ বেড যেগুলোকে বলে সেরকম কিছু?' রবিন প্রশ্ন করল।

'না। ওরকম বিছানা জনপ্রিয় হওয়ার আগেই জাহাজটার সাগরে চলার দিন ফুরিয়ে গেছে।'

আস্তে মাথা দোলাল কিশোর। 'বিছানাটা পাবার নিশ্চয় কোন উপায় আছে। ক্যাপ্টেন, জাহাজটা কি অস্ট্রেলিয়ায় গেছে কখনও?'

'বহুবার। লণ্ডন-অস্ট্রেলিয়া-ক্যানাডা রুটে যাতায়াত করত নিয়মিত। কারমল ওতে করেই অস্ট্রেলিয়া গিয়েছে, ভাবছ নাকি?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'ওল্ড নেড বোধহয় কেউ একজন একলা ব্যবহার করত। পুরানো প্যাসেঞ্জারদের লিস্ট আছে।'

'আছে, তবে লণ্ডনে। এই ধাঁধা তোমাদেরকে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে না তো?'

'করতেও পারে,' গোঁ গোঁ করে বলল মুসা। 'কারমলের কথা কিছু বলা যায় না।'

'পাওয়ার উপায় একটা নিশ্চয় আছে,' কিশোর বলল। 'ইস, হাতে যদি খালি সময় থাকত! তবে আমার বিশ্বাস এখনও খুঁজে পায়নি কেউ। তাহলে শুঁটকি জাহাজে থাকত না। তবে সে বা অন্য কেউ পেয়ে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে।'

'শুঁটকি?' ভুরু কোঁচকালেন ক্যাপ্টেন। 'তারমানে জাহাজে রয়েছে এখনও একজন? বেশ, দেখছি।'

গ্যাংওয়ে ধরে এগোলেন ক্যাপ্টেন। ছেলেরা চলল তার সঙ্গে সঙ্গে। কিশোর কি যেন ভাবছে। হঠাৎ বলে উঠল, 'মনে হয় বুঝতে পেরেছি...,' কথা শেষ হল না তার। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে একটা লাইফবোটের দিকে। 'সাবধান!'

অনেক ওপরে জাহাজের একটা লাইফবোট খসে গেছে ওটার ব্র্যাকেট থেকে, দোল খেয়ে নেমে এসে বাড়ি মারল জাহাজের গায়ে, হুড়মুড় করে ঝরে পড়ল কতগুলো দাঁড়, পিপে, বাক্স আর আরও কিছু ভারি মালপত্র। ছুটে এল ক্যাপ্টেন আর ছেলেদেরকে লক্ষ্য করে।

'সর!' বলেই ধাক্কা দিয়ে মুসাকে সরিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। খপ করে নরির হাত চেপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে সরে গেলেন একপাশে।

গ্যাংওয়ের নিচে ডাইভ দিয়ে পড়ল রবিন। কিশোরও অনেক দূরে সরে

গেছে। নরিকে ফেলে দিয়ে তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে তাকে গা দিয়ে আড়াল করলেন ক্যাপ্টেন।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ নড়ল না। তারপর, আবার একে একে উঠে দাঁড়াতে লাগল সবাই। অ্যাটেনডেন্টরা দৌড়ে এল। দোল খাচ্ছে এখনও লাইফবোটটা, সেদিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের চেহারা। অ্যাটেডেন্টদের আদেশ দিলেন, 'জলদি গিয়ে জায়গামত আটকাও ওটাকে।' ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন, 'সরে থাকবে। ব্যাপারটা দুর্ঘটনা না-ও হতে পারে। হবার কথা নয়। খুব ভাল মত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় ওটা, নিয়মিত চেক করা হয়।'

'শুঁটকির কাজ!' জ্বলে উঠল রবিন।

'আমার মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'মারা যেতে পারতাম আমরা। তারমানে খুন। শুঁটকি এতটা এগোবে বিশ্বাস হয় না।'

'চল না তাহলে গিয়ে দেখি কে!' বলেই গ্যাংওয়ে ধরে উঠতে শুরু করল নরি।

'থাম!' হাঁক দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন। 'সরি, বয়েজ, জাহাজে এখন আর উঠতে দিতে পারি না তোমাদেরকে। সাঙঘাতিক বিপজ্জনক। কাজটা এখন পুলিশের এক্তিয়ারে চলে গেল।'

'হ্যাঁ, স্যার,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করুন। রবিন, তাঁকে বুঝিয়ে বলবে কি হয়েছে। মুসা, তুমি এখানেই থাক নরিকে নিয়ে, পুলিশ না আসা পর্যন্ত।'

গোয়েন্দাপ্রধানের মতলব বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকিয়ে রইল রবিন আর মুসা।

'তুমি কি করবে, কিশোর?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'আমি ওল্ড নেডকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি। আশা করি পারব। এক ঘন্টার মধ্যে যদি না ফিরি চীফকে বলবে জাহাজে খোঁজা শুরু করতে।'

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দৌড় দিল কিশোর। ছুটে বেরিয়ে গেল গেটের বাইরে, সাইকেলে চেপে চলে গেল।

উনিশ

এক ঘন্টা পরে। ঘাটে ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে রবিন, মুসা, নরি, সঙ্গে চীফ ইয়ান ফ্লেচার আর ক্যাপ্টেন। পাশে অন্ধকারে মাথা তুলে রেখেছে বিশাল জাহাজটা। ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'আটটা প্রায় বাজে, চীফ,' বললেন তিনি। 'এক ঘন্টা হয়ে গেল। আমার মনে হয় আর অপেক্ষা করা ঠিক না।

জাহাজে ইতিমধ্যে কি ক্ষতি হয়ে গেছে কে জানে।'

'সঠিক বিছানাটা যদি পেয়ে যেত,' চীফ বললেন, 'তাহলে ঝামেলা আর সময় দুটোই বাঁচত। কিশোরের ওপর ভরসা রাখা যায়। দেখি, আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে।'

'সে আসবেই,' রবিন আর মুসা একসঙ্গে বলল।

হাসলেন চীফ। 'আমিও জানি, সে আসবে।'

'ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠল নরি। 'বোধহয় এল!'

পায়ের শব্দ ছুটে আসছে। কিশোরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে দৌড় দিল রবিন আর মুসা। কয়েক কদম এগিয়েই থেমে গেল। কিশোর নয়, রস উড, গেট পেরিয়ে এগিয়ে এল দলটার কাছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'আছ এখানেই,' নরির দিকে তাকিয়ে বলল উকিল। 'তোমার মা বলল, টাউন হলে গেছ। ওখানে গিয়ে তোমাদের না দেখে তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। পুলিশকে ফোন করলাম। থানা থেকে জানাল, চীফ ফ্লেচার এখানে আছেন।'

'শেষ প্রশ্নটার জবাব খুঁজছি আমরা এখন, মিস্টার উড,' রবিন বলল। 'কিন্তু কে জানি জাহাজে উঠে বসে আছে। পাথরগুলো পেয়েই গেল কিনা!'

'দেরি করছি কেন তাহলে?' উডের তর সইছে না।

'কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করছি,' মুসা বলল। 'সঠিক ঘরটা খুঁজে বের করার বুদ্ধি করেছে। দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না।'

'যদি ভাগ হয়ে খুঁজতে থাকি আমরা,' উড বলল, 'আমি শিওর, তাহলে...'

'তাতে অনেক সময় দরকার,' বলে উঠল একটা কণ্ঠ। 'আর ভাগ্য খুব ভাল হওয়া চাই।'

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল নরি।

গেট পেরিয়ে এল কিশোর। তাকাল উকিলের দিকে। 'আপনি এখানে কিভাবে এলেন, স্যার?'

'তোমাদের খুঁজতে খুঁজতে। যাকগে, এখন ওসব কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কোন ঘরটা, বুঝেছ?'

খুশিমনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কারমল কুইনে করে পাড়ি জমিয়েছিল কিনা, বোঝার খুব সহজ একটা উপায় আছে। কোন কেবিনে করে গিয়েছিল, সেটাও জানা যাবে তার সঙ্গে যে গিয়েছিল তাকে জিজ্ঞেস করলে। মাত্র দু'জনের যে-কোন একজন হতে পারে, ড্যাম সান, আর ডোরা কেমপার।'

'জানে?' রবিনের প্রশ্ন।

'মিসেস কেমপার জানে। কারমলের সঙ্গে একই জাহাজে অস্ট্রেলিয়ায়

গিয়েছিল তিরিশ বছর আগে। তাকে সাক্ষী বানিয়েছেই কারমল, গুপ্তধন শিকারিদের কাছে তাকে পরিচিত করার জন্যে, যাতে মহিলার সাহায্য নেয়া যায়। যাই হোক,' হাসল সে, 'জবাবটা আমি পেয়েছি।'

'চলো তাহলে জাহাজে,' ক্যাপ্টেন বললেন।

পথ দেখিয়ে মেইন ডেক, অর্থাৎ এ-ডেকে সবাইকে নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। বিশাল জাহাজটায় মাত্র অল্প কয়েকটা আলো জ্বলছে। আবছা হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেছে ম্লান আলোকিত প্যাসেজগুলো। এ-ডেকের ওপরের টপডেকগুলো অন্ধকারে দেখা যায় না। গ্যাংওয়ে আর অন্যান্য প্রধান প্রবেশপথগুলোতে পুলিশ পাহারা রেখেছেন চীফ। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী-সমাবেশের জায়গাটা মস্ত, বিলাসবহুল। একটা টেবিলে রাখা টুরিস্ট ব্রশিউয়ারের স্তূপ থেকে একটা পুস্তিকা তুলে নিল কিশোর। ওটাতে ছাপা ডেকের নকশা মন দিয়ে দেখতে লাগল।

'কোন্ ঘরটা, কিশোর?' চীফ জিজ্ঞেস করলেন।

'এই যে, বাইশ নাম্বার কেবিন, ডি ডেকে। মিসেস কেমপার উঠেছিল পাশের কেবিনটায়, একুশ নাম্বার। শিওর কিনা আমি সন্দেহ প্রকাশ করায় হেসে উঠল। বলল, ওগুলোর কথা জীবনে ভুলবে না, কারণ ওগুলো জাহাজের সব চেয়ে জঘন্যতম কেবিন। "হতচ্ছাড়া গলুইয়ের ঠিক নিচে," বলেছে মহিলা। তার ধারণা, নিচের দিকে ব্যাংকে ঘুমাত কারমল। তবে আমার মনে হয় না ওই বিছানায় পাথরগুলো আছে।' নকশাটা পকেটে ভরে ধাঁধার নকলটা বের করল সে। 'শেষ ধাঁধাটা বলছে, ইন দ্য পশ কুইন'স ওল্ড নেড, বি ব্রাইট; অ্যাণ্ড নেচারাল অ্যাণ্ড প্রাইজ ইজ ইওরস। বিছানা প্রসঙ্গে যখন নেচারাল বলছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিছানায় শোবার কথা বলা হয়েছে। আর ব্রাইট বলে একটা শব্দ দিয়েই দুটো মানে বুঝিয়েছে। তারমানে মাথা খাটাও এবং উজ্জ্বল কিছু খোঁজ কর।'

'কিশোরভাই,' চেঁচিয়ে উঠল নরি, 'কি সেটা?'

'বিছানায় শুলে হয়ত লাইট-টাইট কিছু চোখে পড়বে।'

'চলো,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। এলিভেটর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েও থেমে গেল মুসা। একপাশে মাথা কাত করে কি যেন শুনল। 'কিশের শব্দ যেন শুনলাম।'

কান পাতল সবাই। আর শোনা গেল না।

'ডি ডেক সব চেয়ে নিচের ডেক,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'আলো খুব সামান্য। সাবধানে পা ফেলবে।'

নিচে নেমেই চলেছে ওরা। শেষ হওয়ার আর নাম নেই। প্রতিটি ডেক পর

পর সিঁড়ি আরও সরু হয়ে আসছে। অবশেষে ডি ডেকে নেমে মোড় নিল ওরা, টুরিস্ট ক্লাস কেবিন এরিয়ার দিকে। পানিরোধক একটা দরজা পেরিয়ে ঢুকল আরেক জায়গায়, ছোট ছোট কিছু কেবিন আছে ওখানে। এই সময় সামনে আবার শুনল শব্দ। চাপা, ভোঁতা, ঘষার আওয়াজ।

'এইবার ঠিক শুনেছি!' ঘোষণা করল মুসা। 'তবে এটা আগের শব্দটার মত নয়।'

'ইঁদুর-টিদুর হবে,' চীফ বললেন। 'সব জাহাজেই থাকে।'

'সব জাহাজে থাকলেও আমাদের এটার কেবিনে নেই,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'তাছাড়া এত জোরে আওয়াজ করতে পারে না ইঁদুর।'

সাবধানে, ম্লান আলোকিত বারান্দা ধরে সামনে এগোল ওরা। শব্দটা এখন আরও স্পষ্ট। কাছেরই একটা ছোট কেবিন থেকে আসছে। বাথরুমের ভেতর থেকে।

'তোমরা সরে দাঁড়াও,' ছেলেদের বলে গিয়ে দরজা খুললেন চীফ।

'শুঁটকি!' একসাথে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা।

হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে ময়দার বস্তার মত ফেলে রাখা হয়েছে টেরিয়ারকে। কথা বলার চেষ্টায় গোঁ গোঁ করে উঠল। চোখ প্রায় উল্টে যাওয়ার জোগাড়। দু'জন পুলিশ গিয়ে তাকে বের করে বাঁধনমুক্ত করল।

দুর্বল ভঙ্গিতে প্রায় টলতে টলতে গিয়ে একটা বাংকে ধপ করে বসে পড়ল দুষ্ট ছেলেটা। 'কয়েক ঘন্টা ধরে আটকে আছি এখানে...সবে কেবিনটায় খুঁজতে শুরু করেছি, কে যেন পেছন থেকে এসে বাড়ি মারল মাথায়।'

'মিথ্যে কথা,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'এই তো ঘন্টাখানেক আগেই তোমাকে ওপরের ডেকে দেখেছি।'

'আমি নই। হয়ত আমার মত অন্য কাউকে দেখেছ,' বলল টেরি। এমন ভাবে কেঁপে উঠল যেন খুব শীত করছে। 'হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে আমাকে বাথরুমে ভরে রাখল। আমি তো ভেবেছি জিন্দেগীতে আর বেরোতে পারব না!'

'উচিত শিক্ষা হয়েছে তোমার,' মুসা বলল। 'শুঁটকিগিরি করার শাস্তি।'

'একজন, নাকি দু'জন এসেছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়ল টেরি। 'জানি না। দেখিইনি কাউকে। বাড়ি মেরে আরেকটু হলেই মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল,' গোলআলুর মত ফুলে থাকা জায়গাটায় আঙুল ছোঁয়ালো সে।

হঠাৎ, জাহাজের সামনের দিকে কোথাও জোরে শব্দ হল, ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল বোধহয় আয়না বা কাঁচের কিছু।

ভুরু কুঁচকে ফেললেন ক্যাপ্টেন। 'বাইশ নাম্বারের কাছে মনে হল!'

'জলদি চলুন,' চিৎকার করে বলল কিশোর।

টেরি নড়ল না। 'আমি আর যাচ্ছি না বাবা, বড় বাঁচা বেঁচেছি। গুপ্তধনের দরকার নেই আমার। তোমরা গিয়ে নাওগে।'

টেরির কাছে একজন লোক রেখে অন্যদেরকে নিয়ে দৌড় দিলেন চীফ। সরু বারান্দা ধরে ছুটল সবাই ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু। শেষ একটা মোড় ঘুরে ক্যাপ্টেন দেখালেন, 'ওই যে সামনে, বাইশ।'

'খাইছে! দেখ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

বাইশ নাম্বার কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে জেনি এজটার, পেছনে তার মোটা ভাই মাইক। দলটাকে দেখে ঘুরে উল্টোদিকে দিল দৌড়। মাইকের হাতে ছোট কালো একটা বাক্স, আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

'দাঁড়াও!' বললেন চীফ। 'পুলিশ!'

থামল তো না-ই, ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল ভাইবোন। আগে আগে রয়েছে রোগাটে বোন, পেছনে ছুটন্ত ভাইয়ের শরীরের মাংস হাস্যকর ভঙ্গিতে দুলছে। নাচতে নাচতে চলেছে যেন একটা জেলির পিণ্ড! দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। পেছনে তেড়ে গেল গোয়েন্দারা। বি-ডেকে টুরিস্ট লাউঞ্জের একটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল দু'জনে।

'বেরোনোর পথ বাঁ-দিকে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ক্যাপ্টেন। 'ওদেরকে সামনে থেকে ধরব!'

করিডর ধরে তাঁর সঙ্গে ছুটল মুসা। অন্যেরা দাঁড়িয়ে গেল আরেকটা দরজা আটকে, যাতে এদিক দিয়ে আবার বেরিয়ে আসতে না পারে ভাইবোন। মুসা আর ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেল দু'জনে। চোখের পলকে পথ বদল করল জেনি, দৌড় দিল রাইটিং রুমের দরজার দিকে। হাঁপিয়ে পড়েছে মোটা মাইক। বোনকে অনুসরণ করে তীক্ষ্ণ মোড় নিতে গিয়ে পা পিছলাল। প্রায় জাহাজ কাঁপিয়ে ধুড়ুম করে পড়ল আছাড় খেয়ে। শোল মাছের মত পিছলে গিয়ে বাড়ি খেল তিনটে টেবিল আর দেয়ালের সঙ্গে। হাত থেকে উড়ে চলে গেল কালো বাক্সটা। উঠে যে তুলবে সে-শক্তি নেই। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।

ভাইয়ের দুরবস্থা দেখে থেমে গেল জেনি। গাল দিয়ে উঠল, 'মোটকা গাধা কোথাকার!'

ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মাইক। তাকে উঠতে সাহায্য করলেন চীফ। জেনিকে ধরে রাখল একজন পুলিশ। কালো বাক্সটা তুলে নিল কিশোর।

'নিশ্চয় আড়িপেতে আমাদের কথা শুনেছে ওরা। তখনই কোনভাবে শব্দ করে ফেলেছিল, মুসা শুনেছে,' বলল সে। 'কেবিনের নাম্বার শুনেই আর দেরি করেনি, ছুটে চলে গেছে। বাক্সটা কোথায় পাওয়া গেছে, মিস এজটার? বাইশ নাম্বার

কেবিনে নিশ্চয়?'

কালো হয়ে গেছে জেনির মুখ। মাথা ঝাঁকাল। 'সিলিণ্ডে।'

'খোল বাক্সটা, কিশোর,' তর সইছে না রবিনের।

বাক্সটা খুলল কিশোর। সবাই তাকিয়ে রইল চকচকে পাথরগুলোর দিকে। তারপর সামনে ঝুঁকলেন চীফ। সবুজ একটা পাথর তুলে হাতে নিয়ে দেখলেন। 'এটা রত্ন নয়, কাঁচ!' একটার সঙ্গে আরেকটা ঘষা দিয়ে দেখে বললেন, 'সব কাঁচ এগুলো।'

ওগুলোর নিচে একটা খাম রয়েছে। সেটা থেকে বেরোল একটা চিঠি। তাতে লেখাঃ

সমস্ত আগ্রহী গুপ্তধন শিকারিদের বলছি,

তোমাদের বোঝা উচিত ছিল, একজন সুস্থ মানুষ তার টাকা খুব ভেবেচিন্তে খরচ করে। আমিও করেছি। একদল বোকা গাধা আমার গুপ্তধনের পেছনে কিভাবে পাগলের মত ছুটছে কল্পনা করে হাসি ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না আমি। বোকাদের জন্যেই রেখে গেলাম এই কাঁচের টুকরোগুলো, বোকামির পুরস্কার।

ডেন।

স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। 'মানে…এ-সবই…,' কথা আটকে যাচ্ছে নরির, 'ফাঁকিবাজি!'

মিনমিন করে বলল কিশোর, 'অথচ আমি শিওর ছিলাম…' কেউ তাকে বোকা গাধা বললে খুব খারাপ লাগে তার।

'আক্কেল হয়েছে,' মুসা বলল, 'করো আরও লোভ।'

'নিশ্চয় আরও আছে!' জেনির দিক ঘুরল উড। 'সিলিণ্ডে আর কি পেয়েছ।'

'আর?' রাগ করে বলল মাইক, 'অনেকগুলো মণিমুক্তো। বস্তা বস্তা পড়ে আছে, নিয়ে এসোগে।'

'নিশ্চয় কিছু আছে আরও,' উকিল বলল। 'গিয়ে দেখা দরকার।'

দল বেঁধে আবার নিচের ডেকে চলল সবাই। জেনি আর মাইকও চলল পুলিশ প্রহরায়। কেবিনে ঢুকতেই চোখে পড়ল ছাতের কালো ফোকর। পাশে ইলেকট্রিকের ছেঁড়া তার ঝুলছে। সেগুলো সাবধানে এড়িয়ে খোপের ভেতরে হাত দিল মুসা। হাত ঘুরিয়ে চারপাশে দেখল, মাথা নাড়তে গিয়েও থেমে গেল। দু'আঙুলে ধরে বের করে আনল একটা খাম।

তার হাত থেকে ছোঁ মেরে খামটা নিয়ে খুলল উড। চেঁচিয়ে বলল, 'এটাই আসল উইল! যেটাতে নরি আর এলসাকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেছে কারমল।' হেসে উঠল সে।

'অসম্ভব!' কিশোর বলল।
'কেন?' তীক্ষ্ণ হল উডের কণ্ঠ।
'আপনার অফিস থেকে যেটা চুরি গেছে, সেটা যদি এটা হয়, তাহলে এখানে লুকাল এনে কে?'
'হয়ত কারমলই। ও চেয়েছিল এটা যাতে কেউ নষ্ট করতে না পারে,' উকিল বলল। 'কারমল জানত, উইলটা নষ্ট করে তার সম্পত্তি হাত করার চেষ্টা করবে এজটাররা!' পরাজিত ভাইবোনের দিকে খুশি খুশি দৃষ্টিতে তাকাল সে।
'কিন্তু,' যুক্তি দেখাল কিশোর, 'উইলটা না পেলেও তো নরিই পাবে সব সম্পত্তি। এজটাররা নয়।'
'পাগল ছিল তো, ভাবনার ঠিকঠিকানা ছিল না। যা মনে হয়েছে করেছে,' শ্রাগ করল উড। 'যাই হোক, এটা পাওয়ায় ভাল হয়েছে। সম্পত্তি পেতে আর কোন ঝামেলা হবে না এলসা আর নরির।'
'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু এভাবে ফাঁকি দিল...'
'আমি বিশ্বাস করি না!' চেঁচিয়ে উঠল নরি। 'চিঠিটা নকল, দাদা লেখেনি! আমি বিশ্বাস করি না!'

বিশ

'শয়তান!' বিড়বিড় করল জেনি। 'আস্ত শয়তান! শয়তানের আবার রসিকতা!'
তার দিকে ফিরে কঠোর গলায় চীফ বললেন, 'আপনি আর আপনার ভাইয়ের জন্যে এটা শয়তানী হতে পারে, ম্যাডাম, তবে অনেকের জন্যে সত্যি রসিকতা। ক্যাপ্টেন, শো-এর সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এদের জাহাজে থাকার পারমিশন আছে? কিংবা জাহাজের ক্ষতি করার অধিকার?'
'নিশ্চয় না!' কড়া গলায় বললেন ক্যাপ্টেন। 'তার ছিঁড়েছে, আরও ক্ষতি করেছে।'
'তারমানে ওরা অপরাধী।'
জোরাল প্রতিবাদ জানাল মাইক, 'আপনি আমাদেরকে হয়রানি...'
'অপরাধ তো আরও আছে আপনাদের, মিস্টার এজটার,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'লাইফবোটটা খুলে দিয়ে আরেকটু হলেই প্রায় মেরে ফেলেছিলেন।'
গম্ভীর হয়ে বললেন চীফ, 'খুব খারাপ করেছে। মস্ত অপরাধ।'
'ইডিয়ট!' মাইকের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল জেনি, 'মানা করেছিলাম তখনই, শোনেনি। এখন দেখ কি বিপদে পড়েছি!'
'চুপ!' ধমক লাগাল মাইক। 'বোকা ছেলেটা বলল, আর ওমনি...'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না জেনি, চীফের দিকে চেয়ে বলল, 'সব ওর বুদ্ধিতে হয়েছে, বুঝেছেন। লাইফবোট, চুরি, যত যা ঘটেছে সব। সব ওর পাগলামি বুদ্ধিতে।'

হেসে ফেলল কিশোর। 'ভাইয়ের বিরুদ্ধেই শেষে? হাহ্ হাহ্। আর কি শয়তানি করেছেন? সকালে নরিকেও ভ্যানে আটকেছিলেন আপনারাই।'

'কীই!' পেঁচার তীক্ষ্ণ চিৎকার রেরোল জেনির কণ্ঠে। 'আমরা কক্ষনও...'

'নিয়ে যাও,' বিরক্ত হয়ে সহকারীদের আদেশ দিলেন চীফ।

দু'জন পুলিশ ধরল ভাইবোনকে। ঝাড়া দিয়ে হাত ছুটিয়ে নিয়ে বোনকে ঘুসি মারার চেষ্টা করল মাইক। কিন্তু ধরে রাখা হল তাকে।

'কাছে এসেই দেখ না খালি, কোলাব্যাঙ!' পেঁচার মতই বড় বড় নখ দেখাল জেনি। নাগালে পেলেই খামচি মারবে।

'চুপ, পেঁচি কোথাকার! ঘুসি মেরে একেবারে নাক ভোঁতা করে দেব!'

ভাইবোনের ঝগড়া দেখে হাসতে শুরু করল মুসা। ওদের সরিয়ে নিয়ে গেল পুলিশেরা। আরও কিছুক্ষণ প্যাসেজে শোনা গেল ওদের উত্তেজিত চিৎকার, ঝগড়া। মাথা নাড়তে নাড়তে মুচকি হাসলেন চীফ। বললেন, 'চলো, যাই।'

ক্যাপ্টেন আর চীফ আগে আগে বেরোলেন। পেছনে নরি আর উড। উইলটা উডের হাতে। মুসা আর রবিনও যাবার জন্যে পা বাড়াল, ইশারায় নিষেধ করল কিশোর।

অবাক হল দুই সহকারী। মুসা বলল, 'কি ব্যাপার?'

জবাব না দিয়ে ডেকের প্লেনটা আবার দেখতে লাগল কিশোর। সন্তুষ্ট হয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করল মুখ দিয়ে, তারপর বলল, 'আমার মনে হয় না এটা রসিকতা। এটা ওর শেষ চাতুরি।'

'কিন্তু আর কোন ধাঁধা নেই,' মুসা বলল। 'শেষটারও সমাধান করে ফেলেছি আমরা।'

'না। আরেকটা ধাঁধা রয়েছে। খুব চালাকি করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওটা।' নকলটা বের করল কিশোর। 'এমনভাবে লিখেছে, যেন এটা ধাঁধার অংশ নয়, একটা কথার কথাঃ হু'ড হ্যাভ থট দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাড সো মাচ মানি ইন হিম? রোল দ্য ডাইস অ্যাণ্ড দ্য সোয়াগ ইজ ইওরস!'

'এটা আর কি ধাঁধা হল?' রবিন বলল। 'মানে তো সহজ। কে ভাবতে পেরেছিল, বুড়ো লোকটার এত টাকা? পাশা গড়িয়ে দাও, লুটের মাল তোমার হয়ে যাবে।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন অন্য কথা ভাবছি। প্রথম বাক্যটা আর কোথায় আছে, বল তো? পরিচিত মনে হয় না?'

গালে আঙুল দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রবিন। তারপর বলল, 'নাটকে! সেকসপীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে ঠিক এরকম একটা কথা আছে, শুধু ওখানে মানির জায়গায় রয়েছে ব্লাড। বাক্যটা এরকমঃ হু উড হ্যাভ থট দ্য ওল্ড ম্যান টু হ্যাভ হ্যাড সো মাচ ব্লাড ইন হিম?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কাকতালীয় হতে পারে না। বুঝেশুনেই লিখেছে কারমল।'

'ম্যাকবেথ খুব পছন্দ করত বোধহয়,' মুসা বলল। 'কিন্তু একথাটাকে ধাঁধা মনে হচ্ছে কেন?'

'নইলে এরকম একটা অদ্ভুত বাক্য উইলে থাকত না। চিঠিতে লিখেছে বটে, কিন্তু ওর মত কৃপণের সব টাকা খরচ করার কথা নয়। তাছাড়া জুয়া খেলার কথা উল্লেখ করেছে।'

'জুয়া?' রবিন বলল। 'এর সঙ্গে ধাঁধার কি সম্পর্ক?'

'ওই যে বলেছে, পাশা গড়িয়ে দাও। রোল দ্য ডাইস কেন বলল?'

'আল্লাহ্ই জানে!' মুসা বলল।

'আমি বুঝতে পারছি। পাশা দিয়ে জুয়া খেলার সময় "নেচারাল" বলে খেলোয়াড়েরা। এর মানে কি?'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। 'সাত! তারমানে কারমল বলছে, সাত নাম্বার আরেকটা ধাঁধা রয়েছে!'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।'কোনটা? ওই অদ্ভুত বাক্যটা? হু'ড হ্যাভ...'

হাত নেড়ে তাকে চুপ করতে ইশারা করল কিশোর। কান পেতে কি যেন শুনল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'মনে হয় ওই বাক্যটাই। কিন্তু মানে বুঝতে পারছি না। আমার বুদ্ধিতে কুলাবে না। চলো অন্যদের গিয়ে সব খুলে বলি। দেখি কে কি বলে।'

'আমরা চেষ্টা করে দেখি না কেন?' মুসা বলল। 'এজটাররাও নেই, শুঁটকিও নেই, কেউ আর জ্বালাতে আসবে না।'

'না,' জোরে জোরে বলল কিশোর, 'আমরা পারব না। সাহায্য দরকার। এস।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে সিঁড়িব কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। চলে এল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সমাবেশ যেখানে হত সেখানটায়। ঢুকে গেল বিশাল জাহাজটার নীরব, অন্ধকার ডেকে।

'হয়েছে, থাম,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'যথেষ্ট দূরে চলে এসেছি।'

'কি হয়েছে, কিশোর?' বুঝতে পারছে না মুসা। 'আবোল-তাবোল কথা বলছ কেন?'

'করছিটা কি আমরা?' রবিনও অবাক হয়েছে।

'আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করব আমরা,' কিশোর বলল। 'তারপর যাব সেখানে, যেখানে রত্নগুলো রয়েছে।'

'কোথায়, জানো?' কিশোর বলছে দেখে রবিনও ফিসফিসিয়ে বলল। বুঝতে পারছে, গোয়েন্দাপ্রধানের মনে কোন মতলব আছে।

কিন্তু মুসা বুঝতে না পেরে জোরেই জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিল কিশোর, কিন্তু অন্ধকার ডেকে কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। বলল, 'ডেকের নকশায় দেখলাম, ছোট একটা লাউঞ্জ আছে কুইন জাহাজে, ওটার নাম ম্যাকবেথ রুম। রত্নগুলো ওখানেই আছে।'

'খাইছে! আমরা পারব না বলেছিলে কেন তাহলে?'

'বুঝতে পারবে একটু পরেই,' হাতঘড়ি দেখল কিশোর। 'হয়েছে। চলো এবার যাই। শব্দ করবে না। আমার পেছনে থাকবে, যা যা করতে বলব, করবে।'

বেড়ালের মত নিঃশব্দে আবার সমাবেশের জায়গাটায় বেরিয়ে এল গোয়েন্দাপ্রধান। কার্পেট বিছানো চওড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল বি-ডেকে। নীরবে অনুসরণ করছে দুই সহকারী। বি-ডেকে নেমে ম্লান আলোকিত বারান্দা ধরে হেঁটে চলল। একটা দরজার পাশের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। দরজার পাল্লার গায়ে গোল জানালা।

'ম্যাকবেথ রুমের একপাশের দরজা এটা,' বলল কিশোর। 'সারভিস ডোর।'

'কি করব এখন?' মুসা জানতে চাইল।

'অপেক্ষা। এবং নজরে রাখব।'

ওর কথা শেষ হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই টর্চ জ্বলে উঠল ঘরের ভেতর। একই জায়গায় থেকে আলোর রশ্মি ঘুরতে শুরু করল সারা ঘরে। আলোয় ফুটে উঠতে থাকল কতগুলো টেবিল, আর্মচেয়ার, মরচে পড়া একটা বার, দেয়ালে সাজানো প্রাচীন হেলমেট, বর্ম, বেদীতে বসানো স্কটিশ যোদ্ধাদের দাড়িওয়ালা আবক্ষ মূর্তি।

ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা শুরু করল টর্চধারী।

প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ছেলেরা। গাঢ় রঙের ককটেল লাউঞ্জের ওপর আলো পড়ল। টর্চ ধরে থাকা হাতটা ছাড়া টর্চধারীর শরীরের আর কোন অংশ চোখে পড়ছে না। শুধু কালো একটা মূর্তি দ্রুত সরে যাচ্ছে এখান থেকে ওখানে, প্রতিটি টেবিলের সামনে দাঁড়াচ্ছে, বারের নিচে, বর্ম আর হেলমেটগুলোর ভেতর খুঁজছে। টান দিয়ে দিয়ে খুলে নিচ্ছে দেয়ালের জিনিস, তুলে নিচ্ছে টেবিলে রাখা জিনিস, টর্চের কাছে এনে পরীক্ষা করছে, তারপর ছুঁড়ে ফেলছে।

আলো ঘুরতে শুরু করল মূর্তিগুলোর ওপর। চাপ দাড়িওয়ালা একটা ব্রোঞ্জের মূর্তির ওপর এসে থামল। ওটার মাথায় একটা রাজকীয় মুকুট। অস্ফুট শব্দ করে দ্রুত মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। তুলে নিল। হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ

করে সন্তুষ্ট হয়ে আবার শব্দ করল সে, আনন্দ ধ্বনি।

রবিনের কাঁধ খামচে ধরল কিশোরের আঙুল। আরেকটু জোরে দিলেই আঁউউ করে উঠত রবিন। ফিসফিসিয়ে গোয়েন্দাপ্রধান তার কানে কানে বলল, 'ভেতরটা বোধহয় ফোঁপড়া! মনে হয় পেয়েছে!'

একটা টেবিলে টর্চটা শুইয়ে রেখে আলোর সামনে ধরে মূর্তির ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দিল লোকটা। চামড়ার একটা বড় বটুয়া বের করল ভেতর থেকে। মূর্তিটা ছুঁড়ে ফেলে খুলল বটুয়াটা। হেসে উঠল একা একাই। বটুয়া হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাকবেথ রুমের মেইন ডোর দিয়ে।

'এস,' কিশোর বলল, 'পিছু নিতে হবে। শব্দ করবে না, খবরদার।'

বি-ডেকের প্যাসেজের একটা মোড়ে এসে থেমে মুখ বের করে উঁকি দিল ওরা। ম্লান আলোয় দেখল দ্রুত চলে যাচ্ছে লোকটা। মুহূর্তে ঢুকে গেল পাশের আরেকটা সরু প্যাসেজে। প্রায় দৌড়ে এসে ওই প্যাসেজের মাথায় দাঁড়িয়ে ছেলেরা দেখল, একটা কেবিনে ঢুকে যাচ্ছে সে।

কেবিনের বাথরুমে ঢুকতে দেখা গেল লোকটাকে। যখন আবার বেরিয়ে এল, তার হাতে বটুয়াটা নেই। রবিন আর মুসার কাঁধে টোকা দিয়ে ওদের দৃষ্টি তার দিকে ফেরাল কিশোর। চোখের ইশারায় পাশের আরেকটা কেবিন দেখাল।

কেবিনটাতে ঢুকে পড়ল ওরা। সময়মত ঢুকেছে। লোকটা বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে হেঁটে গিয়ে মূল প্যাসেজে উঠল। পিছু নিতে চাইল আবার মুসা, তাকে থামাল কিশোর। 'না, চলে যাক। ব্যাগটা খুঁজে বের করব, চলো।'

প্রথম কেবিনটায় ঢুকে বাথরুম খুলল কিশোর। পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে আলো ফেলল ভেতরে। দেয়ালের ওপর দিকে হাওয়া বেরোনোর পথ আছে, ভেন্টিলেটর, তাতে দেখা গেল বটুয়ার একটা কোণ বেরিয়ে আছে। চোখ চকচক করে উঠল কিশোরের, কিন্তু বটুয়াটা নিল না, বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিল আবার।

'নিশ্চয় পাথরগুলো আছে,' মুসা বলল। 'নেবে না?'

'চোরটার পিছু নেবে না?' বলল রবিন। 'চোরই তো বলা যায় তাকে, নাকি?'

'নিঃসন্দেহে,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে বেশিদূর যায়নি। আর ওটা ছোঁয়া আমাদের উচিত হবে না। চোরটা যে ওটা ধরেছিল প্রমাণ নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে।'

'ফাঁদ পেতেছিলে তুমি, তাই না, কিশোর?' বুঝে ফেলল রবিন। 'তুমি জানতে, ম্যাকবেথ রুম থেকে পাথরগুলো চুরি করবে কেউ। কিভাবে জানলে?'

'কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, নকল পাথরগুলোর সঙ্গে যে উইলটা পাওয়া গেছে ওটাও মেকি। কারমল কখনই ওটা ওখানে রাখেনি। তারমানে এজটারদের আগেই কেউ পাথরগুলো পেয়েছিল, আবার রেখে দিয়েছে ওখানে।'

'রেখে দিয়েছে?' অবাক হল মুসা। 'কেন?'

'যাতে আমরা সন্দেহ না করি। চোরটাকে আসল পাথরের সন্ধান করে দিই। তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, সব সময় আমাদের ওপর যে চোখ রেখেছে, বিগ আর হিউগের কাছে যে টাকা ধারে, ওই লোকেরই কাজ এটা। আমাদের ওপর তখনও চোখ রেখেছে। কাজেই ফাঁদ পাতলাম।

'সাত নাম্বার ধাঁধার কথা জোরে জোরে বললাম, যাতে সে শুনতে পায়। তারপর মানে না বোঝার ভান করলাম। ম্যাকবেথ রুমের কথা চোরটার অজানা থাকার কথা নয়। তাছাড়া নকশাতেও রয়েছে ওটা। একটা নকশা নিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলেই হল। বুঝেছি, আমরা জাহাজ থেকে নেমে গেছি বুঝলেই গিয়ে রত্নগুলো খুঁজে বের করবে সে।'

'এবং তা-ই করেছে!'

'হ্যাঁ,' হাসল কিশোর। 'এখন গিয়ে চীফকে পাথরগুলোর কথা জানানো দরকার। ব্যাগ, আর ব্যাগের ওপরের ছাপ…'

'সেই সুযোগ আর পাবে না তোমরা!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল তিনজনে। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে উকিল রস উড। হাতে উদ্যত পিস্তল।

একুশ

'ফিরে এসে কাজটা খুব খারাপ করে ফেলেছি, তাই না?' গম্ভীর হয়ে বলল উড।

'গোড়া থেকেই ওগুলো চুরির মতলব ছিল আপনার!' গরম হয়ে বলল রবিন।

এগিয়ে এল উড। রাগত হাসল। 'টাকা আমার ভীষণ দরকার, অথচ ওই বুড়ো ডাকাতটা তার খেপাটে উইল বানিয়ে আমাকে আটকে দিল। আমি এলসাকে বিয়ে করি, এটা তার মোটেও পছন্দ ছিল না। তার ভয় ছিল, এলসাকে বিয়ে করে আমি সব টাকা মেরে দেব।'

'আমাদেরকে ব্যবহার করেছেন আপনি,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'সে-জন্যেই বয়স্ক কোন গোয়েন্দা সংস্থাকে ভাড়া করার চেয়ে আমাদেরকে করা ভাল মনে করেছেন। ভেবেছেন, কম বয়েসীদের ফাঁকি দেয়া সহজ।'

'ভুলই ভেবেছি,' স্বীকার করল উড। 'অনেক বয়স্ক লোকের চেয়ে অনেক বেশি চালাক তোমরা।'

পিস্তল নাচাল সে। ভয় পেলেও সেটা উডকে বুঝতে দিল না ছেলেরা। দাঁড়িয়ে রইল যেখানে ছিল।

'কেউ চুরি করার আগেই কেন ওগুলো হাতিয়ে নিলেন, বুঝতে পারছি,' রবিন

বলল। 'কিন্তু আপনি চুরি করতে গেলেন কেন? মিস কারমলকে বিয়ে করলে এমনিতেই তো মালিক হয়ে যেতেন।'

'একেবারে নিশ্চিত হয়ে নিলেন, না?' যোগ করল কিশোর। 'দলিলের একটা নকল কপিও রেখে দিয়েছেন কাঁচের টুকরোগুলোর সঙ্গে।'

'চালাক ছেলে!' উড বলল। 'পাথরগুলোর মালিক হয়ত হতে পারতাম এলসাকে বিয়ে করে, তবে আংশিক। আর আংশিক জিনিসে আমার চলবে না। তাছাড়া বিক্রি করতে গেলে তার নানারকম প্রশ্নের জবাব দিতে হত। কে যায় অত ঝামেলা করতে।'

'জিনিসগুলো কেন আপনার দরকার জানি আমরা,' মুসা বলল।

'কারণ জুয়া খেলে হেরেছেন, টাকা পায় আপনার কাছে হিউগ আর বিগ,' তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন। 'টাকার জন্যে চাপ দিচ্ছে এখন।'

'আর এলসা যদি শোনেন আপনি জুয়াড়ী, অনেক টাকা ধার রয়েছে আপনার,' কিশোর বলল, 'আপনার ওপরে খারাপ ধারণা হয়ে যাবে তাঁর।'

'ও, অনেক কিছু জানো তোমরা। বেশি জানো, কপাল খারাপ আরকি তোমাদের,' উড বলল। 'তবে বলেছ ঠিকই, ধারণা খারাপ হয়ে যাবে, বিশ্বাসও রাখতে পারবে না আর। বড় কথা হল, সবগুলোই যখন মেরে দিতে পারি, কোনরকম ঝামেলা ছাড়া, কেন ভাগাভাগি করতে যাব নরি আর এলসার সঙ্গে? কেউ কিছু জানবে না এখন। পাথরও হজম করব, এলসাকে বিয়ে করে আরামে ভোগ করব কারমলের সয়সম্পত্তি।'

ছেলেদের দিকে পিস্তল উদ্যত রেখেই জোরে জোরে হাসল উড। তার কাঁধের ওপর দিয়ে কেবিনের দরজার দিকে তাকাল কিশোর। বলল, 'না, তা পারছেন না। মিস কারমল যখনই জানবেন, তাঁকে ঠকাতে চেয়েছেন আপনি, কখনই আর বিয়ে করবেন না আপনাকে।'

শয়তানি হাসি ফুটল উডের ঠোঁটে। 'কিন্তু জানতে তো পারছে না। রত্নগুলোর কথা জানো শুধু তোমরা তিনজন, তোমরা তো গিয়ে বলতে পারছ না।'

'আমরা হয়ত পারব না,' কিশোর বলল। 'কিন্তু তিনি জেনে যাবেনই। তাই না, নরি? জলদি গিয়ে চীফকে জানাও যা যা শুনেছ।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকেই হো হো করে হেসে উঠল উড। মাথা নাড়ল। 'পুরানো কৌশল, কিশোর ওতে পা দিচ্ছি না আমি।'

'নরি, জলদি কর!' মুসা তাগাদা দিল।

ভ্রূকুটি করল উড। 'চুপ! ঘুরছি না আমি।'

'আহ্, দাঁড়িয়ে আছ কেন?' আতঙ্ক জাগল কিশোরের কণ্ঠে। 'জলদি কর, ছেলে, দৌড়াও!'

কিশোরের কণ্ঠস্বর উডকে অবাক করল। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। তারপর কানে এল পেছনের শব্দ। ঘুরল অবশেষে। তবে দেরি করে ফেলেছে। প্যাসেজে ছুটতে শুরু করেছে ততক্ষণে নরি।

'যাক, পেরেছে!' খুশি হয়ে বলল মুসা।

প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে গাল দিয়ে উঠল উড। তারপর ধীরে ধীরে ফিরল আবার তিন গোয়েন্দার দিকে।

'লোভ আপনার সর্বনাশ করে দিয়েছে, মিস্টার উড,' কিশোর বলল। 'সবই খোয়ালেন। আমাদের মুখ বন্ধ করে দিলেও এখন আর লাভ হচ্ছে না আপনার।'

মাথা ঝাঁকাল উকিল। 'হ্যাঁ, খুব চালাকির সঙ্গে করেছ কাজটা। বোকা বানাতে চেয়েছিলে আমাকে, বানিয়েছ। এমন কাঁচা ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছ, আমি বুঝতেই পারিনি সত্যি সত্যি নরির সঙ্গে বলেছ। যাকগে, যা হবার হয়েছে, কি আর করা।'

'তারমানে এখন আর আমরা আপনার জন্যে বিপদের কারণ নই।'

'না। তবে এখন আমাকে সাহায্য করতে যাচ্ছ তোমরা। এ-ধরনের পরিস্থিতি ঘটলে কি করব, আগেই ভেবে রেখেছি আমি। মুসা, বাথরুম থেকে রত্নগুলো বের করে আন!' মুসার পেট বরাবর পিস্তল ধরল উড। 'কোন চালাকির চেষ্টা নয়। এখন আমি বেপরোয়া।'

ঢোক গিলল মুসা। যা করতে বলা হল করল। বাথরুম থেকে বটুয়াটা বের করে এনে উডের হাতে তুলে দিল।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল উড। 'পালিয়েই যেতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত। আর কিছু করার নেই। যাকগে, অসুবিধে নেই। মেকসিকো অনেক নিরাপদ জায়গা। আর এসব দামি জিনিস কেনার লোক অনেক আছে ওখানে।' পিস্তল নাড়ল সে। 'হাঁটো। আমার সামনে থাকবে।'

উডের নির্দেশ মত ম্লান আলোকিত প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল ছেলেরা। চীফ আর তাঁর লোকজনের গলা কানে আসছে, খানিক আগে যে কেবিনটায় ছিল ওরা সেদিক থেকে। কান পেতে শুনল উড। তারপর একটা সিঁড়ি দিয়ে ছেলেদেরকে নামিয়ে নিয়ে এল জাহাজের একেবারে পেটের ভেতর। জরুরী হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে ওপরে। ছেলেদের না পেয়ে নানারকম নির্দেশ দিতে আরম্ভ করেছেন ফ্লেচার।

একটা প্যাসেজকে আড়াআড়ি কেটে সি-ডেকে চলে গেছে আরেকটা প্যাসেজ। রবিন আর কিশোরকে ইশারা করল উড, 'তোমরা দু'জন ওদিকে। যাও!'

'কিন্তু...' প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাধা পেল রবিন। ধমকে উঠল উড, 'যা বলছি কর! মুসা যাচ্ছে আমার সাথে। বন্ধুকে জীবিত দেখতে চাইলে সোজা করিডর ধরে চলে যাও। পেছনে তাকাবে না।'

নির্দেশ মানতে বাধ্য হল রবিন আর কিশোর। প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌছার আগে ফিরে তাকানোর সাহস করল না।

মুসাকে নিয়ে চলে গেছে উড।

চেঁচাতে শুরু করল দুই কিশোর। প্যাসেজ ধরে ছুটল চীফ আর তাঁর দলের কাছে। অবশেষে তাদের ডাক শুনতে পেলেন চীফ। বি-ডেকের একটা খোলা জায়গায় মিলিত হল ওরা।

'উড কোথায়?' জানতে চাইলেন চীফ।

কি হয়েছে, দ্রুত তাঁকে জানাল কিশোর আর রবিন।

'একবার মেকসিকোতে চলে গেলে আর তাকে ধরা যাবে না,' চীফ বললেন। 'তবে জাহাজ থেকেই বেরোতে দিচ্ছি না। গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে পাহারা দিচ্ছে পুলিশ।'

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'জাহাজ থেকে নামার কি ওই একটাই পথ?'

'আমি তো তা-ই জানি।'

'চীফ!' হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। 'আরেকটা পথ আছে! পেছনে, মাল খালাস হত যেদিক দিয়ে।'

'খোলা নাকি?'

'থাকার তো কথা নয়। কিন্তু...'

'জলদি করুন, স্যার,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'ওদিকেই যাবে!'

দলটাকে নিয়ে সেদিকে ছুটলেন ক্যাপ্টেন। দেখা গেল, তালা ভেঙে দরজা খোলা হয়েছে। ওটা পেরোতেই চোখে পড়ল, মাল তোলা আর নামানোর সরু গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ধরে নেমে যাচ্ছে উড। মাথায় পিস্তল ধরে আগে আগে চলতে বাধ্য করছে মুসাকে।

শব্দ শুনে ফিরে তাকাল উকিল। ধমক দিয়ে বলল, 'খবরদার, কেউ এগোবে না!'

'উড!' চীফ বললেন। 'পালাতে পারবে না! অযথা...'

'ছেলেটাকে মারতে না চাইলে সরুন...'

শেষ হল না কথা। মুহূর্তের জন্যে অমনোযোগী হয়েছিল উড, সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল মুসা। ঝপ করে বসে পড়ে উডের হাঁটুর পেছনে জড়িয়ে ধরে মারল হ্যাঁচকা টান। চিত করে ফেলল তাকে গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে। হাত থেকে খসে পড়ল বটুয়া আর পিস্তল। ঢালু পথে স্থির থাকতে পারল না উড, হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গড়িয়ে পড়তে লাগল গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ধরে।

তাকে ধরে থামাতে গিয়ে মুসাও গড়াতে শুরু করল। তবে উকিলের পা ছাড়ল না। উডের আরেকটা পা রেলিঙের ফাঁকে ঢুকে আটকে গেল, মট করে শব্দ হল হাড় ভাঙার। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল উড, 'বাবারে গেছি! মরে গেছিরে

বাবা! আমার পা…'

হুড়মুড় করে নেমে এল কয়েকজন পুলিশ। দু'জনকে ধরে তুলল। মুসা হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। উকিল সোজা থাকতে পারছে না একপায়ে ভর দিয়ে, আরেকটা পা সোজাই করতে পারছে না। সত্যিই ভেঙেছে।

'যাক, ছেড়ে দিলেও এখন বেশ কিছুদিন আর চুরি করতে পারবে না,' চীফ বললেন। 'উচিত শিক্ষা হয়েছে।' কিশোরের দিকে ফিরে বললেন, 'ওভাবে ওকে ধরার চেষ্টা করা মোটেই উচিত হয়নি তোমার। ভাগ্যিস নরি গিয়েছিল, নইলে তো মরেছিলে। তোমার সন্দেহের কথা আমাকে বললেই পারতে।'

'প্রমাণ তো ছিল না, স্যার,' নিজের পক্ষে সাফাই গাইল কিশোর। 'একটা নকল দলিল রেখে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি তখনও। আমি সেটা সন্দেহ করেছি বটে, প্রমাণ করতে পারতাম না। ওকে ওভাবে ফাঁদে না ফেললে রত্নগুলো মারত, মিসেস কারমলকে বিয়ে করে তার সম্পত্তিরও বারোটা বাজাত।'

'প্রমাণ করার দরকার ছিল না,' চীফ বললেন। 'তোমার সন্দেহের কথা আমাকে বললেই হুঁশিয়ার হতে পারতাম। যাকগে, ভালয় ভালয় সব মিটে গেছে…'

'আরি, সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল নরি। 'পাথরগুলো পানিতে…'

'না, পড়েনি,' হাসল মুসা। হাত উঁচু করে বটুয়া দেখাল। খুলে উপুড় করে ধরল ডেকের ওপর। ঝরঝর করে ঝরে পড়ল লাল, হলুদ, নীল আর সবুজ রঙের কতগুলো পাথর, ছোটখাট একটা স্তূপ হয়ে গেল। জাহাজের ম্লান আলোয় ঝলমল করে উঠল, ছড়াতে লাগল ঠাণ্ডা রঙিন দ্যুতি।

বাইশ

কয়েক দিন পর। কেসের রিপোর্ট নিয়ে চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে হাজির হল তিন গোয়েন্দা। খাড়া-পিঠ ডেস্ক-চেয়ারে বসে সামনে পেছনে দোল খেতে খেতে মন দিয়ে ছেলেদের কথা শুনলেন তিনি।

'তাহলে গোড়া থেকেই কারমলের রত্নের পেছনে লেগে ছিল উড,' বললেন পরিচালক।

'হ্যাঁ, স্যার,' কিশোর বলল।

'বেঈমান!'

কারমল তাকে দেখতে পারত না, সন্দেহ করত,' মুসা বলল, 'এলসাকে বলেছিলও সেকথা। কিন্তু এলসা বুড়োর কথায় কান দেয়নি।'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন পরিচালক। 'মনের ব্যাপারে মানুষ অন্ধই হয়। তা সে-

জন্যেই বুঝি এই আজব উইল বানিয়েছিল কারমল, উডের হাত থেকে তার কষ্টে অর্জিত টাকা বাঁচানোর জন্যে?'

'সেটা একটা কারণ,' কিশোর বলল। 'কারমল ভেবেছিল, ধাঁধার ব্যবস্থা করলে, গুপ্তধন শিকারে জড়িত হয়ে পড়বে উড, বিয়েটা করতে দেরি হবে। হয়ত রত্ন খুঁজতে গিয়ে তার আসল রূপ এলসার কাছে ফাঁসও করে দিতে পারে। আর তা-ই করেছে উড। ড্যাম সানকে সব কথা বলেছে কারমল। উডের মত একটা বাজে লোকের সঙ্গে মিশছে বলে পুত্রবধূর ওপরও বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল সে। সান অন্তত তা-ই বলেছে।'

'উড বুঝতে পারেনি,' হেসে বলল মুসা। 'কি-রকম ধূর্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে সে। প্রথমে তার অফিস থেকে কারমলের আগের উইলটা হারাল, তারপর কারমলের মৃত্যুর পর পত্রিকায় বেরিয়ে গেল আজব উইলের খবর। স্তব্ধ করে দিয়েছিল বেচারা উকিলকে।'

'তারমানে কি উড প্রথম উইলটা নষ্ট করেনি?' পরিচালক জিজ্ঞেস করলেন।

'না। কারমল করেছে। উডের অফিস থেকে চুরি করেছিল ওটা,' জবাব দিল কিশোর।

'পরের উইলটা উডকে দিয়ে করালে, আর তার কাছে থাকলে শিওর ওটা নষ্ট করে ফেলত,' রবিন বলল, 'সে-কারণেই ওটা তার কাছে রাখেনি কারমল। তাকে জানায়ওনি কিছু। রেখেছিল ড্যাম সানের কাছে। অনুরোধ করে গিয়েছিল, তার মৃত্যুর পর যেন পত্রিকায় ছেপে দেয়।'

কিশোর বলল, 'ওই উইলের খবর শুনে তো মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা হল উডের। টাকার জন্যে মাথা তখন তার এমনিতেই গরম। তার ভয় ছিল, অন্য কেউ রত্নগুলো খুঁজে বের করে ফেলবে। সুতরাং আমাদের ভাড়া করল।'

'তার ধারণা ছিল,' রবিন বলল, 'রত্নগুলো পাওয়ার পর আমরা যদি গোলমাল করিই, সহজেই সরিয়ে দেবে আমাদেরকে।'

'তারমানে তোমাদের ভাড়া করেই ভুলটা করেছে,' মিটিমিটি হাসছেন পরিচালক।

'আসলে নিজেকেই পরাজিত করেছে সে,' কিশোর বলল। 'মরেছে তার লোভের জন্যে।'

'ওকে সন্দেহ করলে কেন?' পরিচালক জিজ্ঞেস করলেন।

লম্বা দম নিল কিশোর। 'প্রথম সন্দেহ হল হিউগ আর বিগের কথা শোনার পর। ওরা বলল, একজনের কাছে টাকা পায় ওরা, সেই লোকই ওদেরকে বলেছে আমাদের আটকাতে। রত্নগুলো চায় সেই জুয়াড়ী লোকটা। হিউগ আর বিগ আমাদের ওপর যেমন রাখত, মিসেস কারমলের বাড়ির ওপরও নজর রাখত।

বুঝলাম, জুয়াড়ীকে ওখানেই পাওয়া যাবে। আর ওখানে তখন পুরুষ লোক বলতে একমাত্র রস উড।

'কাজেই, জাহাজে ওঠার আগে থেকেই আমার সন্দেহ ছিল জুয়াড়ী লোকটা রস উড। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল, একেবারে শিওর হয়ে গেলাম যে সে-ই সেই লোক। কেবিনের সিলিঙে কাঁচের টুকরোর সঙ্গে পাওয়া গেল নকল উইল।'

'কিন্তু কি করে বুঝলে নকল? আর উডই যে ওই কাজ করেছে সেটা?'

'কারণ ডোরা কেমপার আমাকে বলেছে, আগের উইলটা কারমল নষ্ট করে ফেলেছে। দ্বিতীয় উইলটায় সাক্ষী দিতে ডাকার আগেই সেকথা সান আর ডোরা কেমপারকে বলেছিল কারমল। বলেছিল, চুরি করে এনে ওটা পুড়িয়ে ফেলেছে। জানিয়ে রেখেছিল এই কারণে, যদি প্রথম উইলটা আবার উদয় হয় কখনও, সেটা যে জাল ওরা যেন বলতে পারে কোর্টে। কারমলের সন্দেহ ছিল, একটা জাল দলিল তৈরি করবেই উড। তার সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

'আমি এসব কথা শুনে এসেছি আগেই। কাজেই জাল দলিলটা যখন সত্যি বেরোল, বুঝে ফেললাম কার কাজ। কেন রাখা হয়েছে তা-ও বুঝলাম।'

'বলে যাও,' পরিচালক বললেন।

'হ্যাঁ, খুলেই বল সব,' মুসা অনুরোধ করল। 'একবার শুনেছি, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি ঠিকমত। দেখা যাক এখন বুঝি কিনা।'

'বেশ,' কিশোর বলল, 'বলছি। কিন্তু এতে না বোঝার তো কিছু নেই। কারমলের মৃত্যুর পর কে লাভবান বেশি হবে এটা তো জানা কথা। জাল দলিলটা যদি না বেরোয়, তাহলে দাদার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে নরি, কারণ সে-ই একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার অমতে তাঁর জিনিস কেউ ছুঁতে পারবে না, এমনকি তার মায়েরও সে-অধিকার নেই।

'কাজেই জাল দলিলটা এল, নরি আর তার মায়ের নামে। নরি পাবে শুধু অর্ধেক, পুরোটা নয়। তার মা পাবে বাকি অর্ধেক। উড তাকে বিয়ে করলে সহজেই স্ত্রীর সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হয়ে যাবে, কারণ ক্যালিফোর্নিয়ার আইনে স্ত্রীর সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হয় স্বামী।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন পরিচালক।

'ছেলের জিনিস মা চুরি করবে না,' বলে গেল কিশোর, 'এটা শিওর। কাজেই সন্দেহ করার মত আর একজনই রইল, রস উড। আন্দাজ করলাম, সারাটা বিকেল জাহাজে পাথরগুলো খুঁজেছে সে। তার পেছনে কেউ লাগবে এ-ভয় ছিল না। হিউগ আর বিগকে বলে দিয়েছিল আমাদের আটকাতে। নরি ছোঁক ছোঁক করছিল বলে তাকে নিজের হাতে বন্দি করে ভরে রেখেছিল ভ্যানে, আমরা যে তাকে ছেড়ে দিয়েছি, জানত না। নকল পাথরগুলো পেল, তবে আমার মতই সে-ও কারমলের

চিঠি বিশ্বাস করেনি। বুঝতে পেরেছে, মিথ্যে কথা বলছে কারমল। জাল দলিলটা তখনই রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল যে, যদি রত্নগুলো না-ও পায়, এলসার সম্পত্তির ভাগীদার সে হবেই। তারপরে অবশ্যই হিউগকে বলত আমাদের ছেড়ে দিতে, এবং আমাদের মাধ্যমে রত্নগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করত। কিন্তু আমাদেরকে ছাড়া পেয়ে যেতে দেখে অন্য বুদ্ধি এল তার মাথায়।

'আমি যখন শিওর হয়ে গেলাম, তাকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতলাম। সেই কেবিনেই রয়ে গেলাম অন্যেরা বেরিয়ে যাওয়ার পরেও। ব্যাপারটা উডের চোখ এড়াল না। বাইরে বেরিয়ে আড়ি পাতল সে। আমিও তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সব কথা বললাম। তারপর কায়দা করে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম ম্যাকবেথ রুমে, একেবারে আমার ফাঁদের মধ্যে।'

'ফাঁদটা অবশ্য তোমাদেরকেও বিপদে ফেলে দিয়েছিল,' পরিচালক বললেন। 'মরেছিলে আরেকটু হলেই। যাক, ভালয় ভালয় সব শেষ হয়েছে।'

'হ্যাঁ, স্যার,' হাসল কিশোর।

'হিসেব করে অনেক কিছু বের করেছ, ঠিক, তবে কিছু কিছু ব্যাপারে আন্দাজেও ঢিল ছুঁড়েছ, তাই না? এই যেমন, মাইক এজটারকে বোট খুলে দেয়ার কথাটা বলা।'

'না,' জোর দিয়ে বলল কিশোর, 'সেটাও অনুমান নয়। বুঝলাম, লাইফবোট যে খুলে দিয়েছে সে চায় না আমরা জাহাজে উঠি। তারমানে সে জানে না বাইশ নাম্বার কেবিনের পাথরগুলো নকল। উড জানে, শুঁটকি বন্দি, ওই অকাজ করার মত একমাত্র বাকি থাকে এজটাররাই।'

এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। চোখে বিস্ময়, চাপা দেয়ার কোন চেষ্টা করলেন না। ধীরে ধীরে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল ঠোঁটে। বললেন, 'হ্যাঁ, এবার বল আসামীদের কথা। কার কি শাস্তি হয়েছে? উড তো জেলে যাবেই, তার কথা বাদ। বাকিদের?'

'হিউগ আর বিগ উধাও,' রবিন জানাল। 'পুলিশ খুঁজছে ওদের। ইচ্ছে করলে মাইক আর জেনিকে জরিমানা করতে পারতেন বিচারক, জেলও দিতে পারতেন। কিন্তু রত্ন না পেয়ে মানসিক শাস্তি অনেক হয়েছে ওদের। সেকথা বিবেচনা করে ওদেরকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিজ্ঞ বিচারক, তবে আমেরিকায় থাকতে পারবে না ওরা। সেই দিনই দেশের জাহাজের টিকেট কেটেছে ভাইবোন।'

'হ্যাঁ, রত্ন না পাওয়ার ব্যথা কোনদিন ভুলতে পারবে না ওরা, এটাই বড় শাস্তি,' পরিচালক বললেন। 'টেরিয়ারের কি খবর?'

'বাথরুমে আটকে থেকেই আক্কেল হয়ে গেছে ওর। আর বাড়াবাড়ি করছে না। ঝিম মেরে গেছে একেবারে।'

'দেখ কতদিন ভাল থাকে। যাকগে, চমৎকার কাজ দেখিয়েছ তোমরা। আমার কংগ্রাচুলেশন রইল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। তবে কাজ মোটেও ভাল দেখাইনি। গর্দভের মত কাজ করেছি,' কিশোর বলল।

'মানে?' ভুরু কোঁচকালেন পরিচালক।

'প্রথম পাঁচটা ধাঁধার একটারও সমাধান করার দরকার ছিল না। ছয় নাম্বারটা থেকে শুরু করলেই বের করে ফেলা যেত পাথরগুলো।'

'কি করে?' সোজা হয়ে বসলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

'কুইনের আগে পশ শব্দটা ব্যবহার করেছে কারমল। আমি জানতাম, এর মানে ফিটফাট। ধরে নিয়েছিলাম জাহাজের সব চেয়ে ভাল কেবিন, মানে ফার্স্ট ক্লাসের কথা বলছে। কাজেই ওটা নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'তারপর সেদিন ক্যাপ্টেনের কাছে শুনলাম, শব্দটার অন্য মানেও আছে! শব্দটা ইংরেজ নাবিকদের আবিষ্কার, জাহাজে করে যারা ভারতবর্ষে যেত আর আসত। ওদিকে যাওয়ার সময় সব চেয়ে আরাম হত জাহাজের পোর্ট সাইড অর্থাৎ বাঁ দিকের কেবিনগুলোয়, রোদ বাতাস কোনটাই তেমন বিরক্ত করত না। আবার ইংল্যাণ্ডে ফেরার পথে ভাল হত স্টারবোর্ড সাইড অর্থাৎ ডানপাশের গুলো। স্টীমশিপের যাত্রীদের মাঝে একটা কথা প্রচলিত ছিল তখনঃ যদি আরামে যেতে চাও, যাওয়ার সময় বামে, আর ফেরার সময় ডানে উঠবে। সংক্ষেপে ইংরেজিতে বলত— পোর্ট আউট, স্টারবোর্ড হোম। পরে আরও সংক্ষেপ করে ফেলা হল, চারটে শব্দের শুধু প্রথম চারটে অক্ষর এক করে, মানে পি.ও. এস. এইচ. দিয়ে হয়ে গেল পশ।'

কিশোর থামতে রবিন বলল, 'যেহেতু কুইন জাহাজটা লণ্ডন-অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে ইনডিয়া হয়ে যেত, পশের আরাম ওটাতেও ছিল। কারমল জানত সেটা। খুব শর্টকাট একটা সূত্র দিয়েছিলঃ পশ কুইন।'

'এবং গর্দভের মত আমি সেটা মিস করেছি,' মুখ কালো করে বলল কিশোর।

'তুমি একা নও। সবাই-ই করেছে,' পরিচালক বললেন।

'সান্ত্বনা দিচ্ছেন, স্যার।'

'মোটেই না। সবগুলো ধাঁধার সমাধান করতে গিয়ে অনেক বিপদ আর বাধার মুখোমুখি তোমরা হয়েছ, মেধা আর অসামান্য সাহসের জোরে সেগুলো প্রতিহত করেছ, তোমাদের দক্ষতা তাতে আরও বেশি প্রমাণিত হয়েছে। শুধু চমৎকার আর বলব না, বলব প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছ তোমরা, মাই বয়েজ।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হল তিন গোয়েন্দার মুখ।

—০—

গোলাপী মুক্তো

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি, ১৯৯১
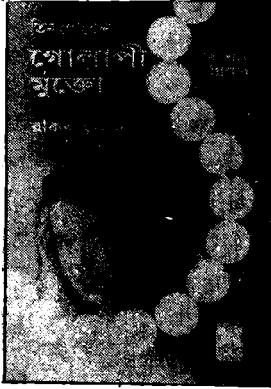
'এই জিনা,' মা বললেন, 'কি হয়েছে তোর? এরকম করছিস কেন? জিনিসপত্র গোছাতে দিবি না নাকি?'

'ভাল্লাগছে না কিছু!'

'কিছু একটা করার চেষ্টা কর গিয়ে, তাহলেই ভাল লাগবে।'

'কি করব? আকাশের যা অবস্থা, বাইরে বেরোতে পারলে তো। বৃষ্টি আর বৃষ্টি,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। 'ওই দেখ, আবার নেমেছে। জানালায় বসে যে সাগর দেখব, তারও উপায় নেই, কিচ্ছু দেখা যায় না। আমার দ্বীপটা পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। কি যে করব!'

'বৃষ্টির দিন, বৃষ্টি তো হবেই,' মা বললেন। 'অবাক করছিস তুই আমাকে, জিনা। ছুটির পয়লা দিনেই বিরক্ত হয়ে গেলি?'

'ছুটি' শব্দটা হাসি ফোটাল জিনার মুখে। আবার ছেলে সাজার শখ হয়েছে তার। মাঝে মাঝেই করে এরকম। নামটা পর্যন্ত পাল্টে ফেলে তখন। জরজিনা বা জিনার বদলে তখন তাকে জর্জ বলে ডাকলেই খুশি হয়। মনমেজাজের কোন ঠিকঠিকানা নেই তার। চুল ছেঁটে আবার ছেলেদের মত করে ফেলেছে। আশা করছে, আবার তাকে কিছুদিন ছেলে ভাবা হবে।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' ঘাড় নেড়ে বলল জিনা। 'ছুটির পয়লা দিনেই ওরকম বিরক্ত হওয়া উচিত না। কিন্তু হয়ে গেছি, কি করব? ভাগ্যিস বাবা আমাদেরকে নিয়ে যাবে বলেছে। এখানে থাকলে মরেই যেতাম!' মাঝেমাঝেই বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্যে বিদেশে যান মিস্টার পারকার। এবারেও যাচ্ছেন। সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন জিনা আর তিন গোয়েন্দাকে। 'মা, লণ্ডনেও কি এরকমই আবহাওয়া থাকবে?'

'কিছুই বলা যায় না। আরও খারাপ হতে পারে। তবে জায়গা বদল তো হবে, তাতেই আমি খুশি। কিছুদিনের জন্যে এখান থেকে ভাগা দরকার।' মেয়েকে আস্তে করে দরজার দিকে ঠেলে দিলেন মা। 'যা, আর কিছু করতে না পারলে রাফিকে নিয়ে খেলগে। আমি ততক্ষণে গোছগাছটা সেরে ফেলি।'

জিনা যেখানে যাবে, রাফিয়ানও সঙ্গে যাবে। জিনার ধারণা, দুনিয়ার সব চেয়ে ভাল এবং বুদ্ধিমান কুকুরটা তার। 'আয়, রাফি,' জিনা বলল, 'এখানে কিচ্ছু নেই। চল, রান্নাঘরে গিয়ে দেখি খাবার কিছু মেলে কিনা।'

রান্নাঘরে কাজ করছে আইলিন। অনেক সময় কাজ বেড়ে যায়, একা সামলাতে পারেন না মিসেস পারকার, তখন খবর দেন আইলিনকে। এই গাঁয়েরই মেয়ে, এসে কাজ করে দিয়ে যায়।

'এই যে জিনা,' আইলিন বলল। 'রাফিও যে। তা কি দরকারে এই আন্টির কাছে আগমন? খাবারের খোঁজে নিশ্চয়ই? একটু রাখ, হাতের কাজটা শেষ করে নিই। আপেলের জেলি বানাচ্ছি, তাড়াহুড়ো করলে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'চুলায় কি?' জিনা বলল। 'দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে।' টেবিলে বসে পড়ল সে। মিনিট কয়েক পরেই হাজির হয়ে গেল বেশ বড় এক মগ গরম গরম কোকো, আর এক প্লেট সদ্য বানানো বনরুটি। রাফিয়ানও বাদ গেল না, তাজা রসালো দেখে একটা হাড় দেয়া হয়েছে তাকে।

'ছুটিতে বাড়ি এলে খিদে খুব বেড়ে যায়, না?' হেসে বলল আইলিন। 'বাড়বেই। হোস্টেলে কি না কি খাও, খাওয়া হয় নাকি।'

'পেট ভরি আরকি কোনরকমে। হোস্টেলের বাবুর্চিও রাঁধে, আর তুমিও রাঁধো। আমার তো মনে হয় দুনিয়ার সেরা বাবুর্চি তুমি, লিনুআন্টি। কিশোররাও তোমার রান্নার খুব প্রশংসা করে।'

'কালই তো আসছে ওরা, না?' প্রশংসায় খুশি হল আইলিন। 'দেখি, ওদের জন্যে ভাল কিছু বানিয়ে রাখতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই কর। খাওয়ানোর সুযোগ অবশ্য এবারের ছুটিতে বেশি পাবে না।'

'না, তা পাব না। কাউকে তো আর রেখে যাচ্ছেন না মিস্টার পারকার।'

'দারুণ মজা হবে, তাই না?' বন চিবাতে চিবাতে বলল জিনা। 'কিশোররা এখনও জানে না। ওরা আসছে, ভেবেছে এখানেই ছুটি কাটিয়ে যাবে। লণ্ডনে যাচ্ছি, সেটা জানে না। জানাইনি। সারপ্রাইজ দেব। কালই আসছে। কিন্তু ভয় লাগছে, যা পচা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, যদি না আসে!'

পরদিন বৃষ্টি থামল। আবার ফিরে এল শীতের ঠাণ্ডা, শুকনো, পরিষ্কার আবহাওয়া, বড়দিনের সময় যেরকম থাকে। সকালের বাস ধরল তিন গোয়েন্দা। এগারোটা নাগাদ পৌঁছে গেল গোবেল বীচে। খুশিতে কলরব করতে করতে এসে জিনাদের বাড়িতে ঢুকল ওরা। বসার ঘরেই রয়েছেন মিসেস পারকার।

'কেমন আছেন, আন্টি?' হেসে বলল কিশোর।

'ভাল,' কেরিআন্টি বললেন। 'তোমরা কেমন?'

'ভাল,' জবাব দিল কিশোর।

ভুরু কুঁচকে জিনার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'এই জিনা, আবার ছেলে সেজেছ...'

'জিনা নয়, জর্জ বলবে,' গম্ভীর হয়ে বলল জিনা।

হা-হা করে হাসল মুসা। 'বুঝেছি। তা কদ্দিন চলবে এটা?'

'যদ্দিন জর্জের ইচ্ছে হয়,' রবিন বলল হেসে।

'হুফ! হুফ!' সায় জানাল রাফিয়ান। রবিনের হাত চেটে দিল।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল মিস্টার পারকারের স্টাডির দরজা। ভুরু কুঁচকে তাকালেন ছেলেমেয়েদের দিকে। 'ও, এসে গেছ। এজন্যেই এত হৈ-চৈ,' বলে আবার লাগিয়ে দিলেন দরজা। হট্টগোল একদম সহ্য করতে পারেন না তিনি।

'রাগলেন না তো!' মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'আঙ্কেল বদলে গেছেন মনে হচ্ছে? যাক, ছুটিটা তাহলে ভালই কাটবে। ধমক খেতে হবে না।'

'হ্যাঁ, ভালই কাটবে,' কিশোর বলল, 'কারণ এখানে থাকতে হচ্ছে না আমাদের। পত্রিকায় পড়লাম, লণ্ডনের কাছের আরেকটা শহরে স্পেস ট্র্যাভেলের ওপর একটা সম্মেলন হচ্ছে। আঙ্কেল নিশ্চয় দাওয়াত পেয়েছেন। জিনা যখন এত করে আমাদের আসতে বলেছে, ধরেই নেয়া যায়, কোন কারণ আছে। আর সেই কারণ একটাই হতে পারে, আমাদেরকেও সঙ্গে নেয়া হবে।'

'তুমি বুঝে ফেলেছ!' সারপ্রাইজ দিতে না পেরে হতাশ হল জিনা।

রবিন আর মুসা অবাক হল। রবিন বলল, 'কই, আমাদেরকে তো কিছু বলনি?'

হাসল শুধু কিশোর। জবাব দিল না।

'রাফি যাচ্ছে তো?' মুসা জানতে চাইল।

'নিশ্চয়ই,' বলল জিনা। 'বাবা ভাল করেই জানে, আমি ওকে ছাড়া কোথাও যাই না। চল, বাগানে, ঘরে দম আটকে আসছে। কপাল ভাল আমাদের, আজ বৃষ্টি নেই।'

'বলা যায় না,' রবিন বলল। 'আবার এসে যেতে পারে।'

'তা ওখানে গিয়ে কোথায় উঠছি, জিনা...থুড়ি জর্জ?' কিশোর জানতে চাইল। 'হোটেলে?'

দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জিনা। তারপর হাসল। 'থাক, জর্জ বলার দরকার নেই, তোমরা আমাকে জিনাই ডেকো।...না, হোটেলে উঠছি না আমরা। এখন ছুটির সময়, খরচ অতিরিক্ত। ঘর পাওয়াও কঠিন। তাছাড়া হোটেলে কুকুর জায়গা দেয়ার নিয়মও বোধহয় নেই। সম্মেলন

যেখানে হচ্ছে, সেই শহরে মা'র এক বোনের বাসা আছে। খালাম্মা-খালু ছুটিতে বাইরে চলে যাচ্ছেন, ফ্ল্যাটটা খালিই থাকবে। মা'কে বলেছেন, ওখানে থাকতে পারব আমরা।'

'চমৎকার। হোটেলের চেয়ে অনেক ভাল হবে। স্বাধীনতা থাকবে।'

সাগরের পাড়ে হাঁটতে বেরোল ওরা। চলল নানারকম আলোচনা। ছুটি কি করে কাটাবে সে-সম্পর্কে আলোচনাই বেশি হল। ফিরল দুপুরের খাবার সময়। মুরগীর রোস্ট করেছে আইলিন। আপেলের জেলি। মাংসের কিমা আর নানারকম শাকসবজীর পুর দেয়া স্যাণ্ডউইচ। সাগরের খোলা হাওয়া আর বৃষ্টিধোয়া রোদে ঘুরে খিদেও পেয়েছে ছেলেমেয়েদের। খাবারের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। মিনিট পনেরো মুসা তো মুখই তুলল না।

দুপুরের পরে আবার খারাপ হয়ে গেল আকাশ। মেঘে ঢাকা পড়ল সূর্য। নামল ঝমঝম বৃষ্টি। বাইরে বেরোনো বন্ধ। তবে আজ আর জিনার খারাপ লাগল না। তিন তিনজন বন্ধু এসেছে, ঘরের ভেতরেই সময় খুব ভাল কাটবে।

পরদিন সকালে রওনা হল ওরা। বাস ধরে এল এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে বিমানে লণ্ডন। তারপর ঘন্টা দুয়েকের রেলযাত্রা। স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে করে এল জিনার খালার ফ্ল্যাটে।

বেশ ব্যস্ত একটা সড়কের দিকে মুখ করে রয়েছে বাড়িটা। বড় ফ্ল্যাট। কয়েকটা ঘর। মাঝে চওড়া বারান্দা। বেডরুমগুলো সব পুবমুখো, অন্যান্য ঘরগুলো পশ্চিমে।

বাড়িটা পছন্দ হল ছেলেমেয়েদের। ঘরের আসবাবপত্রও ভাল। আয়-রোজগার বেশ ভালই মনে হয় জিনার খালু-খালাম্মার। অন্যের ঘরে রয়েছে, এটুকু বোঝার বুদ্ধি আছে রাফিয়ানের, কাজেই জিনিসপত্র যাতে নষ্ট নাহয় সেভাবে চলাফেরা করল। বাড়িতে হলে এতক্ষণে লাফালফি করতে গিয়ে অন্তত একটা ফুলদানী তো উল্টে ফেলতোই।

নিজেদের জিনিসপত্র খুলে গুছিয়ে ফেলল ছেলেমেয়েরা। তারপর গেল মিসেস পারকার কতখানি কি করেছেন দেখার জন্যে।

তিনিও গুছিয়ে ফেলেছেন। বললেন, 'এখন আমাদের প্রথম কাজ হল, খাবার কিনে আনা। একসাথে দু'কাজ হয়ে যাবে। খাবারও কেনা হবে, শহরও ঘোরা হবে। তোমাদের আঙ্কেল কাজ নিয়েই ব্যস্ত, তিনি যেতে পারবেন না। যেতে হবে আমাদেরকেই।'

তাতে খুশিই হল ছেলেমেয়েরা।

'শহরটা আমেরিকার শহরের চেয়ে অন্যরকম,' কিশোর বলল। 'বাস, লোকের

ভিড়। বেশি গাদাগাদি মনে হয়।'

সকলেই একমত হল তার সাথে।

দোকানে দোকনে ঘুরল ওরা। চলে এল কাছের বড় স্কোয়্যারটায়। বিশাল এক বাগান রয়েছে সেখানে, অনেকটা পার্কের মত, ছেলেমেয়েরা খেলছে। দিকে দিকে ছুটে যাচ্ছে বাস। এত বিভিন্ন পথে, মনে রাখতেই কষ্ট হয়, শেষ নোটবুকে লিখে নিতে লাগল রুটগুলো রবিন। খাবারের বাক্স, পৌটলা নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল ওরা। রান্নাঘরে জিনার মা'কে সাহায্য করল সবাই, মিস্টার পারকার বাদে, তিনি তাঁর কাজে ব্যস্ত। আধুনিক, সুন্দর রান্নাঘর। প্রয়োজনীয় সব জিনিস হাতের কাছে রয়েছে। কাজ করতে কোন অসুবিধে হল না।

রাতের বেলা খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে কথা বলার ফুরসত মিলল মিস্টার পারকারের। জানালেন, সম্মেলন যতদিন চলবে, রোজ খুব সকালে বেরিয়ে যাবেন তিনি, ফিরতে অনেক দেরি হবে। রাতও হয়ে যেতে পারে কোন কোনদিন।

'সেটা আমি জানি,' মিসেস পারকার বললেন। 'তোমার কাজ তুমি করে যাও, আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না। আমাদের দিক আমরা সামলাতে পারব। রান্না করতে তো আর বেশি সময় লাগবে না। তারপর বেরিয়ে পড়ব শহর ঘুরতে। দেখার অনেক জিনিস আছে। তাছাড়া, কাগজে দেখলাম এক জায়গায় অ্যানটিক নিলাম হচ্ছে। ওখানে যাব। কিছু পছন্দও হয়ে যেতে পারে, কেনার ইচ্ছে আছে।'

হাসল ছেলেমেয়েরা। ওরা জানে, পুরানো জিনিসের প্রতি খুব শখ মিসেস পারকারের, বিশেষ করে অ্যানটিক। বেছে বেছে দেখার মত জিনিস জোগাড় করে নিয়ে আসেন। নিলামের ব্যাপারে মায়ের যেমন আগ্রহ, মেয়ের তেমনি নিরাসক্তি। সে ভাবল--মা যাক নিলামে, আমরা চলে যাব অন্য কোথাও ঘুরতে। অনেক জায়গা আছে দেখার, যেগুলো সে দেখেনি। পরদিন সকালেই মা'কে সেটা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে, ঠিক করল।

সুতরাং পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে মা'কে বলল জিনা, 'আমাদেরকে নিশ্চয় একা একা ঘুরতে দেবে, তাই না, মা?'

'দেবো, রাস্তাঘাট চেনা হয়ে যাবার পর,' মেয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে হাসলেন মা। 'তবে কথা দিতে হবে, খুব সাবধানে থাকবি।'

'থাকব,' বলতে একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না জিনা।

'আর গোলমাল বাধাবি না। ঝগড়া করবি না কারও সঙ্গে।'

'করব না।'

হেসে ফেলল মুসা।

'এই এতে হাসির কি দেখলে!' রেগে গেল জিনা। 'হাসির কি দেখলে? খারাপ

কিছু বললাম নাকি?'

'এই তো শুরু করে দিলি,' হেসে বললেন মা। 'এইমাত্র না বললি ঝগড়া করবি না?'

'অ!' লজ্জা পেল জিনা। 'ও এরকম করে হাসল না···আচ্ছা, আর করব না। তাহলে তো যেতে দিতে আপত্তি নেই, মা?'

'না, নেই।'

দুই

ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে বেরোলেন মিসেস পারকার। ঘুরে ঘুরে শহর দেখলেন, কেনাকাটা করলেন বড়দিনের জন্যে, উপহার কিনলেন।

পরের দিনও একইভাবে কাটল।

তার পরের দিন সকালে উঠে জিনার মা বললেন, 'রাস্তার মোড়ে একটা সিনেমা হল আছে না? তাতে ডিজনির একটা ছবি চলছে। বিকেলে যাবি নাকি দেখতে? আমি অবশ্য যেতে পারব না। কাল নিলাম হবে, আজই গিয়ে জিনিসগুলো দেখে আসতে হবে। পছন্দ করে রেখে আসব। চাইলে যেতে পারিস আমার সঙ্গে।'

মায়ের সঙ্গেই যেতে চাইল জিনা। সিনেমা পছন্দ করে না সে তা নয়। কিন্তু হলে রাফিয়ানকে ঢুকতে দেয়া হবে না, আর ওকে ফেলে যেতে রাজি নয় সে। তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি তোমার সাথে যাব। নিলাম ডাকাই দেখব।'

কিশোর বলল। 'আমিও।'

'আমিও যাব,' রবিন বলল।

মুসার সিনেমা দেখতে যাবারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সবাই যাচ্ছে অন্যখানে, সে একা যায় কি করে?

'বেশ,' মা বললেন, 'যাবে। কাগজে পড়লাম, এক বৃদ্ধা মহিলার মাল নিলাম হবে। মারা গেছেন। তাঁর নাম ছিল মিস আরনিকা মেয়ারবাল। আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। অনেক ভাল ভাল জিনিস আছে শুনেছি। সেল-রুমে দেখানোর জন্যে আজ ওগুলো রাখা হবে। আগ্রহী যে-কেউ গিয়ে দেখতে পারে।'

সেদিন বিকেলে ট্যাক্সিতে করে রওনা হল ওরা। শহরের একপ্রান্তে বাড়িটা। দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে ৮ নাম্বার কামরায়। ইতিমধ্যেই ভিড় হয়ে গেছে। পুরানো আসবাবপত্র আর অন্যান্য জিনিস দেখছে। ছোটখাট কিছু জিনিস রয়েছে কাঁচের বাক্সে, নিশ্চয় খুব দামি ওগুলো। প্রহরী রয়েছে, যারা আসছে যাচ্ছে নজর রাখছে

তাদের ওপর।

দরজার পাশে রাখা হয়েছে বাক্সগুলো। সুন্দর সুন্দর চীনা অলঙ্কার, ব্রোঞ্জের ছোট মূর্তি, হাতির দাঁতে খোদাই করা নানারকম চমৎকার জিনিস। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওগুলো দেখলেন মিসেস পারকার, ছেলেমেয়েরাও দেখল। কারোরই বুঝতে অসুবিধে হল না জিনিসগুলো অনেক দামি। তারপর ওরা চলল আসবাব দেখতে। বড়গুলোর দিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন মিসেস পারকার। তারপর ছোট একটা আর্মচেয়ারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'এই আদলের চেয়ারগুলোকে বলে টাব চেয়ার,' বললেন তিনি। 'সুন্দর, না?'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল, 'সুন্দর।'

'বসতেও বোধহয় খুব আরাম,' মুসা বলল। তার কথায় হেসে উঠল সবাই।

খুব ভদ্র হয়ে রইল রাফিয়ান। ঢোকার সময় প্রহরীরা তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেও পরে নিশ্চয় তাদের মত পরিবর্তন করেছে। মুসার কথায় যেন একমত হয়েই চেয়ারটার দিকে তাকাল সে, যেন বলতে চাইছে, 'হ্যাঁ, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমাতে বেশ আরাম লাগবে।'

'ওটা নেবে নাকি তুমি, মা?' জিনা জিজ্ঞেস করল।

'বাড়িতে সিটিং রুমে রাখলে ভালই হবে, কি বলিস?' মা বললেন।

'হ্যাঁ, তা লাগবে,' জবাবটা দিল কিশোর।

'দেখি, দামে বনলে নিয়ে নেব কাল,' মা বললেন।

চেয়ারটাকে কাছে থেকে আরও ভালমত দেখার ইচ্ছে মিসেস পারকারের, কিন্তু একটা লোকের জন্যে পারছেন না। ঢোকার পর থেকেই সেই যে ওটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই, ঘুরেফিরে চারপাশ থেকে দেখছে। সরার নামও নেই। চেয়ারটার সামনের দিকে এসে ঘাড় কাত করে দেখতে লাগল। মখমলে মোড়া গদি, রঙ চটে গেছে। এছাড়া আর সব ভালই আছে জিনিসটার। চেয়ারের পিঠে হাত বুলিয়ে দেখল সে, হাতল দেখল, পায়া দেখল। তারপর যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরে গেল ওখান থেকে।

এইবার মিসেস পারকারের দেখার পালা।

'লোকটাকে সুবিধের লাগল না,' নিচু গলায় বলল জিনা, 'তাই না? আমি শিওর, কাল নিলামে সে-ও আসবে। চেয়ারটা নিতে চাইবে।'

জিনার অনুমান ঠিকই হল। পরদিন লংফীল্ডের সেল-রুমে পৌঁছে ওরা দেখল, লোকটা আগেই চলে এসেছে। ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল তাকে।

'ওই যে,' ফিসফিসিয়ে জিনা বলল। 'টাব চেয়ারের আরেক ক্রেতা।'

'বেড়টা বেশ সাইজমত,' হেসে বলল মুসা, 'চেয়ারটা ওরই নেয়া উচিত। বসলে মানাবে ভাল। মুখটা দেখছ? আস্ত এক কোলাব্যাঙ।'

হাসি চাপল কিশোর। কিন্তু রবিন ফিক করে হেসে ফেলল। ঠিকই বলেছে মুসা। ব্যাঙই। ব্যাঙের মত চওড়া পাতলা ঠোঁট, গোল গোল চোখ যেন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে কোটর থেকে।

ডাক শুরু হল। চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেল কয়েকটা আসবাব। তারপর দু'জন লোক চেয়ারটা ধরাধরি করে এনে রাখল মঞ্চে, যাতে সবাই দেখতে পায়। ডাক শুরুর অনুরোধ জানাল নিলামকারী।

তিরিশ পাউণ্ড থেকে শুরু হল।

'চল্লিশ!'

বলল একজন।

'পঁয়তাল্লিশ!' আরেকজন।

'পঞ্চাশ!' বলল অন্য আরেকজন।

দাম উঠছে। চেয়ারটার ওপর অনেকের চোখ পড়েছে বোঝা গেল। তবে পঁচাত্তরের পর দু'জন বাদে সবাই চুপ হয়ে গেল। সেই দু'জন হল কোলাব্যাঙ, আর মিসেস পারকার।

'আশি!' লোকটা বলল।

'নব্বই!' মিসেস পারকার বললেন।

'পঁচানব্বই!'

'একশো!'

ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারল, এর বেশি আর দাম দেবেন না মিসেস পারকার। সামান্য একটা চেয়ারের জন্যে, অ্যানটিক মূল্য যতই থাক ওটার, একশোই যথেষ্ট। আগের রাতে জিনার বাবার সঙ্গে চেয়ারটা নিয়ে কথা হয়েছে তাঁর। ঠিক করেছেন দু'জনেই, একশোর বেশি হলে নেবেন না। লোকটা কি এর বেশি দেবে? কিছু বলল না লোকটা। ভাবছে বোধহয়। কাশলো একবার।

হাতুড়ি ঠুকতে শুরু করল নিলামকারী, 'একশো পাউণ্ড!...একশো পাউণ্ডে গেল...গেল...আর কেউ কিছু বলবেন...নেই?...বেশ...ওয়ান...টু...'

ছেলেমেয়েরা জানে, লোকটা 'থ্রি' বললেই ডাক শেষ হয়ে যাবে। তারমানে যে বেশি হেঁকেছে, জিনিসটা তার হয়ে যাবে। হাতুড়ি তুলল লোকটা। নামিয়ে আনতে শুরু করল। ঠুকবে, এবং থ্রি বলবে।

শেষ মুহূর্তে হাত তুলতে আরম্ভ করল কোলাব্যাঙ। তারমানে আরও বেশি ডাকতে যাচ্ছে সে। হাতটা পুরো তুলতে পারলেই হয়ে যেত, কিন্তু সেই মুহূর্তে

ভাগ্য বিরূপ হল তার। ভিড়ের মধ্যে আঁউ করে উঠল একজন লোক। পরক্ষণেই ধাক্কা খেয়ে যেন কাত হয়ে গেল মুসা, পড়ল একেবারে লোকটার ওপর। কখন তার পাশে চলে গেছে, উত্তেজনায় খেয়াল করেনি জিনা কিংবা রবিন।

ব্যাঙমুখো লোকটা আর ডাকতে পারল না, তার আগেই নিলামকারীর হাতুড়ি ঠকাস করে পড়ল টেবিলে, বলল, 'থ্রি!'

টাব চেয়ারটার মালিক হয়ে গেলেন মিসেস পারকার। খুব খুশি হলেন জিনিসটা পেয়ে।

ভিড় থেকে বেরিয়ে এল ছেলেমেয়েরা।

হেসে মুসা বলল, 'আমার জন্যেই পেয়েছেন তিনি ওটা, তাই না? একেবারে সময়মত ধাক্কা মারল আমাকে পাশের লোকটা।'

'তুমি ওখানে গেলে কখন?' জিনার চোখে সন্দেহ। 'কিভাবে?'

'গেছি।' দায়সারা জবাব দিয়ে দিল মুসা।

'ইচ্ছে করেই গেছো, তাই না?' ভুরু কোঁচকালো রবিন।

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

একসাথে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে ঘুরে গেল রবিন আর জিনা।

হেসে আরেক দিকে মুখ ফেরাল কিশোর।

'একেবারে রামচিমটি কেটেছি, বুঝলে,' হেসে বলল মুসা। 'পাশের লোক-টাকে এমন জোরে চিমটি দিলাম, আঁউ করে উঠে ধাক্কা মারল আমাকে। সহজেই সামলে নিতে পারতাম ধাক্কাটা। কিন্তু কেন সামলাব বল?'

''কাজটা কিন্তু উচিত হল না,' জিনা বলল। 'মা শুনলে রাগ করবে। চেয়ারটা নেবে না, লোকটাকে দিয়ে দেবে।'

'বলতে যাচ্ছে কে তাঁকে?' কিশোর বলল। 'আমরা বলছি না। তুমি বলবে?'

'নাহ্,' হেসে ফেলল জিনা।

'হুফ!' করে উঠল রাফিয়ান। যেন কথা দিল, সে-ও মুখ বন্ধ রাখবে।

মিসেস পারকার চেয়ারটা পেয়ে যাওয়ায় ছেলেমেয়েরা খুবই খুশি হল। ওরা কথা বলছে, তিনি ওটার দাম মিটিয়ে দিয়ে এলেন। তিনি যেমন খুশি হয়েছেন, তেমনি বেজার হয়েছে ব্যাঙমুখো। সেল-রুম অ্যাসিসটেন্টকে বললেন মিসেস পারকার, চেয়ারটা কোথায় দিয়ে আসতে হবেঃ ১৬ লাইম অ্যাভেন্যু, ৩ নাম্বার ফ্ল্যাট।

এই সময় তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল, 'বিরক্ত করতে এলাম, ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। ওই চেয়ারটা সত্যিই আমার খুব পছন্দ⋯না না, দরকার। আপনি বিক্রি করে দিন আমার আছে। আপনি

যা দিয়েছেন, তার চেয়ে অবশ্যই বেশি দেব।'

লোকটার দিকে মুখ তুলে তাকালেন মিসেস পারকার। ভাল পোশাক পরেছে লোকটা, কথাবার্তাও বেশ ভদ্র। কিন্তু তারমাঝেও সূক্ষ্ম একটা হুমকির ভঙ্গি রয়েছে, এবং সেটা তাঁর কান এড়ালো না। এই ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হল না তাঁর। 'সরি,' শীতল কণ্ঠে বললেন তিনি। 'চেয়ারটা আমারও খুব পছন্দ। বিক্রি করব না।'

তর্ক করার চেষ্টা করল লোকটা। থামিয়ে দিলেন মিসেস পারকার। আশেপাশের লোকেরাও ধমক লাগাল লোকটাকে, চুপ করার জন্যে, নিলামের ডাক শুনতে অসুবিধে হচ্ছে। রাগে গটমট করে দরজার দিকে এগোল ব্যাঙমুখো।

'খাইছে!' মুসা বলল। 'লোকটা বুঝতে পারেনি, আমি ইচ্ছে করে…' জিনার মায়ের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে। 'খুব খারাপ লোক!'

'হ্যাঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকালেন মিসেস পারকার। মুসার কথা বুঝতে পারেননি।

নিলাম দেখার জন্যে আরও কিছুক্ষণ থাকলেন ওখানে মিসেস পারকার। আরেকটা জিনিস পছন্দ হল তাঁর। আগের দিন ওটা চোখে পড়েনি। ছোট একটা লেখার টেবিল। ওটার জন্যে তেমন প্রতিযোগিতা হল না, সস্তায়ই কিনে ফেললেন। সেল-রুম অ্যাসিসটেন্ট জানাল, আগামী দিন জিনিসগুলো পৌঁছে দেয়া হবে ঠিকানামত।

'এখানে তো নাহয় পৌঁছে দিল,' জিনা বলল, 'কিন্তু বাড়িতে নেমে কি করে, মা?'

'সেটা দেখা যাবে। স্টীমারেও নেয়া যায়। প্লেনেও।'

একজায়গায় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না রাফিয়ানের। এই কোলাহল, লোকজন তার পছন্দ হচ্ছে না। তাছাড়া মঞ্চের ওপর কি ঘটছে, তা-ও দেখতে পাচ্ছে না। উসখুস শুরু করল সে। মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করল জিনা।

ফ্ল্যাটে ফিরে এল ওরা। কিছু নাস্তা খেয়ে রাফিয়ানকে নিয়ে হাঁটতে বেরোল জিনা আর তিন গোয়েন্দা।

একেকজন একেক কথা বলছে। কিশোর হাঁটছে নীরবে। আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটিও কাটল বার দুই।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করল রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'এই কিশোর, কি ভাবছ? সেই সেল-রুম থেকেই দেখছি, বড় বেশি চুপচাপ তুমি। কি ব্যাপার?'

'ভাবছি ব্যাঙমুখোর কথা। চেয়ারটার জন্যে বড় বেশি আগ্রহ তার। একজন

কিনে নেবার পরও সেটা বেশি দাম দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিনতে চাইল। ভাবনার বিষয়, তাই না?'

পরদিন সকালে দিয়ে গেল টাব চেয়ার আর ছোট ডেস্কটা। যারা নিয়ে এসেছে, তাদেরকে বকশিশ দিতে গেলেন মিসেস পারকার। ইতিমধ্যে মালগুলো বয়ে সিটিং রুমে নিয়ে এল ছেলেমেয়েরা। ডিসেম্বরের উজ্জ্বল সূর্যালোকে ভরে গেছে ঘর। ময়লা হয়ে আছে চেয়ার, ডেস্ক, দুটোই। পরিষ্কার করতে লেগে গেল ওরা।

লোকগুলো বেরিয়ে যাওয়ার পর সবে দরজা বন্ধ করেছেন মিসেস পারকার, আবার বেজে উঠল দরজার ঘন্টা। অবাক হলেন তিনি। কারও তো আসার কথা নয়! দরজা খুললেন আরেকবার।

দাঁড়িয়ে রয়েছে কোলাব্যাঙ! আগের দিন নিলামে তাঁর সঙ্গে যে লোকটা প্রতিযোগিতা করেছিল। মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন তিনি, তাঁর আগেই বলে উঠল সে, ঠিক একইরকম ভদ্র কণ্ঠে, 'প্লীজ, ম্যাডাম, আমাকে অন্তত কথা বলতে দিন! আপনাকে বার বার বিরক্ত যে করছি, তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন আমার কথা।'

কি বলবেন বুঝতে পারলেন না মিসেস পারকার। সরে দাঁড়ালেন। ঘরে ঢুকল লোকটা। পরিচয় দিল, 'আমার নাম রবার্ট ম্যাকি। একটা দোকান আছে আমার, কিউরিও আর স্যুভনির বিক্রি করি। মিমোসা অ্যাভেন্যুতে। কাল যে চেয়ারটা আপনি কিনে এনেছেন, ওটার জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করেছি···যাঁর জিনিস তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। ওই চেয়ারটা আমি তাঁর স্মৃতি হিসেবে রেখে দিতে চাই। প্রায়ই বসতেন তিনি ওটায়। আর যে ডেস্কটা কিনেছেন আপনি, লেখাপড়ার কাজ ওটাতেই বেশি করতেন মিস মেয়ারবাল। টেবিল আমার দরকার নেই, শুধু চেয়ারটা পেলেই চলবে। দেখে মনে করতে চাই তাঁর কথা।'

গল্পটা আন্টিকে নাড়া দিত অবশ্যই, যদি লোকটা আন্তরিক হত, কিন্তু তার কথা আর মুখের ভাবে কোন মিল দেখলেন না তিনি।

'সরি,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন মিসেস পারকার, 'চেয়ারটা আমার খুব পছন্দ, কালই বলেছি। আমি ওটা রাখার জন্যেই কিনেছি। আর স্মৃতির ব্যাপার তো? মিস মেয়ারবালের ব্যবহার করা আরও অনেক জিনিস আছে, ওগুলো থেকে কোন একটা বেছে কিনে রেখে দিন।'

'কিন্তু আমি···মানে···ওই চেয়ারটাই···ওটা আমার দরকার! ওটাই বেশি ব্যবহার করতেন কিনা মিস মেয়ারবাল··· যাকগে। ভাল দাম দিতে রাজি আছি আমি। এই ধরুন, একশো পঞ্চাশ ডলার?'

খুব বিরক্ত হলেন আন্টি। কড়া গলায় জবাব দিয়ে দিলেন, দাম ডাবল করে দিলেও বেচবেন না তিনি। তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা টাকার নয়, পছন্দের। আমি ওটা কোন দামেই বেচব না। ঠিক আছে?'

চেয়ার ঝাড়ার জন্যে একটা ঝাড়ন আনতে রান্নাঘরে চলেছিল জিনা, যেতে হয় হলঘর পেরিয়ে, এই সময় বেল বাজিয়েছে ম্যাকি। লোকটাকে দরজায় দেখেই তাড়াতাড়ি সিটিং রুমে ফিরে এসে বন্ধুদেরকে খবর জানিয়েছে জিনা। পা টিপে টিপে তিন গোয়েন্দাও এসে দাঁড়িয়েছে তখন দরজার বাইরে। কেরিআন্টি আর লোকটার সব কথা শুনেছে।

চেয়ার বিক্রি করতে তাঁকে কিছুতেই রাজি করাতে পারল না লোকটা। ও চলে গেলে দরজাটা আবার ভালমত লাগিয়ে দিলেন আন্টি।

ছেলেমেয়েরা এসে ঢুকল হলঘরে।

'আস্ত শয়তান!' জিনা বলল। 'আবার এসে হাজির হয়েছে চেয়ার কিনতে। ব্যাটা ঠিকানা পেল কোথায়?'

'ওটা কোন ব্যাপার না,' মা বললেন। 'সেলস-রুম অ্যাসিসটেন্টদের ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। ওদের কাছ থেকে জোগাড় করে নিয়েছে হয়ত।'

'কিংবা আপনি যে বলেছেন কাল, সেটাই হয়ত শুনেছে,' কিশোর বলল। 'বেশ জোরেই তো বললেন।'

'হ্যাঁ,' মুসা মাথা দোলাল, 'ব্যাটা শুনেছে। তারপর এসে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির বাইরে। লোকগুলো জিনিস রেখে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে বেল বাজিয়েছে।'

'অতি আগ্রহ,' রবিন বলল। 'চেয়ারটা সুন্দর, সন্দেহ নেই, তবু পুরানো একটা চেয়ারের জন্যে এত আগ্রহ কেন?'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'স্মৃতি-ফিতি সব বাজে কথা। অন্য কারণ আছে। এমন কোন দামি চেয়ার নয় ওটা, দুর্লভও নয়। খুঁজলে ঠিক ওরকম মডেলের চেয়ার অনেক পাবে এই শহরে। মিথ্যে কথা বলছিল সে, বোঝাই গেছে। স্মৃতির জন্যে ওই চেয়ারটাই একমাত্র জিনিস নয়, আন্টি ঠিকই বলেছেন।'

'এর মাঝেও রহস্য খুঁজে পেলে নাকি?' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'পেয়ে গেছ গন্ধ?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি,' বেশ জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'ওই ব্যাঙমুখো লোকটাকে মোটেই ভাল লাগেনি আমার।'

'আমারও না,' বলে বেরিয়ে গেলেন আন্টি। রান্নাঘর থেকে ব্রাশ আর একটা ছোট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে এলেন। 'এই নাও, ওগুলো পরিষ্কার করে ফেল গিয়ে।

আমি রান্না করতে যাচ্ছি।'

সিটিং রুমে ফিরে এল ওরা। পুরানো জিনিস সাফ করতে অভ্যস্ত তিন গোয়েন্দা, প্রায়ই একাজ করতে হয় তাদেরকে স্যালভিজ ইয়ার্ডে। জিনা পারে না এসব। করতে দিলে আরও নষ্ট করবে।

ডেস্কটায় হাত লাগাল কিশোর আর মুসা। রবিন ব্রাশ দিয়ে চেয়ারের গদির ধুলো ঝাড়তে লাগল। জিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। রাফিয়ান শুয়ে আছে রোদে পিঠ দিয়ে। আয়েসী ভঙ্গিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দার কাজ।

'ধুলো বেশি নেই,' ব্রাশটা রেখে দিল রবিন।

'ব্যাঙটা তো বললই,' জিনা বলল। 'বুড়ো মহিলা নাকি প্রায়ই বসতেন এই চেয়ারে। মুছে-টুছে রাখতেন আরকি।'

চেয়ারের হেলানের সঙ্গে সিটটা যেখানে জোড়া দেয়া হয়েছে, ওই ফাঁক, আর হাতলের নিচের ধুলো বের করা সব চেয়ে কঠিন। 'ধুলো ওসব জায়গায়ই জমে বেশি,' রবিন বলল। হাত ঢুকিয়ে দিল ফাঁকটায়। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে। 'কিশোর, কি যেন লাগছে! কোনভাবে ঢুকে গিয়েছিল ফাঁকের মধ্যে!...না, আপনাআপনি ঢুকতে পারবে না, বেশ বড়ই লাগছে। নিশ্চয় ইচ্ছে করে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে ওখানে।'

বকের মত গলা বাড়িয়ে এল জিনা। 'কি জিনিস? বের করা যায় না?'

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বের করে আনতে পারল রবিন। চ্যাপ্টা একটা বাক্স, ফ্যাকাসে নীল রঙ।

'আরি, গহনার বাক্স মনে হচ্ছে!' জিনা বলল।

ডেস্ক মোছা বাদ দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর মুসা।

'খোলো খোলো, জলদি!' মুসা বলল।

রবিনের হাত থেকে নিয়ে বাক্সটা খুলল জিনা। 'মুক্তাআ!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'দারুণ একখান নেকলেস!' মুসা বলল। 'কটা মুক্তো আছে?'

'আসল তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে তো হচ্ছে,' জিনা বলল। 'চলো, মা'কে দেখাই।'

রান্নাঘরে ছুটে এল ওরা। পেছনে লাফাতে লাফাতে এল রাফিয়ান।

'মা, মাআ!' চেঁচিয়ে বলল জিনা, 'দেখ, কি পেয়েছি!'

তিন

হাতের তালুতে হারটা রেখে আঙুল বুলিয়ে দেখছেন মিসেস পারকার। খুব অবাক হয়েছেন। হালকা গোলাপী রঙ মুক্তাগুলোর।

'আসলই মনে হয়,' বললেন তিনি। 'এক্সপার্টকে দেখাতে হবে।'

'আসল হলে অনেক দাম, তাই না, মা?'

'হ্যাঁ।'

'ওটার মালিক এখন কে? নিশ্চয় তুমি?'

'তাই তো হওয়ার কথা,' জবাবটা দিল কিশোর। 'চেয়ারটা তিনি কিনে এনেছেন। ওটার ভেতরে বাইরে যা থাকবে, সব কিছুর মালিকই তিনি হবেন। তাছাড়া মিস মেয়ারবালের কোন আত্মীয়ও নেই যে ফিরিয়ে দেয়ার কথা ভাবা যাবে।'

'বাহ্, তাহলে তো খুব ভাল!' হাততালি দিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত লাফিয়ে উঠল জিনা। 'আমি ওটা পরব, মা!'

'দেখি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মা বললেন, 'তোর বাবা আসুক, আলাপ করে দেখি। পুলিশকে জানাতে হতে পারে। চোরাই মাল কিনা কে জানে!'

'আসলই হবে,' কিশোর বলল, 'ম্যাকি সেটা জানে। আর জানে বলেই চেয়ারটা কেনার জন্যে পাগল হয়ে আছে সে। তবে চেয়ারের ভেতরেই ছিল এটা, জানা ছিল না তার, শুধু সন্দেহ ছিল। জানা থাকলে কিছুতেই আমরা কিনতে পারতাম না, অনেক বেশি দাম হেঁকে প্রথমেই নিয়ে যেত ওটা।'

'তা ঠিক,' একমত হল রবিন।

'লোকটা অসৎ,' মুসা মন্তব্য করল। 'চেহারা দেখেই বোঝা যায়।'

'শুধু চেহারা দেখে কারও সম্পর্কে ওরকম মন্তব্য করা ঠিক না,' আন্টি বললেন। 'লোকটার ব্যবহার খারাপ নয়। তবে এটা ঠিক, আমারও ভাল লাগেনি ওকে।...এহহে, আলু পুড়ে যাচ্ছে...'

রান্নায় মন দিলেন আবার আন্টি। ছেলেমেয়েরা ফিরে এল সিটিং রুমে। চেয়ার আর ডেস্ক মোছা শেষ হয়নি, কাজটা সেরে ফেলতে লাগল। তবে এখন ওই গোলাপী মুক্তার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না।

'চেয়াবের মধ্যে মুক্তা লুকিয়েছে,' মুসা বলল, 'অদ্ভুত কাণ্ড!'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রবিন।

চেয়ারটার প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখছে কিশোর। যদি আর কিছু পাওয়া

যায়? কাছে দাঁড়িয়ে আছে জিনা।

কিন্তু আর কিছু পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে আরেকটা আবিষ্কার করে বসল মুসা। বলে উঠল, 'এই দেখ দেখ,' ডেস্কটার ড্রয়ার দেখিয়ে বলল সে। 'ছোট একটা নব। কালো। সহজে চোখে পড়ে না।' বলতে বলতেই টিপে দিল ওটা। কিট করে একটা শব্দ হল। তারপর যেন পিছলে সরে গেল একটা ছোট পাল্লা, বেরিয়ে পড়ল গোপন খোপ।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'চেয়ারের ফাঁকে মুক্তা...এই গোপন খোপে টাকার তোড়া কিংবা মোহর পেলে অবাক হব না!'

সবাই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রয়েছে খোপটার দিকে।

খোপটায় খুঁজতে শুরু করেছে মুসা। কিন্তু নিরাশ হতে হল তাকে। টাকাও নেই, মোহরও নেই, আর কোন গহনাও নেই। শুধু একটা সাধারণ হলদেটে খাম।

মুসার হাত থেকে ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিল কিশোর। ভেতর থেকে বেরোল একপাতা কাগজ। লেখাটা জোরে জোরে পড়ল সে, 'আমি মিস আরনিকা মেয়ারবাল, ২৮, অ্যালমণ্ড রোড, আমার একটা মুক্তার নেকলেস আমার বান্ধবী মনিকা ডিকেনসকে উপহার হিসেবে দিয়ে যাচ্ছি, আমার স্মৃতি হিসেবে। এটা আমি পেয়েছিলাম আমার খালার কাছ থেকে। দুই ছড়ায় মোট আটানব্বইটা মুক্তা আছে এতে...'

'আটানব্বই!' বলে উঠল জিনা। 'আমরা যেটা পেয়েছি সেটার কথাই বলেছে। আটানব্বইটাই আছে। গুনে দেখেছি।'

'দুই ছড়া। হ্যাঁ, ঠিকই আছে,' মুসা বলল।

'বিশ বছর আগে লেখা হয়েছে এই দলিল,' কাগজটায় আরেকবার চোখ বুলিয়ে বলল কিশোর। 'অথচ মিস মেয়ারবাল মারা গেছেন মাত্র কয়েকদিন আগে।'

রবিন বলল, 'নেকলেসটার মালিক এখন তাহলে মনিকা ডিকেনস। কি করে খুঁজে বের করব তাকে?'

'বের করতেই হবে, যেভাবেই হোক,' জিনা বলল। 'যেহেতু দলিল করে রেখে গেছেন মিস মেয়ারবাল, মনিকা ডিকেনসই এখন এটার আসল মালিক। বিশ বছর আগেই তিনি উইল করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নেকলেসটা পাবেন তাঁর বান্ধবী। এতদিন ওটা টেবিলের গোপন ড্রয়ারে থেকে থেকে পুরানো হয়েছে। তিনি নিশ্চয় ভাবেননি এতদিন বাঁচবেন।'

'চিঠিটা আন্টিকে দেখানো দরকার,' মুসা বলল।

দলিলটা পড়ে অবাক হলেন না মিসেস পারকার। 'তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছি আমি, আসল মুক্তাই। অনেক দামি জিনিস।' এক মুহূর্ত ভাবলেন তিনি। 'আজ বিকেলেই গিয়ে একজন উকিলের সাথে দেখা করব। ওই মহিলাকে খুঁজে বের করে তাঁর জিনিস ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে।'

'উকিলের কাছে যাবেন?' কিছুটা হতাশ মনে হল যেন কিশোরকে। 'আরেক কাজ করলেই তো পারি। ওই মহিলাকে আমরাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি।'

'তার মানে গোয়েন্দাগিরি?' হাসলেন কেরি আন্টি। 'কোন কাজ না পেয়ে বিরক্ত হয়ে গেছ নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, মা,' অনুরোধ করল জিনা। 'উকিলের কাছে তো যে-কোন সময় যেতে পার। তারচে' আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি না। সময় কাটবে ভাল।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মত,' রবিন বলল।

'বেশ,' তিন গোয়েন্দার ওপর ভরসা আছে আন্টির। 'দেখ চেষ্টা করে। তবে ঘরে রাখা ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। এত দামি একটা জিনিস।'

'কেউ তো আর জানছে না ওটা আমাদের কাছে আছে,' কিশোর বলল।

'তা ঠিক।'

উত্তেজনার মাঝে খুব দ্রুত দুপুরের খাবার শেষ হল সেদিন ছেলেমেয়েদের। তারপর আলোচনায় বসল ওরা। অবশ্যই তাদের সঙ্গে রইল রাফিয়ান।

'প্রথমেই,' কিশোর বলল, 'মনিকা ডিকেনসের নাম খুঁজতে হবে টেলিফোন বুকে।'

'ঠিক,' বলতে বলতে মোটা ডিরেকটরিটা টেনে নিল রবিন। 'দেখি।'

দ্রুত পাতা উল্টে চলল সে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এল অন্য তিনজন। ডিকেনস কয়েকটাই পেল, কিন্তু মনিকা ডিকেনস একজনও নেই।

'আরেকবার দেখা যাক,' মুসা পরামর্শ দিল।

'দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিশ্চয় লুকিয়ে থাকেনি নামটা।'

'হয়ত মহিলার টেলিফোন নেই,' রবিন বলল।

'হতে পারে,' জিনা বলল।

'কিংবা এ-শহর থেকে চলে গেছে,' বলল মুসা।

'বিয়েও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে,' অনুমান করল রবিন। 'স্বামীর নাম হয়ত ডিকেনস নয়।'

'অথবা মিস মেয়ারবালের মত মরেও গিয়ে থাকতে পারে,' ঘোষণা করল যেন

কিশোর।

'তাই তো, এটা তো ভেবে দেখিনি,' জিনা বলল। 'বিশ বছর আগে উইলটা করা হয়েছে। আর এত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী যখন, মিস মেয়ারবালের সমবয়সীও হতে পারে। তাহলে মরে যাবারই কথা।'

'কিন্তু সেটা জানব কিভাবে আমরা?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'হুফ!' রাফিয়ানও যেন একই প্রশ্ন করল।

গম্ভীর হয়ে গেল সবাই। কিশোর বাদে। কাজ জটিল হলেই তার আনন্দ। হাসিমুখে বলল, 'সহজেই সেরে ফেলব ভেবেছিলাম আমরা, শুধু টেলিফোন বুক দেখেই। হল না।'

'ইস্, ঠিকানাটাও যদি লিখে রেখে যেতেন মিস মেয়ারবাল!' জিনা আফসোস করল।

নিজের কপালে টোকা দিল কিশোর। 'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। মিস মেয়ারবালের বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক। খুঁজলে কিছু বেরিয়েও পড়তে পারে। তাঁর ঠিকানা আছে দলিলে।'

'ঠিক বলেছ!' তুড়ি বাজাল মুসা। 'কিন্তু গিয়ে কি খুঁজব ওখানে?'

'মিস মেয়ারবালের পড়শী থাকতে পারে। তাকে বা তাদেরকে জিজ্ঞেস করব। ওরা হয়ত এমন কোন সূত্র জানাতে পারে, যাতে মনিকা ডিকেনসকে খুঁজতে সুবিধে হয়।'

'হ্যাঁ, ভাল বলেছ,' একমত হল রবিন। 'তা-ই করা উচিত।'

জিনা খুশি হতে পারছে না। মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোরের কথায় সায় জানাল, 'হ্যাঁ, বুদ্ধিটা ভাল। কিন্তু যাব কিভাবে?'

'কেন, বাসে,' রবিন বলল। 'ট্রেনেও যেতে পারি। লণ্ডনের মত এই শহরেও পাতালরেল রয়েছে। ট্রেনে করে যেতে অসুবিধে কি?'

'আমাদের অসুবিধে নেই,' জিনা বলল। 'কিন্তু রাফি যাবে কিভাবে? বাক্সে ভরে নেব নাকি? ওকে বাড়িতে রেখে যেতে পারব না।'

'তাই তো,' চোয়াল ঝুলে পড়ল রবিনের। 'ঝুড়িতে করে ছাড়া পাতালরেলে কোন জানোয়ার নেবার অনুমতি নেই। না হয় ভরলাম। কিন্তু যা ভারি ও। কতক্ষণ বয়ে নিতে পারব? কি করা যায় বলতো?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব মিলল না। ভাবছে সবাই। বার দুই নীরবে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। উজ্জ্বল হল মুখ। 'ঝুড়িতে করেই যাবে। কিন্তু আমাদের বয়ে নিতে হবে না ওকে। ওর বোঝা ও-ই বইবে।'

'ধাঁধা বললে নাকি?' মুসা ভুরু নাচাল।

'মোটেও না,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ওঠো। রওনা হই।'

কিশোরের পিছে পিছে চলল সবাই। অবাক হয়ে ভাবছে, কি করবে গোয়েন্দাপ্রধান?

রান্নাঘরে ঢুকল কিশোর। বেতের বড় একটা বাজার করার ঝুড়ি বের করল। 'চলো, যাই,' বলল সে।

কাছের টিউব-রেল স্টেশনটায় চলে এল ওরা। শহরের একটা ম্যাপ জোগাড় করে নিতে কষ্ট হল না। অ্যালমণ্ড রোডটা কোথায় খোঁজ করল তাতে।

ছুরি বের করে ঝুড়ির নিচের দিকে চারটে গোল ফোকর কাটল কিশোর। তারপর ঝুড়ির মুখ খুলে ইশারা করল রাফিয়ানকে। একান্ত বাধ্য ছেলের মত ঝুড়িতে ঢুকে পড়ল বুদ্ধিমান রাফিয়ান। ঝুড়ির আঙটা ধরল কিশোর, আরেকটা মুসা। দু'জনে মিলে কুকুরটাকে বয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল প্ল্যাটফর্মে।

টিকেট ক্লার্কের চোখে পড়বে না এমন একটা জায়গায় এসে নামিয়ে রাখল ঝুড়িটা। কিশোর আদেশ দিল, 'এবার হাঁট রাফি। দেখ চেষ্টা করে পারিস কিনা।'

চার ফোকরে চার পা ঢুকিয়ে ঝুড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়াল রাফিয়ান। হাঁটতে শুরু করল। ওই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হো হো করে হেসে উঠল মুসা। তার হাসিতে যোগ দিল রবিন আর জিনা।

'এই, অত হেসো না,' হুঁশিয়ার করল কিশোর। 'স্টেশনের কেউ দেখে ফেললে মুশকিল হবে।'

কুকুরের পা নিয়ে হাঁটছে একটা ঝুড়ি। ওই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল প্ল্যাটফর্মের যাত্রীরা। মুচকি হাসল কেউ কেউ।

প্ল্যাটফর্মের একধারে এসে রাফিয়ানকে বলল কিশোর, 'বসে থাক!'

বাধ্য ছেলের মত ঝুড়ি নিয়ে বসে পড়ল কুকুরটা।

রবিন গিয়ে টিকেট কেটে আনল। এরপর ট্রেনের অপেক্ষা।

ট্রেন এল। ধরাধরি করে ঝুড়িটা তোলা হল। মুখোমুখি দুটো সিটে বসল ছেলেমেয়েরা, একেক সিটে দু'জন করে।

'খুব লক্ষ্মী ছেলে,' রাফিয়ানের প্রশংসা করল জিনা। 'ওর মত কুকুরই হয় না। কেমন চুপচাপ রয়েছে।'

অবশ্যই লক্ষ্মী রাফিয়ান, অনেক কুকুরের চেয়ে বুদ্ধিও ধরে বেশি। তবে জাতে সে কুকুর। আর কুকুরের যা স্বভাব, বেড়াল দেখতে পারে না।

জিনা যখন তার প্রশংসা করছে, ঠিক ওই সময় বাতাসে না-পছন্দের জিনিসের গন্ধ পেয়েছে রাফিয়ান। ওই কামরারই একধারে এক মহিলা বসেছে, পায়ের কাছে একটা বেতের ঝুড়ি, মুখ বন্ধ। নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে ওটার ভেতর। বেড়াল!

ঘাউ করে উঠল রাফিয়ান। বিকট চিৎকার। ঝুড়িতে ওকে চুপচাপ থাকতে হবে একথা আর মনে রইল না। লাফ দিয়ে উঠে ঝুড়ি নিয়েই ছুটল।

তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল কামরার ভেতরে। যাত্রীরা অবাক। ঝুড়ি হাঁটে কি করে! তারপর ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিশাল এক কুকুরের মুখ। ভয়ে কুঁকড়ে গেল কেউ। তবে বেশির ভাগই উপভোগ করল ব্যাপারটা। হাসিতে ফেটে পড়ল ওরা।

রাফিয়ানের কোনদিকে কান নেই। চেঁচিয়ে ডাকছে জিনা, শুনতেই পেল না। চোখের পলকে পৌঁছে গেল বেড়ালের ঝুড়ির কাছে।

'ঘাউ! ঘাউ!' প্রচণ্ড চিৎকার করছে। নাক দিয়ে ঠেলে খোলার চেষ্টা করছে বেড়ালের ঝুড়ির মুখ।

'মিয়াঁওও!' ভেতর থেকে এল রাগতঃ প্রতিবাদ। ছিটিক ছিটিক করে জোরে জোরে থু-থু ছেটানোর শব্দ, তারপর তীক্ষ্ণ হিসহিস। ঝট করে বেরিয়ে এল একটা রোমশ কালো থাবা, বেরিয়ে পড়েছে ধারালো নখগুলো। আঘাত হানল রাফিয়ানের নাকে।

'আঁউও!' করে আর্তনাদ করে উঠল রাফিয়ান। পিছিয়ে এল। বদমেজাজী কুকুর নয় সে, বেড়াল তাড়া করে স্বভাবের কারণে, মজা করার জন্যে, মারার জন্যে নয়। কিন্তু ঝুড়ির ভেতরে 'বোকা গাধাটা' তার মতলব বুঝতে পারেনি, ভয়ঙ্কর হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। আরে বাবা, অন্য সময় যেমন গাছে উঠে পালিয়ে যাস, তেমনি পালিয়ে গেলেই পারতিস! যত্তোসব!

হতভম্ব হয়ে গেল রাফিয়ান। তার পিঠের ওপরে ঝুড়ির দুটো হ্যাণ্ডেল বাড়ি খাচ্ছে। নাক থেকে গড়িয়ে পড়ল দুই ফোঁটা রক্ত।

'দারুণ দেখিয়েছিস, ম্যাগি!' বলল বেড়ালের মনিব। 'খুব ভাল করেছিস। আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে বেয়াদব কুকুরটার।'

জবাবে আরেকবার হিসিয়ে উঠল ম্যাগি। যেন কুকুরটাকে ডেকে বলল, আর লাগতে আসবি আমার সাথে, কুকুর কোথাকার!

হতবাক হয়ে পড়েছে জিনাও। রাফিয়ানেরই দোষ। তাই মহিলাকে কিছু বলল না, শুধু চোখের আগুনে একবার ভস্ম করার চেষ্টা চালাল। রাফিয়ানের কলার চেপে ধরল একহাতে, আরেকহাতে ঝুড়ির আঙটা। আরেকটা আঙটা ধরতে বলল মুসাকে। বয়ে নিয়ে এল কুকুরটাকে। যার যার সিটে এসে বসল। কামরায় প্রচণ্ড হাসাহাসি চলছে। কুকুরটাকে বসতে বলার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে জিনা। ঝুড়ি পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়েই আছে রাফিয়ান। বিচিত্র দৃশ্য। তাতে হাসি আরও বাড়ছে লোকের।

ছেলেমেয়েরা হাসল না। এত গোলমাল কিসের, বুঝতে পারল না রাফিয়ান।

অবশেষে যাত্রা শেষ হল।

খোলা বাতাসে বেরিয়ে এল আবার ওরা। রাফিয়ানকে ঝুড়ি থেকে বের করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'নিশ্চয় সামনের ওই চওড়া রাস্তাটাই অ্যালমণ্ড রোড,' রবিন বলল।

২৮ নাম্বার খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। অনেক পুরানো একটা বাড়ি। তবে বেশ সুরক্ষিত, নতুন রঙ করা হয়েছে। ধনী একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা এরকম জায়গায়ই বাস করবেন আশা করেছিল ছেলেমেয়েরা।

ঘন্টা বাজাল কিশোর। দরজা খুলে দিল এক মহিলা, বাড়ির কেয়ারটেকার, ওদের সঙ্গে হাসি মুখেই কথা বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' মহিলা বলল, 'অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন মিস মেয়ারবাল। একাই থাকতেন। বিশেষ কেউ আসতও না তাঁর কাছে, শুধু একজন ছাড়া। তাঁর মতই বৃদ্ধা, মিসেস ডিকেনস। হ্যাঁ, মিস মেয়ারবালকে যেদিন কবর দেয়া হল সেদিনও এসেছিলেন মহিলা, শেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে...'

একনাগাড়ে বলে চলেছে মহিলা, কথা যেন আর ফুরায়ই না। খানিকক্ষণ উসখুস করে শেষে তাকে থামানোর জন্যে কিশোর বলল, 'মিসেস ডিকেনস-এর প্রথম নামটা জানেন? মনিকা, তাই না?'

'মনিকা? হ্যাঁ, বোধহয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার শুনেছি বলেও মনে পড়ছে...'

'কোথায় থাকে জানেন? উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা।

'নিশ্চয় জানি। একদিন মিসেস মেয়ারবাল আমাকে বললেন, একটা জিনিস নিয়ে গিয়ে মিসেস ডিকেনসকে দিয়ে আসতে...'

'ঠিকানাটা বলুন, জলদি!' আর ধৈর্য রাখতে পারছে না জিনা। চেঁচিয়ে উঠল।

তার কথায় থমকে গেল মহিলা। ভুরু কুঁচকে তাকাল। এখুনি যেন নিজেকে গুটিয়ে নেবে শামুকের মত। তাড়াতাড়ি সামাল দেয়ার জন্যে হাসল রবিন। 'ব্যাপারটা খুব জরুরি, ম্যা'ম, প্লীজ! মিসেস ডিকেনসকে আমাদের খুব দরকার। একমাত্র আপনিই জানাতে পারবেন তাঁর ঠিকানা।'

আবার হাসি ফুটল কেয়ারটেকারের মুখে। তবে জিনার দিকে আর ফিরেও তাকাল না। বলল, 'দরকার, না? বেশ। লিখে নেবে নাকি? হিরন্ স্ট্রীটে থাকেন তিনি। এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

হেঁটেই যাবার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

ঠিকানামত আরেকটা মস্ত বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ওটারই একটা ফ্ল্যাটে

থাকেন মিসেস ডিকেনস। কিশোর বেল বাজালে দরজা খুলে দিল এক তরুণী, কোলে বাচ্চা। হেসে বলল, 'হাল্লো, কি করতে পারি?'

কেন এসেছে জানাল কিশোর। বিষণ্ন হয়ে গেল মেয়েটা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'দেরি করে ফেলেছ। গত হপ্তায় মারা গেছেন তিনি। মিস মেয়ারবালের শেষ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন, বেশি রাত করে ফেলেছিলেন। ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়ায় ধরল। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই শেষ।'

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা। তদন্ত এখানেই শেষ। যাঁর নামে নেকলেসটা উইল করে দিয়ে গেছেন মিস মেয়ারবাল, তিনিও আর বেঁচে নেই।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মিসেস ডিকেনসের কোন আত্মীয় স্বজন আছে, জানেন? স্বামী, কিংবা ছেলেমেয়ে?'

'স্বামী মারা গেছেন অনেকদিন আগেই। তবে শুনেছি, এক মেয়ে আছে।'

'কোথায় থাকে বলতে পারবেন?'

'না। এখানে মাত্র দু'মাস হল এসেছি। তবে আরও ফ্ল্যাট আছে, পুরানো লোকও আছে, তারা হয়ত কিছু বলতে পারবে। একজন থাকেন মিসেস ডিকেনসের পাশের ফ্ল্যাটে, বৃদ্ধা। তিনি জানতে পারেন।'

ভাবল কিশোর। সবার দরজায় টোকা দিয়ে লাভ নেই। বরং ওই বৃদ্ধাকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

ঠিক জায়গাতেই এল সে। প্রশ্নের জবাবে বৃদ্ধা বললেন, 'হ্যাঁ, জানি। মনিকার মেয়ের নাম মিলি। অনেক আগে বিয়ে হয়েছে। দাওয়াতে আমিও গিয়েছিলাম।'

'ওখানেই আছে এখনও?'

'ওটা ওর শ্বশুরের বাড়ি, ভাড়া বাড়ি নয়,থাকারই তো কথা।'

'ঠিকানাটা জানেন?'

'মনে নেই, তবে লিখে রেখেছি কোথাও। দেখি।' উঠে গিয়ে একটা আলমারি খুললেন তিনি। একটা নোটবুক বের করলেন। পাতা উল্টে উল্টে একজায়গায় এসে থামলেন। 'হ্যাঁ, আছে। তার স্বামীর নাম রিচার্ড ব্যানার। সাত নাম্বার পার্ক অ্যাভেন্যু। এখনও আছে কিনা কে জানে···অনেকদিন মিলির কোন খবর জানি না। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সেই যে চলে গিয়েছিল, আর আসেনি। বড্ড জেদী মেয়ে।'

নোটবুকে দ্রুত ঠিকানাটা টুকে নিল রবিন।

বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

'ঠিকই আছে,' বাইরে বেরিয়ে জিনা বলল। 'মায়ের জিনিস মেয়েই পাবে।

এখন পার্ক অ্যাভেন্যুটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। কোথায় ওটা, কিশোর?'

ম্যাপ দেখল কিশোর। 'বোট্যানিক গার্ডেনস-এর কাছে। বাসে যেতে হবে।'

ঝট করে রাফিয়ানের দিকে তাকাল মুসা, তারপর হাতের ঝুড়ির দিকে। হেসে বলল, 'রাফি, আবার ঢুকতে হবে এটাতে। খবরদার, এবার বেড়াল এসে নাকের কাছে দাঁড়ালেও কিছু করতে পারবি না।'

আর কোন গোলমাল হল না। বিশ মিনিট পর নিরাপদেই বাস থেকে নামল ওরা। এসে দাঁড়াল আরেকটা বাড়ির সামনে। যেখানে বাস করে মিলি ব্যানার। এখনও করে, নাকি করত?

চার

বাড়িতে ঢোকার মুখে একটা হলঘর। ঝাঁট দিচ্ছে একজন লোক। ছেলেমেয়েদের পথ আটকাল। কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

'এখানকার কেয়ারটেকার কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমি। বল।' লোকটা মোটেই আন্তরিক নয়।

'আচ্ছা, মিসেস ব্যানার কোন ফ্ল্যাটে থাকেন, বলতে পারবেন?'

'মিসেস ব্যানার? তিনি তো নেই। কয়েক বছর হল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। তাঁর স্বামী আর মেয়ের জামাইটাও মরেছে। ওই ছোকরাই গাড়ি চালাচ্ছিল। বেপরোয়া চালাত। আজকালকার ছেলেছোকরাগুলোর স্বভাবই ওরকম। সব কিছুতেই তাড়া। আমার গাড়ি থাকলে...'

কেয়ারটেকারকে থামিয়ে দিল জিনা, 'তাঁর মেয়ে বেঁচে আছেন?' আবার বাধা দিল জিনা।

'আছে। কপাল খারাপ...'

'কোথায় থাকেন? ঠিকানাটা বলবেন? আবার বিয়ে করেছেন?'

বার বার বাধা পেয়ে মেজাজ বিগড়ে গেল কেয়ারটেকারের। কড়া গলায় বলল, 'আচ্ছা ছেলে তো!' জিনাকে ছেলে বলে ভুল করল সে। 'কোন কথাই শুনতে চায় না! এই, এত তাড়া থাকলে নিজেই গিয়ে খুঁজে বের কর না। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? যাও এখন। কুত্তা ঢুকিয়েছ কেন? পায়ের ময়লা দিয়ে সারা ঘর তো দিলে নোংরা করে...'

রেগে উঠতে যাচ্ছিল জিনা, তাকে থামিয়ে দেয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'যাচ্ছি। ওপরে গিয়ে দেখি আর কেউ কিছু জানে কিনা...'

'খবরদার, ওপরে যাবে না বলে দিচ্ছি!' গর্জে উঠল কেয়ারটেকার। 'মাত্র

পরিষ্কার করলাম। ময়লা করতে দেব না।'

'কুকুরটাকে বয়ে নিয়ে যাব আমরা,' বলল মুসা।

'ভালমত পা মুছে যাব,' রবিন বলল।

'হবে না!' কেয়ারটেকার বলল। 'বেরোও। কোত্থেকে এক কুত্তা নিয়ে ঢুকেছে! তোমাদের সঙ্গে বকবক করে সময় নষ্ট করতে পারব না।'

আর সামলানো গেল না জিনাকে। 'বকবক তো আপনি করলেন। সেটাই থামাতে চাইছিলাম।'

রেগে লাল হয়ে গেল কেয়ারটেকার। পারলে ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি মারে। এটা বোধহয় আন্দাজ করে ফেলল রাফিয়ান। দাঁত খিঁচিয়ে লাফ দিয়ে সামনে এগোল। এমন জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল, ভীষণ চমকে গিয়ে হাত থেকে ঝাড়ু ছেড়ে দিল কেয়ারটেকার।

রাফিয়ানের কলার টেনে ধরে থামাল জিনা। 'আমাদেরকে আটকানোর কোন অধিকার নেই আপনার। কার সঙ্গে দেখা করতে যাব, না যাব, সেটা আপনার ব্যাপার নয়। আর এত ধমকাচ্ছেন কেন? কি করেছি আমরা? কয়েকটা কথাই শুধু জানতে চেয়েছি।'

'আমি…তোমরা…,' রাগ এবং একই সাথে কুকুরটার ভয়ে কথা আটকে যাচ্ছে কেয়ারটেকারের।

'দেখুন,' মুসা বলল, 'ভাল চাইলে পথ ছাড়ুন। নইলে আবার ছেড়ে দেয়া হবে ওকে,' রাফিয়ানকে দেখাল সে।

'আর আমার বিশ্বাস,' সহজে রাগে না কিশোর, কিন্তু এই লোকটার ওপর রেগে গেছে, 'ওটা আপনাকে কামড়াতে পারলে খুশি হবে। কামড় খেতে চান নাকি?'

খেতে চাইল না কেয়ারটেকার। রাগে গটমট করে চলে গেল একটা দরজার দিকে। টান দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকল, তারপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল পাল্লা।

হাসতে শুরু করল জিনা। 'যাক, ভয় তাহলে পেয়েছে।' রাফিয়ানের মাথায় আলতো চাপড় দিয়ে বলল, 'খুব ভাল করেছিস।'

'এসো,' বলে সিঁড়ির দিকে রওনা হল কিশোর।

দোতলায় উঠে প্রথম যে দরজাটা পড়ল, ওটার বেল বাজাল কিশোর। খুলে দিল এক অল্প বয়েসী মহিলা।

'গুড আফটারনুন,' বিনীত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'বিরক্ত করলাম আপনাকে, সরি। মিসেস ব্যানারের মেয়ের খোঁজে এসেছি আমরা। তিনি কি এখানে থাকেন?'

'ব্যানার? নাহ্, এই ব্লকে ওই নামে কেউ আছে বলে জানি না। তবে আমি

এসেছি নতুন, এই ক'দিন হল।...আচ্ছা, এক কাজ কর না। পাঁচতলায় চলে যাও। একজন বুড়ো ভদ্রলোক থাকেন ওখানে, নাম মিস্টার উইলিয়ামস। গানের শিক্ষক। তিরিশ বছর ধরে আছেন ওই ফ্ল্যাটে। তিনি কিছু বলতে পারবেন।'

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার সিঁড়ির দিকে এগোল ওরা। পাঁচতলায় উঠে দেখতে পেল, একটা দরজায় পেতলের নেমপ্লেট লাগানো রয়েছেঃ ডেভিড উইলিয়ামস—পিয়ানো টীচার।

বেল বাজাল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজা। লম্বা এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল, সব সাদা। হাসলেন। 'গুড আফটারনুন, ইয়াং ফ্রেণ্ডস,' বললেন তিনি। 'পিয়ানো শিখতে চাও?'

'জ্বী না,' ভদ্রলোকের হাসিটা ফিরিয়ে দিল কিশোর। 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। সময় হবে?'

'এসো,' বলে সরে দাঁড়ালেন তিনি। রাফিয়ানকে নিয়ে ঢুকবে কিনা দ্বিধা করছে জিনা, দেখে তিনি বললেন, 'না না, অসুবিধে নেই। নিয়েই এসো। কুকুরটা তোমার, না, ইয়াং ম্যান?' কেয়ারটেকারের মতই জিনাকে ছেলে বলে ভুল করেছেন মিস্টার উইলিয়ামসও।

হাসল জিনা। নিতান্তই ভদ্রলোক এই মানুষটি, তাঁকে ফাঁকি দিতে চাইল না সে। বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, আমারই। আর আমি ছেলে নই, মেয়ে, জরজিনা। ওর নাম রাফিয়ান।'

একে একে সকলের সঙ্গে হাত মেলালেন উইলিয়ামস। দেখাদেখি রাফিয়ানও একটা পা তুলে দিল। ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর হেসে পা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন।

আসার কারণ জানাল কিশোর।

'হ্যাঁ,' বললেন মিস্টার উইলিয়ামস, 'কেয়ারটেকার ঠিকই বলেছে। ভাবলে খারাপই লাগে। খুব ভাল লোক ছিল ওরা। মিলিও মারা গেছে, তার স্বামীও। জামাইটাও বাঁচেনি। তবে মিলির মেয়ে এরিনা বেঁচে আছে। ওই গাড়িতে তখন ছিল না সে। এখানেই ওর জন্ম। ওকে পিয়ানো বাজানো শিখিয়েছিলাম আমি। খুব ভাল হাত ওর, আমার ছাত্রদের মধ্যে ওর মত কমই পেয়েছি। এখন তার বয়েস সাতাশ। আর বিয়ে-থা করেনি। আমার মতই এখন পিয়ানো বাজানো শিখিয়ে পেট চালায়। একটা মেয়ে আছে। নাম মলি।'

'পুরো নাম কি তার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'মানে, স্বামীর নাম কি ছিল?'

'কোথায় থাকে?' যোগ করল মুসা।

'স্বামীর নাম ছিল কলিনস। দুই কামরার একটা ফ্ল্যাটে থাকে এরিনা, কাছেই,

সাইক্যামোর রোডে।'

আনন্দে উজ্জ্বল হল কিশোর গোয়েন্দাদের মুখ।

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরিমাচ, স্যার,' কিশোর বলল। 'আপনাকে বলতে অসুবিধে নেই, জরুরি একটা ব্যাপারে তাকে খুঁজছি। একটা খুব দামি জিনিস আছে আমাদের কাছে, ওটার মালিক এখন মিসেস কলিনস।'

জিনিসটা কি জানতে চাইলেন না মিস্টার উইলিয়ামস। সত্যিই তিনি ভদ্রলোক। বললেন, 'শুনে খুশি হলাম। অনেক কষ্ট করে মেয়েটা। জিনিসটা পেলে সাহায্য হবে।'

'সাইক্যামোর রোডটা কোথায়, স্যার?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

এই সময় ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এক তরুণ। বয়েস আঠারো মত হবে। চমকে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল রাফিয়ান।

'আরে আরে, এত রাগ করার কিছুই নেই,' রাফিয়ানকে শান্ত করার জন্যে হাসলেন উইলিয়ামস। 'ও আমার নাতি, টনি। তোকে মারবে না।'

সবার সঙ্গে টনির পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার উইলিয়ামস। ওদেরকে সাইক্যামোর রোড দেখিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিল টনি। বলল, 'কাছেই। চলো, দেখিয়ে দিই।'

মিস্টার উইলিয়ামসকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। টনির সাথে চলল। ছেলেটাকে ভালই মনে হল ওদের, প্রচুর কথা বলে। বলল, 'তোমাদের কথা আমি শুনেছি। আমেরিকায় গিয়েছিলাম একবার, লস অ্যাঞ্জেলেসে। তোমরা তিন গোয়েন্দা, অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছ। পত্রিকায়ও অনেকবার উঠেছে তোমাদের নাম। শেষবার বোধহয় কয়েকটা জটিল ধাঁধার সমাধান করেছিলে, এক বুড়ো লোকের লুকিয়ে রেখে যাওয়া গুপ্তধন বের করেছিলে।'

'হ্যাঁ,' হেসে বলল মুসা। 'তোমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল।'

'অনেক নাম তোমাদের লস অ্যাঞ্জেলেসে। তোমাদের নাম আরও ছড়িয়েছেন বিখ্যাত ফিল্ম প্রডিউসার ডেভিস ক্রিস্টোফার। তাই না? তা, আমাদের শহরে বেড়াতে এসেছ বুঝি? ভাল। তোমাদেরকে সব রকমের সাহায্য করব আমি। যে-কোন দরকার হলেই আমাকে ডেকো। আমার বাবার গাড়ি আছে, আমাকেও চালাতে দেয়। কাগজ আছে? আমাদের টেলিফোন নাম্বার লিখে রাখো।' বলতে বলতে নিজেই মানিব্যাগ থেকে একটুকরো কাগজ বের করে ফোন নাম্বার লিখে দিল টনি।

কাগজটা পকেটে রাখল কিশোর।

এরিনা কলিনসের বাড়ি দেখিয়ে দিল টনি। নতুন বন্ধুকে ধন্যবাদ এবং গুডবাই জানিয়ে বাড়িটার দিকে এগোল ওরা। টনি ফিরে চলল তার দাদার বাসায়।

মিস মেয়ারবাল বা মিসেস ডিকেন্সের বাড়ির মত জমকালো নয় এই বাড়িটা। সাধারণ। সিঁড়ির গোড়ায় কাঠের বোর্ডে নামের তালিকা টাঙানো রয়েছে। তাতে দেখা গেল এরিনা কলিনস থাকে তিনতলায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল বাজাল।

জবাব এল না।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আবার বোতাম টিপল কিশোর। এবারও সাড়া নেই। আরেকবার টিপে নিশ্চিত হল সে, এরিনা বাড়িতে নেই।

'দূর!' নাকমুখ কুঁচকে মুসা বলল, 'আবার কাল আসতে হবে!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

একটা ব্যাপারে একমত হল সবাই, বিকেলটা মন্দ কাটেনি। বেশ উত্তেজনা গেছে। খুঁজতে হয়েছে বটে অনেক, তবে নেকলেসের আসল মালিককে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

বাসায় ফিরে এল ওরা। কেরিআন্টিকে জানাল সব। শুনে তিনিও খুশি হলেন।

সেরাতে সকাল সকাল শুতে গেল ছেলেমেয়েরা। সারাটা বিকেল অনেক পরিশ্রম করেছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা।

মাঝরাতে রাফিয়ানের চাপা ঘড়ঘড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল জিনার। তার বিছানার পাশেই শুয়ে ছিল কুকুরটা, উঠে দাঁড়িয়েছে।

'কি হয়েছে রে, রাফি!' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা।

সিটিং রুমের দরজার দিকে মুখ করে আছে রাফিয়ান। কান খাড়া।

মৃদু শব্দটা এবার জিনার কানেও এল। সিটিং রুমে নড়াচড়া করছে কেউ।

পাঁচ

মাথায় হাত রেখে রাফিয়ানকে শব্দ না করার ইঙ্গিত করল জিনা। তারপর পা টিপে টিপে এগোল সিটিং রুমের দিকে। ও জানে, ফ্ল্যাটে কোথাও না কোথাও বার্গলার অ্যালার্ম রয়েছেই, থাকে এসব বাড়িতে। তাহলে বেজে উঠছে না কেন? হয়ত অফ করা রয়েছে।

আস্তে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল জিনা। টর্চের আলো চোখে পড়ল। নড়ছে। আর ঠেকানো গেল না রাফিয়ানকে। চিৎকার করতে করতে গিয়ে ঢুকল সিটিং

রুমে। বিপদের পরোয়া না করে জিনাও ঢুকল ঘরে। চেঁচাতে লাগল, 'চোর! চোর!'

টাব চেয়ারটার কাছে ছিল লোকটা। টর্চের আলো নিচের দিকে, ফলে তার চেহারা দেখতে পেল না জিনা, শুধু আবছা একটা অবয়ব। রাফিয়ান চিৎকার করে উঠতেই ঝট করে সোজা হল সে, ফিরে তাকাল।

জিনার চোর চোর চিৎকার শুনে দিল জানালার দিকে দৌড়।

'রাফি! ধর ওকে! ধর ধর!' আবার চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

মস্ত জানালা, ফ্রেঞ্চ উইনডো। খোলা। ওটার দিকেই গেল লোকটা। সে জানালা ডিঙানোর আগেই পৌছে গেল রাফিয়ান। পা কামড়ে ধরতে গেল। দাঁত বসে গেল প্যান্টে, পায়ে লাগল না। ঝাড়া দিয়ে সেটা ছুটিয়ে নিয়ে একলাফে ব্যালকনিতে গিয়ে পড়ল লোকটা।

ইতিমধ্যে ছুটে এসেছে তিন গোয়েন্দা। মিস্টার পারকারেরও হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে।

জানালার কাছে ছুটে গেল কিশোর, তার পরপরই মুসা।

লোকটাকে দেখতে পেল না। অনুমান করল ওরা, নিশ্চয় লাফিয়ে পাশের বাড়ির ব্যালকনিতে গিয়ে পড়েছিল লোকটা, তারপর ফায়ার এসকেপ বেয়ে নেমে চলে গেছে।

কেরিআন্টি আর মিস্টার পারকারও সিটিং রুমে এসে ঢুকেছেন।

'চোরই,' জিনা বলল। 'চেহারা দেখিনি। কিন্তু আমি শিওর, ওই কোলাব্যাঙটাই, রবার্ট ম্যাকি। টাব চেয়ারটার ওপর ঝুঁকে খুঁজছিল।'

'নিশ্চয় নেকলেসটা,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ, ওটাই, আর কি খুঁজবে,' কিশোর বলল। 'ওই চেয়ারেই লুকানো আছে ওটা, আগে থেকেই জানে ব্যাটা।'

'এজন্যেই চেয়ার কেনার এত আগ্রহ ওর,' কেরিআন্টি বললেন।

'দেখ ছেলেরা,' বেশ একটু রুক্ষ স্বরেই বললেন মিস্টার পারকার। 'না জেনে অযথা কারও ওপর দোষ চাপানো ঠিক নয়। তার চেহারা দেখনি, কোন প্রমাণ নেই, ম্যাগিই যে এসেছিল কি করে বুঝলে?'

'যুক্তি দিয়ে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

'দেখ কিশোর, তোমার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। তবু, সব চেয়ে বুদ্ধিমান লোকটিও ভুল করে। তোমরা যা বলছ, পুলিশ সেটা বিশ্বাস না-ও করতে পারে। ওরা প্রমাণ চাইবে, সলিড প্রমাণ। চোর ঢুকেছিল, এটুকুই বলতে পারব, ব্যস। অ্যাটেমপ্‌ড্ টু বার্গলারি। পুলিশকে অবশ্যই জানাব কাল, তবে রবার্ট

ম্যাকিই এসেছিল, একথা বলব না।'

দ্রুত একবার সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে নিলেন কেরিআন্টি। জানালেন, সব ঠিকই আছে, কিছু চুরি যায়নি। জানালায় কিছু দাগ আবিষ্কার করল কিশোর, যেগুলো জোর করে খোলার ফলে হয়েছে। আর কোন সূত্র নেই। এ দিয়ে পুলিশ চোর ধরতে পারবে না যে, ভাল করেই বুঝল।

আবার শুতে গেল ছেলেমেয়েরা। জিনা, মুসা আর রবিন নিশ্চিত, রবার্ট ম্যাকিই এসেছিল। কিশোরের মনে কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেল। সত্যি ম্যাকি? অন্য কেউ না তো?

'পুলিশ কিছু করলে করুক না করলে নেই,' জিনা বলল। 'আমরাই এর বিহিত করব।'

'হুফ!' একমত হল রাফিয়ান।

'ভাগ্যিস,' রবিন বলল, 'আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম নেকলেসটা। নইলে আজ নিয়ে যেতোই। আমরা জানতেও পারতাম না ওটা ছিল, চুরি গেছে। আন্টি কোথায় রেখেছে ওটা, জিনা?'

'দেখলাম তো মা'র হাতব্যাগে রাখল। পরে সরিয়ে-টরিয়ে রেখেছে কিনা জানি না।'

পরদিন সকালে যথারীতি সম্মেলনে চললেন মিস্টার পারকার। বললেন, যাবার পথে পুলিশকে জানিয়ে যাবেন।

নাস্তার টেবিলে বসে চোর আসার ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালাল ছেলেময়েরা। কেরিআন্টি রান্নাঘরে ব্যস্ত।

'আমি এখনও বলছি,' জিনা বলল, 'রবার্ট ম্যাকিই এসেছিল।'

'আমি অতোটা শিওর না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'রাতে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। কিউরিও আর স্যুভনির বিক্রি করে ম্যাকি, ওসব জিনিসের খুব ভাল লাভ। অনেক সময় আসল দামের বহুগুণ। টাব চেয়ারটা কিনতে চাওয়ার কারণ সেটাও হতে পারে। যদি সে জানতোই, নেকলেসটা রয়েছে ওটার মধ্যে, তাহলে আরও আগেই হাতানোর চেষ্টা করল না কেন? আর সেদিন নিলাম ডাকার সময় এত কিসের দ্বিধা ছিল তার? একবারেই দুশো-তিনশো পাউণ্ড দাম হেঁকে নিয়ে নিতে পারত। আর রাতের বেলা লোকের ব্যালকনি থেকে লাফঝাঁপ করাও ঠিক মানায় না তাকে। পারবে বলে মনে হয় না।'

'তারমানে,' মুসা বলল, 'তুমি বলতে চাইছ, অন্য কেউ জানে নেকলেসটার কথা। কে সেই লোক?'

'ম্যাকিকে কিন্তু খুব একটা ভাল লোকও মনে হয় না,' রবিন বলল। 'সেটা

নিশ্চয় স্বীকার করবে, কিশোর? কাল রাতের চোর সে হতেও পারে।'

'সে-ই!' জোর দিয়ে বলল জিনা।

'সে নয়, একথা কিন্তু আমি বলছি না,' কিশোর বলল। 'আমি অন্যান্য সম্ভাবনার কথা বলছি। যুক্তি দিয়ে ঠিক মেলাতে পারছি না, এই আরকি। তাছাড়া প্রমাণ কোথায়?'

হাসল জিনা। 'নিজের ওপর খুব বেশি আস্থা তোমার, কিশোর পাশা। প্রমাণ চাও? দেখ,' বলতে বলতে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। টেনে বের করে বলল, 'এই দেখ।'

ভুরু কুঁচকে জিনিসটার দিকে তাকাল কিশোর। নীল রঙের একটুকরো কাপড়।

'কাল রাতে লোকটার প্যান্ট কামড়ে ধরেছিল রাফি,' জিনা বলল। 'ছিঁড়ে রেখে দিয়েছে। এটা প্রমাণ নয়? এতে লোকটার গায়ের গন্ধ লেগে আছে। লোকটাকে এখন সামনে পেলে চিনতে পারবে রাফি। ম্যাকির দোকানে ওকে নিয়ে যাব। ওকে দেখলেই রেগে যাবে রাফি, দেখ...'

'তাতেও কিছু প্রমাণ হয় না। রাফি ওকে দেখতে পারে না। রেগে তো যাবেই।'

'তবু, যাবই। নেকলেসটার কথা যদি জেনে থাকে সে, সহজে ক্ষান্ত হবে না।'

'কিন্তু ওখানে গেলেই বুঝে ফেলবে, আমরা তাকে সন্দেহ করছি,' যুক্তি দেখাল রবিন। 'তখন তার ওপর নজর রাখা কঠিন হয়ে যাবে আমাদের জন্যে।'

'ও আমাদেরকে ভালমত চেনে না। চেনে?' জিনা বলল। 'সেল-রুমে ভিড় ছিল। তাছাড়া মা'র সঙ্গেই কথা বলছিল সে, আমাদের দিকে বিশেষ নজর দেয়নি।'

'তা ঠিক,' মুসা বলল। 'কাল রাতেও আমাদেরকে দেখেনি। আমরা আসার আগেই পালিয়েছে।'

'আমাদের দেখেনি,' কিশোর মনে করিয়ে দিল। 'কিন্তু জিনাকে দেখেছে।'

'দেখলেও আবছাভাবে দেখেছে। আমি যেমন দেখেছি।'

'কিন্তু রাফি?' রবিন বলল। 'ওকে তো দেখেছে। শুধু দেখেইনি, দাঁতের আঁচড়ও খেয়েছে নিশ্চয়।'

'হুফ!' মাথা ঝাঁকাল রাফিয়ান।

চুপ হয়ে গেল জিনা। ভাবছে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। 'ঝুঁকি একটা নিতেই পারি আমরা। আমি আগে রাফিকে নিয়ে দোকানে ঢুকব, তোমরা বাইরে থাকবে। যদি আমাদের চিনেই ফেলে, সন্দেহ করে, এরপর থেকে আমি আর ওর

সামনে যাব না। তোমরা তখন নজর রাখবে। কাজেই নজর রাখার অসুবিধের কথা যে বলছ, তা হবে না।'

তর্ক করলে করতে পারত কিশোর, কিন্তু করল না। জিনার কথায় যুক্তি আছে অবশ্যই।

ঘন্টাখানেক পর রওনা হল ওরা। কাপড়টা সঙ্গে নিল জিনা। মিমোসা অ্যাভেন্যুতে পৌঁছে আলাদা হয়ে গেল ওরা। জিনা আর রাফিয়ান চলল আগে, ছেলেরা রইল পেছনে। ম্যাকির দোকানের কয়েক দোকান আগেই থেমে গেল তিন গোয়েন্দা।

পকেট থেকে কাপড়ের টুকরোটা বের করে ভালমত শোঁকাল রাফিয়ানকে জিনা। তারপর তাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল দোকানে।

দোকানেই রয়েছে ম্যাকি। জিনাকে দেখে তৈলাক্ত হাসি হেসে এগিয়ে এল। মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

কিন্তু জবাব দেয়ার সময় পেল না জিনা। রাতের অতিথিকে বোধহয় চিনে ফেলেছে রাফিয়ান। ঘেউ ঘেউ শুরু করল। ছুটে যেতে চাইছে জিনার হাত থেকে। লাফিয়ে গিয়ে ম্যাকির টুঁটি কামড়ে ধরতে চায়।

'এই, চুপ!' রাফিকে ধমক লাগাল জিনা। লোকটার দিকে চেয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বলল, 'সরি, এমন করছে কেন বুঝতে পারছি না। ওর স্বভাব খুব ভাল। সহজে কাউকে কামড়াতে যায় না।'

ভয় দেখা দিল লোকটার চোখে। সন্দেহে রূপ নিল সেটা। জিনা নিশ্চিত হয়ে গেল, ম্যাকিই গিয়েছিল রাতে। চিনে ফেলেছে রাফিয়ান, নইলে এত উত্তেজিত হত না। আর লোকটাও, বুঝে গেছে, এই কুকুরটাই তাকে কামড়াতে চেয়েছিল।

'যাও, বেরোও তোমার কুত্তা নিয়ে!' ধমকে উঠল ম্যাকি। 'জানোয়ার-টানোয়ার ঢুকতে দিই না দোকানে এজন্যেই!'

কিশোরের কথা না শুনে ভুল করেছে, বুঝতে পারল এতক্ষণে জিনা। হুঁশিয়ার হয়ে গেছে ম্যাকি। ভিড়ের মধ্যে দেখেছে বটে, কিন্তু দেখেছে তো, তিন গোয়েন্দাকেও চিনে রেখেছে কিনা কে জানে!

বন্ধুদের কাছে ফিরে এল সে।

খবর শুনে খুশি হল না কিশোর। সে আগেই আন্দাজ করেছে এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে। আরেকটা ব্যাপার জিনা খেয়াল করেনি, সে বেরোনোর পর পরই দোকান বন্ধ করে দিয়েছে ম্যাকি। দরজায় 'বন্ধ' নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে তার পিছু নিয়েছে। উল্টো দিক থেকে বইছে বাতাস, ফলে তার গন্ধ পায়নি রাফিয়ান। একটা গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে বসে এখন ওদের সব কথা শুনছে।

'ঠিক আছে, কিশোর,' হাত তুলে বলল জিনা, 'স্বীকার করছি, ওভাবে শত্রুর ঘরে ঢুকে ভুল করেছি। কিন্তু শিওর তো হওয়া গেল, নেকলেস চুরি করার জন্যে ওই লোকটাই এসেছিল কাল রাতে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এরিনা কলিনসের জিনিস তাকে পৌঁছে দেয়া দরকার।'

'এখুনি যাই না কেন তাহলে?' পরামর্শ দিল মুসা। 'গিয়ে তাকে জানাই খবরটা।'

'হ্যাঁ, যাওয়া যায়,' রবিন বলল। 'আজ বাসায় পেতেও পারি।'

সুতরাং আবার সাইক্যামোর রোডে চলল ওরা। বাড়িটার কাছে পৌঁছল। সদর দরজা দিয়ে ঢোকার সময় হঠাৎ কি মনে করে পেছন ফিরে তাকাল জিনা। 'এই!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'দেখেছি! ম্যাকিকে দেখলাম মোড়ের ওপাশে চলে যেতে!'

'দূর, কি যে বল না,' বিশ্বাস করল না মুসা। 'তোমার মাথায় এখন ম্যাকি ঢুকে রয়েছে তো, যেখানে যাও সেখানেই দেখ। এসো।'

এরিনা কলিনসকে পাওয়া গেল সেদিন। ঘন্টা শুনেই এসে দরজা খুলে দিল। বয়েস কম। লম্বা কালো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। পাশে তার ছোট্ট মেয়েটি, মলি। সুন্দর চেহারা, তবে নাকটা সামান্য বোঁচা, হাসিটা খুব মিষ্টি। বয়েস বছর ছয়েকের বেশি না।

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। বলল, জরুরি কথা আছে।

হাসল এরিনা। 'বেশি জরুরি?'

'হ্যাঁ।'

'এসো।' ছেলেমেয়েদেরকে ঘরে নিয়ে গেল এরিনা। 'বল।'

সব কথা খুলে বলতে লাগল ওরা। রাফির সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে মলির, খানিকক্ষণ পর সে-ও ওদের কথা শোনায় মনোযোগী হল, কৌতূহল জেগেছে।

'আশ্চর্য!' ছেলেদের কথা শেষ হলে বলল এরিনা। 'অবিশ্বাস্য!'

'কিন্তু সত্যি,' জিনা বলল। 'বিশ্বাস না হলে নাম্বার দিচ্ছি, ফোন করুন আমার মা'কে।'

টেলিফোনের কাছে উঠে গেল এরিনা। কথা বলল মিসেস পারকারের সঙ্গে। জানল, ছেলেমেয়েরা মিথ্যে বলেনি। খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল সে। মলিকে কোলে নিয়ে আদর করল, আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল তিন গোয়েন্দাকে, জিনাকে, এমনকি রাফিয়ানকেও।

'তোমাদেরকে বলতে অসুবিধে নেই,' এরিনা বলল, 'সময় খুব খারাপ যাচ্ছে আমার। পিয়ানো বাজানো শিখিয়ে আর কত আয় হয় বল। কোনমতে টেনেটুনে চলে আরকি মা-মেয়ের। মিস মেয়ারবাল মস্ত উপকার করে গেলেন আমাদের।'

'হারটা খুব দামি,' কিশোর বলল। 'গোলাপী মুক্তা দুর্লভ তো, দাম বেশি।'

'আর খুব সুন্দর,' রবিন বলল। 'দেখলে রেখে দিতে ইচ্ছে হবে আপনার।'

'কিন্তু ইচ্ছে করলেও রাখতে পারব না,' এরিনা বলল, 'কারণ আমার টাকা দরকার। তাছাড়া মিসেস পারকার একটা ভাল পরামর্শ দিলেন, বললেন, সাথে সাথে যেন বিক্রি করে টাকাটা ক্যাশ করে ফেলি। রেখে দিলে বিপদ হতে পারে। চোরের উপদ্রব নাকি শুরু হয়েছে। খোয়া যেতে পারে।

'হ্যাঁ, পারে,' জিনা বলল। 'চলুন আমাদের সঙ্গে। এখুনি নিয়ে নেবেন।'

খানিকটা মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতেই যেন হাসল এরিনা। 'যেতে পারলে তো ভালই হত। কিন্তু সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে। ছাত্রিরা আসবে। আজ ডেট আছে অনেকের। কাল হয়ত যেতে পারব।' একমুহূর্ত থামল সে। 'এতই অবাক হয়েছি কথাটা শুনে, তোমার মা'কে ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেছি, জিনা। লাইনটা লাগাও না আরেকবার।'

ডায়াল করল জিনা। সাথে সাথেই ধরলেন মা। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে এরিনা বলল কাল সে আসছে, মিসেস পারকারের কোন অসুবিধে হবে কিনা। হবে না, তিনি জানালেন। বলে দিলেন সারা সকাল বাসায়ই থাকবেন। ঠিক হল, দশটা নাগাদ যাবে এরিনা।

ফোন রেখে দিয়ে এরিনা বলল, 'তাহলে কাল আবার দেখা হচ্ছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে, অনেক কষ্ট করেছ আমার জন্যে।'

'কাল দেখা হবে!' অনেকটা মায়ের মত করেই বলল মলি। রাফিকে ছাড়তে চাইছে না সে। ভীষণ পছন্দ করে ফেলেছে কুকুরটাকে। আর রাফিও বাচ্চা পছন্দ করে, সহজেই মন জয় করে নিতে পারে ওদের।

পরদিন সকালে মস্ত জানালার কাছে বসে পথের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেমেয়েরা।

'ওই যে, আসছে,' হঠাৎ বলে উঠল ওরা। 'মা-মেয়ে দু'জনেই। নিশ্চয় বাসে এসেছে। বাস থেকে নেমে হেঁটে আসছে।'

'মেয়েটা সুন্দর, না?' রবিন বলল।

মাথা ঝাঁকাল জিনা আর মুসা।

কিশোর বলল, 'যাই, আন্টিকে খবরটা দিই।'

কিশোরের সঙ্গে জানালার কাছ থেকে সরে এল রবিন আর মুসা, কিন্তু জিনা বসেই রইল। একটা লোক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার।

পথের মোড়ে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাকিয়ে আছে এরিনার দিকে। জিনার মনে হল, মা-মেয়েকে অনুসরণ করে এসেছে লোকটা।

'ভুলও হতে পারে আমার,' বিড়বিড় করল সে। 'দূর থেকে ঠিক চিনতে পারছি না···।' এগোল লোকটা। 'আরি! এ তো রবার্ট ম্যাকি! এই রাফি, দেখ দেখ!'

জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দেখল রাফিয়ান। চাপা গরগর করে উঠল।

'কাপড় কি পরেছে দেখেছিস! যেন একটা কাকতাড়ুয়া পুতুল। লম্বা ওভারকোট, কলার তুলে দেয়া, হ্যাট টেনে নামিয়েছে কপালের ওপর···ভেবেছে আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে। হুঁহ! ভালই ছদ্মবেশ নিয়েছে ব্যাটা!'

'হুফ!' যেন একমত হল রাফিয়ান।

'চল, ওদেরকে গিয়ে বলি।' তিন গোয়েন্দাকে রান্নাঘরে পেল জিনা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'এই, গণ্ডগোল হয়েছে! রবার্ট ম্যাকি এরিনা কলিনসের পিছু নিয়েছে। চলে এসেছে এখানে।'

ছয়

'আবার কল্পনা করছ তুমি,' মুসা বলল। 'ও কিভাবে জানবে···?'

ঘন্টার শব্দে থেমে গেল সে।

দরজা খুলে দিতে ঘরে ঢুকল এরিনা আর মলি। গিয়ে ওদেরকে এগিয়ে আনলেন কেরিআন্টি। কুশল বিনিময় করলেন। তারপর ওদেরকে বসতে দিয়ে চলে গেলেন শোবার ঘরে। নীল বাক্সটা বের করে এনে তুলে দিলেন এরিনার হাতে। কাঁপা কাঁপা হাতে ঢাকনা খুলল সে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুক্তাগুলোর দিকে।

অনেকক্ষণ পর কথা ফুটল তার মুখে, 'অপূর্ব! বড়দিনের উপহারই আমি ধরে নেব এটাকে···দাম নিশ্চয় অনেক, তাই না?'

'তা তো নিশ্চয়,' হেসে বলল কেরিআন্টি। 'যাআক, বাপ্পু, যার জিনিস তার হাতে তুলে দিয়ে আমি বাঁচলাম। কি টেনশনেই না ছিলাম।'

'টেনশন তো হবেই। এটার পেছনে লোক লেগেছে জানেন যে,' মুসা বলল। 'মিসেস কলিনস, রাতে চোর ঢুকেছিল এ-বাড়িতে। জিনা আর রাফি ওকে তাড়িয়েছে।'

'তাই নাকি?' অস্বস্তি দেখা দিল এরিনার চোখে। 'এই হারের জন্যেই এসেছিল?'

'তাই তো মনে হয়। আর কিসের জন্যে আসবে?' ব্যাপারটা খুলে বলল মুসা। চোর কোনখান দিয়ে ঢুকল, কিভাবে চেয়ার হাতড়াল, তারপর কিভাবে তাড়া খেয়ে পালাল, সব।

'আমি জানি চোরটা কে?' বলে উঠল জিনা। 'রবার্ট ম্যাকি।'

'জিনা, না জেনে কারও সম্পর্কে ওভাবে কথা বলা ঠিক না,' বেশ একটু কড়া গলায়ই মেয়েকে বললেন মিসেস পারকার।

'মা, না জেনে বলছি না,' রেগে উঠল জিনা। 'এইমাত্র দেখে এলাম লোক-টাকে, রাস্তায়। ছদ্মবেশে মিসেস কলিনসের পিছু পিছু এসেছে।'

'তোমার কল্পনা,' আগের কথাই বলল আবার মুসা। 'ও কিভাবে জানবে মিসেস কলিনস কোথায় যাচ্ছেন?'

'তা বলতে পারব না,' হাত ওল্টাল জিনা। 'তবে আমাদেরকে ওখানে যেতে দেখেছে, এখন আমি শিওর, কাল ওকেই দেখেছিলাম। তারপর নিশ্চয় ও-বাড়ির ওপর চোখ রেখেছে। মিসেস কলিনস বেরোতেই তাঁর পিছু নিয়েছে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল এরিনার মুখ। 'তাহলে ভুল দেখিনি আমি!'

'ভুল দেখেননি মানে?' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর।

'আমি···ইয়ে, মানে···লম্বা ওভারকোট পরা একটা লোককে দেখেছি, বাড়ি থেকে বেরিয়ে···পিছে পিছে এল, একই বাসে চড়ল, একই স্টপেজে নামল···চেহারা দেখতে পারিনি।'

মুহূর্ত দেরি করল না আর মুসা। দৌড় দিল জানালার দিকে। কিশোর গেল পিছে। ব্যালকনিতে বেরিয়ে ভালমত চোখ বোলালো রাস্তায়। কিন্তু লোকটাকে চোখে পড়ল না।

রবিন এসে দাঁড়াল পাশে।

'কেউ নেই,' তার দিকে ফিরে বলল কিশোর। আবার সিটিং রুমে ফিরে এল তিনজনে।

'চলে গেছে লোকটা,' মুসা বলল। 'ইচ্ছে করে পিছু নেয়নি। এদিকেই আসছিল হয়ত কোন কাজে।'

'এখন তা আর মনে হয় না আমার,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'মিসেস কলিনসকেই অনুসরণ করেছে সে। জিনা কাল দেখেছে, আজও দেখেছে। মিসেস কলিনসও দেখেছেন। চোখের ভুল আর বলা যাবে না।'

'ব্যাটা লুকিয়ে পড়ল নাকি কোথাও?' মুসা বলল। 'বেরিয়ে দেখব?'

'না না, দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়লেন কেরিআন্টি। 'লোকটা খারাপ। শেষে কি করে বসে!'

'শুনুন,' এরিনাকে বলল কিশোর, 'এখন যত তাড়াতাড়ি পারেন, গিয়ে হারটা কোন ব্যাংকের ভল্টে রেখে দিন।'

'তাই করতে হবে। আমি যেখানে থাকি তার কাছেই একটা ব্যাংক আছে।'

'তাহলে সোজা ওখানে চলে যান। একা যেতে পারবেন তো? নাকি আমরা আসব আপনার সাথে? বলা যায় না, আপনাকে একা দেখলে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে ম্যাকি। লোক বেশি দেখলে সাহস করবে না।'

'এলে তো ভালই হয়,' খুশি হয়ে বলল এরিনা। 'তবে মিসেস পারকার যদি অনুমতি দেন।'

'গেলে যাক,' আন্টি বললেন। 'তবে মনে হয় না কোন দরকার আছে।' হাসলেন তিনি। 'ট্রেনে করে যান, তাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। তাছাড়া হারটা যে আপনার কাছে আছে, তা-ও জানছে না কেউ। বিপদ ঘটবে কেন?'

বাক্সটা ব্যাগে ভরল এরিনা। মিসেস পারকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ওদের সঙ্গে চলল তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ান। রাস্তায় বেরিয়ে লোকটাকে খুঁজল ওরা। কোথাও দেখা গেল না ম্যাকিকে।

পাতালরেলের একটা স্টেশন রয়েছে কাছেই। সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল ওরা। রাফিয়ানকে এবারও ঝুড়িতে ভরে নেয়া হচ্ছে, তবে এটা আগেরবারের মত আর ফোকর কাটা নয়। তাতে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি। ওই ঝামেলা পোহাতে আর রাজি নয় কেউ।

ট্রেন আসার অপেক্ষায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। উৎকণ্ঠায় ভুগছে এরিনা, কখন ব্যাংকে গিয়ে বাক্সটা রাখবে, তারপর নিশ্চিন্ত। তার আশেপাশে গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে ছেলেমেয়েরা, বডিগার্ডের মত। মলির হাত ধরে রেখেছে রবিন। রাফিয়ানের ঝুড়ি মাটিতে নামানো।

ট্রেন এল। হাতে ব্যাগ আঁকড়ে ধরে প্ল্যাটফর্মের একেবারে কিনারে চলে এসেছে এরিনা। হঠাৎ পেছন থেকে ধেয়ে এল একটা লোক, এক থাবায় তার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে, ধাক্কা মেরে তাকে প্রায় ফেলে দৌড় দিল। দু'দিক থেকে এরিনাকে ধরে ফেলল কিশোর আর মুসা, নইলে আরেকটু হলেই চলে যেত ট্রেনের চাকার নিচে।

যাত্রী নামছে, উঠছে, এই হুড়াহুড়ির মাঝে বেরোনোর পথের দিকে দৌড় দিল লোকটা। বেশির ভাগ মানুষই খেয়াল করল না ঘটনাটা, ট্রেনে উঠতেই ব্যস্ত ওরা। ঝুড়ির মুখ খুলে দিল জিনা। তাড়া করল লোকটাকে রাফিয়ান। পেছনে ছুটল মুসা।

দেখে মনে হয় ভবঘুরে ধরনের লোক, বুড়ো, রাফিয়ান তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই চিৎকার করে উঠল। পরমুহূর্তে তাকে ধরে ফেলল মুসা। কেড়ে নিল ব্যাগটা।

ডান হাতকে যেন বর্ম বানিয়ে মুখ আড়াল করতে চাইছে আতঙ্কিত লোকটা,

বাঁ হাত কামড়ে ধরে ঝুলছে রাফিয়ান। এই সময় বেরিয়ে এল স্টেশনের একজন কর্মচারী। রাফিয়ানের কলার টেনে তাকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'সর, সর বলছি! শয়তান কুত্তা! মানুষ দেখলেই কামড়াতে ইচ্ছে করে?' মুসার দিকে তাকাল সে। 'তোমার কুকুর, না? দাঁড়াও, মজা বুঝবে। লোকের ওপর কুত্তা লেলিয়ে দাও...'

বোঝানোর চেষ্টা করল মুসা। শুনলই না লোকটা। হ্যাঁচকা টান মারল রাফিয়ানের কলার ধরে। সুযোগটা কাজে লাগাল ভবঘুরে। চোখের পলকে ছুটে গিয়ে মিশে গেল লোকের ভিড়ে। হারিয়ে গেল।

'এই ছেলে, কি বলছি শুনছ?' রেগে গিয়ে বলল কর্মচারী।

এই সময় ওখানে এসে দাঁড়াল কিশোর, রবিন, জিনা। মেয়ের হাত ধরে এল এরিনা। এখনও কাঁপছে। মলির চোখে পানি।

'আমার কুকুর ধরেছেন কেন! ছাড়ুন!' রাগে চিৎকার করে উঠল জিনা। 'চোখের মাথা খেয়েছেন নাকি? দেখলেন না চোর ধরেছিল ও!'

'হ্যাঁ, ও-লোকটা আমার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল,' এরিনা বলল। 'আরেকটু হলেই দিয়েছিল আমাকে ট্রেনের নিচে ফেলে। ছেলেময়েগুলো না থাকলে...কুকুরটা না থাকলে...,' শিউরে উঠল সে, কথা শেষ করতে পারল না।

মুসার কথা কানে না তুললেও এরিনার কথা বিশ্বাস করল কর্মচারী। ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। প্রায় তোতলাতে শুরু করল, 'তা-তাই নাকি, ম্যা'ম! আ-আমি কি করে জানব, বলুন...'

তাগাদা দিল কিশোর, 'এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করে লাভ নেই। জলদি চলুন, আগে গিয়ে ব্যাংকে রাখুন বাক্সটা। তারপর নিরাপদ।'

আবার ঝুড়িতে ঢোকানো হল রাফিয়ানকে। ট্রেন চলে গেছে। পরের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে হল ওদের।

ট্রেনে কেউ আর কোন কথা বলল না। গন্তব্যে পৌঁছে বাইরে বেরোলো খুব সাবধানে। কিন্তু কাছেপিঠে সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়ল না।

'কুইক!' এরিনা বলল। 'পাশের স্ট্রীটেই আমার ব্যাংক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন,' জিনা বলল। 'আগে ব্যাংকে রাখুন হারটা। তারপর ম্যাকির ব্যবস্থা করছি।'

'ম্যাকি!' আঁতকে উঠল এরিনা। 'বুড়োটাই ম্যাকি নাকি?'

'নিশ্চয়ই! ভবঘুরের ছদ্মবেশ নিয়েছে বটে, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।'

'তারমানে,' রবিন বলল, 'বাড়ি থেকে বেরোনোর পরই আমাদের পিছু নিয়েছে

সে?'

'আমার তাই মনে হয়,' কিশোর বলল। 'পথের ধারে একটা খবরের কাগজের দোকান আছে না, তার আড়ালেই বোধহয় লুকিয়েছিল। পোশাক-আশাক খুব একটা বদল করতে হয়নি। হ্যাটটা মুচড়ে নষ্ট করেছে। হাতে, মুখে আর কোটে ধুলো লাগিয়েছে, যাতে মনে হয় নোংরা ভবঘুরে। সে ভেবেছিল মিসেস কলিনস একলা আসবেন, তাঁকে ফাঁকি দিতে অসুবিধে হবে না।'

'ধরেই তো ফেলেছিলাম,' মুসা বলল। 'স্টেশনের ওই বলদ কর্মচারীটার জন্যেই পারলাম না। নইলে এতক্ষণে হাজতে ঢুকে যেত ম্যাকির বাচ্চা।'

'তা ঠিক,' একমত হয়ে মাথা দোলাল রবিন।

'ওই যে ব্যাংক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এরিনা। 'তোমরা মলিকে দেখ। আমি গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করে ফেলছি। লবিতে থেকো।'

খানিক পরে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এল এরিনা।

'সব ভাল যার শেষ ভাল,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল জিনা। হাসল। 'যাক, বাঁচা গেল।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'হার পেলাম, দলিল পেলাম, মালিককেও খুঁজে বের করলাম। থ্রি চিয়ার্স ফর তিন গোয়েন্দা...'

'আমি আর রাফি বাদ নাকি!' কোমরে হাত দিয়ে, চোখ পাকিয়ে জিনা বলল।

হেসে উঠল সবাই।

ওঁরা মনে করেছিল, এখানেই এই ঘটনার ইতি। কিন্তু পরদিন সকালে অযাচিত ভাবে এল এরিনার ফোন। মা তখন বাড়ি নেই, ফোন ধরল জিনা।

'হ্যালো?' শোনা গেল এরিনার উত্তেজিত কণ্ঠ, 'কে, জিনা?...সর্বনাশ... সর্বনাশ হয়ে গেছে...'

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জিনা।

'আজ সকালে একটা উড়ো চিঠি এসে হাজির। দরজার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে রেখে গেছে। আমাকে হুমকি দিয়ে লিখেছে...বুঝতে পারছি না কি করব!'

মেরুদণ্ডে শিরশিরে অনুভূতি হল জিনার। 'শান্ত হোন,' বলল সে, যদিও নিজেও শান্ত থাকতে পারছে না। 'কি লিখেছে?'

'লিখেছে...লিখেছে, হারটা যদি না দিই, মলিকে কিডন্যাপ করবে!'

'কী-করবে!'

'কিডন্যাপ! জিনা, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। মলির চেয়ে হারটা বেশি নয়। যা বলছে করব, দিয়ে দেব ওটা।'

'দাঁড়ান,' ফোনে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিনা, 'এক মিনিট ধরুন! কিশোরকে বলছি…'

পাশের ঘরে ছিল তিন গোয়েন্দা। ডাক শুনে এসে ঢুকল। দ্রুত ওদেরকে সব কথা জানাল জিনা।

'ব্যাটা তো মহা পাজী! নিশ্চয়…'

'ম্যাকি,' কিশোরের কথাটা শেষ করে দিল জিনা। 'কিশোর, কি করব? পুলিশকে জানাব?'

'দেখি, দাও আমার কাছে,' জিনার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর। 'মিসেস কলিনস, শুনছেন? হারটা এখুনি দেবেন না। পুলিশকে জানাচ্ছি আমরা। আপনাদের অসুবিধে হবে না। নিশ্চয় ব্যবস্থা করবে পুলিশ।'

'না না, কিশোর,' তাড়াতাড়ি বলল এরিনা, 'লোকটা পুলিশকে জানাতে মানা করেছে। মলিকে পাহারা দিতে আসবে পুলিশ, ছদ্মবেশে এলেও ঠিক চিনে ফেলবে ম্যাকি। পুলিশ তো আর সারাজীবন পাহারা দেবে না। ওরা চলে গেলেই আবার বিপদে পড়বে আমার মেয়ে।'

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। কি করবে? আরেকবার বোঝানোর চেষ্টা করল এরিনাকে, 'ভালমত ভেবে দেখুন। লোকটা হুমকি দিল, আর অমনি হার দিয়ে দেবেন?'

'কি করব, বল? লোকটা বেপরোয়া, কাল স্টেশনেই বুঝেছি। তার কথা না শুনলে যা বলছে তা করবেই। কাউকে জানাতে বারণ করেছে, তা-ও তো তোমাদের জানিয়ে ফেললাম। খুব ভয় লাগছে আমার…' এক মুহূর্ত থামল এরিনা, তারপর বলল, 'আমি মনস্থির করে ফেলেছি। ব্যাংকে গিয়ে হারটা নিয়ে লোকটা যেখানে দেখা করতে বলেছে সেখানে চলে যাব। হারের দরকার নেই আমার। মেয়ে ভাল থাকলেই ভাল।'

মহিলাকে কিছুতেই বোঝাতে না পেরে কিশোর বলল, 'দেখুন, বলে যখন ফেলেছেন আমাদেরকে, এরকম একটা অন্যায় কিছুতেই ঘটতে দিতে পারি না। আপনি জানাতে না চান, জানাবেন না, কিন্তু আমরা পুলিশকে বলবই।'

'না না, দোহাই তোমাদের!' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল এরিনা, 'ওকাজ কোরো না। পুলিশ বিশ্বাস করবে না তোমাদের কথা। শুধু একটা উড়ো চিঠি, আর কোন প্রমাণ নেই লোকটার বিরুদ্ধে। হেসেই উড়িয়ে দেবে পুলিশ, মাঝখান থেকে বিপদে পড়বে আমার মলি। বুঝি, আমার ভালই চাইছ তোমরা। থ্যাঙ্ক ইউ।'

এরিনা রিসিভার রেখে দেবে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'মিসেস কলিনস, শুনুন। বেশ, পুলিশকে নাহয় জানালাম না। কিন্তু চিঠিতে কি লিখেছে

আমাদেরকে খুলে বলতে তো আপত্তি নেই। কোথায় দেখা করতে বলা হয়েছে আপনাকে?'

'ওসব কিছু বলব না তোমাদেরকে। জানিয়েই ভুল করে ফেলেছি,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল এরিনা। 'থ্যাঙ্ক ইউ। রাখি। গুডবাই।'

কেটে গেল লাইন।

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। চিন্তিত। বলল, 'কিছু একটা করতেই হবে আমাদের। ভয় দেখিয়ে হার নিয়ে যাবে ম্যাকি, আর আমরা চুপ করে বসে থাকব, হতেই পারে না। চল, ব্যাংকের বাইরে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। এরিনার ওপর নজর রাখব। তারপর তার পিছু নিয়ে দেখব কোথায় যায়।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন তুলল রবিন। 'এরিনা নিশ্চয় এতক্ষণে ব্যাংকে রওনা হয়ে গেছে। তার ফ্ল্যাট থেকে ব্যাংকটা কাছে, এখান থেকে অনেক দূরে। গিয়ে ধরতে পারব না।'

'হয়ত পারব,' বলতে বলতে পকেট থেকে নোটবুক বের করল কিশোর। পাতা উল্টে বের করল টনির ফোন নাম্বার—কাগজের টুকরোটা থেকে পরে লিখে নিয়েছিল নোটবুকে। দ্রুত গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল সে।

সাত

পাওয়া গেল টনিকে। কিশোরকে ঘিরে এল সবাই।

'টনি,' কিশোর বলল, 'আমি কিশোর পাশা, তোমার দাদার বাসায় দেখা হয়েছিল, মনে আছে? শোনো, তোমার সাহায্য দরকার। গাড়িটা নিয়ে আসতে পারবে? দশ মিনিটের মধ্যে?...গুড। খুব জরুরি।...এলে সব বলব।' ঠিকানা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। বন্ধুদেরকে জানাল, 'আসছে। হয়ত ধরতে পারব এরিনাকে। মলিকে কারও কাছে রেখে আসতে হবে তার, তাতে সময় লাগবে। ব্যাংকে গিয়ে জিনিসটা বের করতেও কিছু সময় লাগবে। আশা করছি, ততোক্ষণে চলে যেতে পারব আমরা।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ঠিক দশ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল টনি। 'ওঠো ওঠো, জলদি!'

গাড়িটা বড় না, কিন্তু জায়গা হয়ে গেল সকলের।

'কোথায় যেতে হবে?' জানতে চাইল টনি।

বলল কিশোর।

দ্রুত ছুটল গাড়ি। ভাল চালায় টনি। রাস্তাও সব চেনা। শর্টকাটে চলল সে।

তবুও গোয়েন্দাদের মনে হল, বড় আস্তে চলছে গাড়ি। লাফ দিয়ে দিয়ে এগোচ্ছে যেন ঘড়ির কাঁটা। টনিকে সব খুলে বলল কিশোর।

'ব্যাংক থেকে বেরিয়েই গেল কিনা,' পেছনের সিট থেকে বলল উদ্বিগ্ন জিনা, 'কে জানে!'

সময়মতই পৌঁছল ওরা। সবে ব্যাংকের দরজার বাইরে পা রেখেছে এরিনা। হাতে সেই ব্যাগটা, নিশ্চয় ওটার ভেতরেই রেখেছে হারের বাক্স।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে চত্বর পেরোল সে। রাস্তায় উঠে হনহন করে হাঁটতে লাগল। একবারও পেছনে তাকাল না।

'আমি ভেবেছিলাম ট্যাক্সি নেবে,' মুসা বলল।

'নেয়নি যখন,' কিশোর বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে, বেশি দূরে যাবে না। নামো নামো, হেঁটে যাব আমরাও।'

গাড়ি থেকে বেরোল গোয়েন্দারা। টনিও নামল।

'একসাথে থাকা ঠিক হবে না,' কিশোর বলল। 'চোখে পড়ার ভয় আছে। টনি, তুমি আগে আগে থাক। তোমাকে চেনে না এরিনা। দেখে ফেললেও সন্দেহ করবে না।'

ডানে মোড় নিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেল এরিনা।। দ্বিধা করল একমুহূর্ত। তারপর ফিরে তাকাল। তবে টনিকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না সে। কিশোরের অনুমান ঠিক, টনিকে চিনতে পারল না সে।

নিশ্চিন্ত হয়েই যেন আবার দ্রুত হাঁটতে লাগল এরিনা। তারপর একসময় গতি কমিয়ে দিল। সময় এসে গেছে, বুঝল গোয়েন্দারা।

বেশ দূরে রয়েছে ওরা। তবু দেখতে পাচ্ছে, রাস্তার লোকের নজর নেই এরিনার দিকে। যে যার পথে চলেছে। তারমানে, ম্যাকি ওদের মাঝে নেই।

চলার গতি আরও কমালো এরিনা। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। লোকটাকে খুঁজছে? নাকি অন্য কিছু?

হঠাৎ যেন মনস্থির করে ফেলল এরিনা। বাঁ বগলের তলায় ছিল ব্যাগটা, ডান হাতে নিল। তারপর ছুঁড়ে দিল পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির দিকে।

গাড়ির সামনের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল ব্যাগটা।

মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা।

ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়েই চলার গতি আবার বাড়িয়ে দিল এরিনা।

সবাইকে আসতে বলে দৌড় দিল কিশোর। টনি আগেই দৌড়াতে শুরু করেছে। চোখের পলকে তার পাশে চলে গেল রাফিয়ান। অবাক হয়ে পথচারীরা তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

এত তাড়াহুড়ো করেও লাভ হল না।

ইঞ্জিন চালুই ছিল গাড়িটার। রাস্তায় উঠেই ছুটতে শুরু করল।

থমকে দাঁড়াল কিশোর আর টনি দু'জনেই। রাফিয়ান দাঁড়াল না। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল গাড়িটার ওপর। লাভ কিছুই হল না, শুধু তার নখের সামান্য আঁচড় লাগল গাড়ির বডিতে।

দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল গাড়িটা।

চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছে এরিনা। ফিরে তাকিয়ে গোয়েন্দাদের দেখে অবাক। চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে খুঁজে বের করলে কিভাবে?'

জানাল কিশোর।

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এরিনার। 'সর্বনাশ! ও তোমাদেরকে নিশ্চয় দেখেছে...'

'দেখুক,' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। 'ধরতে পারলে হত আজ! ব্যাটাকে...'

'মলিকে না আবার ধরে নিয়ে যায়...'

'হারটা তো দিয়েই দিয়েছেন,' বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল জিনা। 'তাহলে আর নেবে কেন? অযথাই কষ্ট করলাম আমরা, মিসেস কলিনস। জিনিসটা দিলাম আপনাকে, কিন্তু রাখতে পারলেন না।'

'হার গেছে যাক। আমার মলির কিছু না হলেই হয়।'

'ব্যাটা পালাল!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে আনমনে বলল কিশোর।

'ও-ই জিতল শেষ পর্যন্ত!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন।

'ভুল হয়ে গেছে,' মুখ কালো করে বলল টনি। 'ট্যাক্সিতে করে পিছু নিতাম, সেটাই ভাল হত।'

টনির সঙ্গে এরিনার পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর।

সামলে নিয়েছে এরিনা। সবাইকে ধন্যবাদ দিল। মাথা চাপড়ে দিল রাফিয়ানের। বলল, 'দেখ, কিছু মনে কোরো না তোমরা। অনেক কষ্ট করেছ আমার জন্যে। কপাল খারাপ, রাখতে পারলাম না জিনিসটা।'

এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় কিশোর পাশা। 'ড্রাইভারের চেহারা দেখেছেন?'

'না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি...'

'হুঁ, আমরাই দেরি করে ফেলেছি!' মুঠো শক্ত হয়ে গেল মুসার।

আর কিশোর মনে মনে নিজেকে গালমন্দ করছে। কেন একবারও ভাবেনি, গাড়িতে করে আসতে পারে লোকটা?

আবার ফিরে এসে টনির গাড়িতে উঠল ওরা। এরিনারও জায়গা হয়ে গেল।

তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাবটা টনিই দিয়েছে।

এক পড়শীর কাছে মলিকে রেখে এসেছে এরিনা। বাসার সামনে গাড়ি থামলে আরেকবার সবাইকে ধন্যবাদ জানাল সে। নামল। বলল, 'হারটা গেছে, যাক, কিন্তু ওটার বদৌলতে তোমাদের মত বন্ধু পেয়েছি। এটাই আমার অনেক বড় পাওয়া।'

এরিনা চলে গেলে টনি বলল, 'চল, তোমাদেরকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।' গাড়ি চলছে। খানিক পর আবার বলল, 'চোরটা তাহলে পালালই শেষতক।'

'পালিয়ে যাবে কোথায়?' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। চোরটা যদি ম্যাকি হয়ে থাকে, ধরা তাকে পড়তেই হবে।'

'যদি না হয়?' রবিন বলল।

'ওই ব্যাটাই,' ফুঁসে উঠল জিনা। 'এরিনার কাছে হার আছে, এই খবর একমাত্র ওই শয়তানটাই জানে। হারটা ফিরিয়ে আনতেই হবে।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন রাখল মুসা।

'হ্যাঁ, কিভাবে?' টনিও জানতে চাইল। 'ম্যাকির বাড়িতে গিয়ে খুঁজবে নাকি?'

'অনেকটা সেরকমই,' জবাব দিল কিশোর।

'তোমার সাহস আছে, কিশোর পাশা,' টনি বলল। 'বাঘের গুহায় গিয়ে ঢুকতে চাইছ। লোকটা ভারি বদ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে লোক কিডন্যাপ করার হুমকি দিতে পারে···যাকগে। যখন যাও, আমাকে ডেকো···ওই যে, তোমাদের বাসায় এসে গেছি।'

লাঞ্চের পর হাঁটতে বেরোল গোয়েন্দারা। চলে এল স্কোয়্যারটার পাশের পার্কে। চমৎকার রোদ। এক কোণে একটা ঝাড়ের কাছে বসে আলোচনা শুরু করল ওরা।

'ম্যাকির দোকানের ওপর চোখ রাখতে হবে,' কিশোর বলল। খদ্দের ছাড়া আর কে কে আসে দোকানে, জানতে হবে। দরকার হলে ওর পিছু নেব। হারটা নিয়ে গিয়ে তো আর বসে থাকবে না, বিক্রি করতে হবে।'

'যদি টাকা চায়,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, যদি টাকা চায়,' বলল মুসা। 'কিশোর, শুধু দোকানের ওপর চোখ রেখে যে লাভ হবে না, সেটা ভাল করেই জানো তুমি। অন্য কোন মতলব করেছ। সেটা কি, বলবে?'

'দোকানে ঢোকার চেষ্টা করব।'

'মানে?'

'ভেতরে ঢুকে না খুঁজেলে কিভাবে জানব কোথায় রেখেছে হারটা?'

'কিন্তু আমাদেরকে এখন চেনে সে। দরজা থেকেই তাড়াবে।'

'সে-জন্যেই তো না দেখিয়ে ঢুকব। চুরি করে।' মুচকি হাসল কিশোর। 'চুরি করে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পেরেছে সে, আমরা কেন পারব না? তেমন বুঝলে রাতের বেলাই ঢুকব।'

ভ্রূকুটি করল জিনা। 'না, কিশোর, মা রাতে বেরোতে দেবে না। আর যদি দেয়ও—জানতে চাইবে কোথায় যাচ্ছি।'

'তা তো চাইবেনই। সে-জন্যেই তো কাজে নামার আগে আলোচনা করতে চাইছি ভালমত। রাতে গিয়ে সুবিধে হবে কিনা সেকথাও ভাবতে হবে। কারণ, রাতের বেলা দোকান তালা দেয়া থাকবে।' নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটল কিশোর। 'ম্যাকি কোথায় থাকে জানি না। দোকান কখন বন্ধ করে তাও জানি না। আসলে, ওর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না আমরা। জানতে হলে নজর রাখতে হবে ওর ওপর।'

নজর রাখার ব্যাপারে কারোই অমত নেই।

পরের তিন দিন তা-ই করল ওরা। পালা করে দাঁড়িয়ে চোখ রাখল ম্যাকির দোকানের ওপর। জানা হয়ে গেল অনেক তথ্য।

'পাঁচটায় দোকান বন্ধ করে,' রবিন জানাল।

'বিক্রি বন্ধ করে আরকি,' মুসা বলল। 'বেরোয় ছ'টার সময়।'

'ওই এক ঘন্টা হিসেব-নিকেশ করে,' বলল জিনা। 'এখানে ওখানে ফোন করে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি।'

'তারপর ছ'টার সময় বেরিয়ে, একটা রেস্টুরেন্টে যায়,' কিশোর বলল, 'খাওয়ার জন্যে। থাকে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায়। অনেক কিছুই জানলাম। এখন কাজ শুরু করা যেতে পারে...'

পরিকল্পনার কথা বন্ধুদের জানাল সে। দোকান বন্ধ হওয়ার আগেই ঢুকে পড়তে চায় ওখানে, লুকিয়ে বসে থাকতে চায় কোথাও। তারপর ম্যাকি বেরিয়ে গেলে খুঁজবে হারটা। মুখ খুলতে যাচ্ছিল মুসা, হাত তুলে তাকে থামাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'না না, ভয় নেই, বিপদে পড়ব না। তোমরা বাইরেই থাকবে। দরকার পড়লে সাহায্য করতে পারবে আমাকে। আর যদি ম্যাকি ধরেই ফেলে আমাকে, সোজা গিয়ে পুলিশকে জানাবে। ঠিক আছে?'

অমত করে লাভ হবে না, বুঝতে পারল সহকারীরা। একবার যখন মনস্থির করে ফেলেছে কিশোর পাশা, আর তাকে ফেরানো যাবে না। যা ভাল বুঝবে, করবেই। কাজেই অহেতুক তর্ক করল না কেউ।

ঠিক হল, সেদিন সন্ধ্যায়ই দোকানে ঢুকবে কিশোর।

আট

দোকান বন্ধ হওয়ার সামান্য আগে এগিয়ে গেল মুসা। সাবধানে উঁকি মেরে দেখে নিল, দোকানে কোন খদ্দের আছে কিনা। তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে।

কয়েক গজ দূরে একটা বিজ্ঞাপনের বোর্ডের ওপাশে লুকিয়ে বসে রইল জিনা, রবিন আর রাফিয়ান। কিশোর মুসার পেছন পেছন এসেছে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল মুসা কি করে।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ম্যাকির দিকে এগোল মুসা।

তাকে দেখে ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল লোকটার। মনে হল চিনে ফেলেছে। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে হাসল। বলল, 'গুড ইভনিং, ইয়াং ম্যান। কি লাগবে?'

মুসা বুঝল, তার ওপর থেকে নজর সরাবে না ম্যাকি। এটাই আশা করেছিল কিশোর।

'গুড ইভনিং,' ভদ্রভাবে জবাব দিল মুসা। 'আমার মা'র জন্যে একটা উপহার কিনতে এসেছি। বাহ্, বেশ চমৎকার ফুল তো। দেখতে পারি?' হাত তুলে ফুলের তোড়াটা দেখাল সে।

দেয়ালের তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিছু ফুলের তোড়া। সেদিকে এগোল ম্যাকি। এইই সুযোগ, জানালা দিয়ে দেখে বুঝল কিশোর। চট করে ঢুকে পড়ল সে। মাথা নিচু করে শো-কেসের আড়ালে আড়ালে চলে গেল আরেকটা দরজার দিকে। সেটা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। ম্যাকির নজর মুসার দিকে। ফলে সে তাকে দেখতে পেল না।

ঘরটায় ঢুকে চারদিকে চোখ বোলাল কিশোর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুকানোর একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। মুসা ওদিকে নিশ্চয় ফুল দরাদরি করছে, সময় দেবে কিশোরকে, কিন্তু কতটা আর দিতে পারবে।

ঘরটা বেশ বড়। বাঁয়ের দেয়ালের কাছে বিশাল একটা আলমারি। আর পেছনের দেয়ালের কাছে একটা ডিভান। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। ডান পাশের দেয়ালের কাছে···'গুড!' আনমনে বিড়বিড় করল সে, 'ওয়ারড্রোবটা বেশ বড়। লুকানো যাবে।'

কোটস্ট্যাণ্ড থেকে ঝুলছে ম্যাকির কোট। তারমানে আপাতত আর ওয়ারড্রোব খুলবে না সে। ভেতরে দেখে আরও নিশ্চিত হল কিশোর। শুধু একটা রেইনকোট, আর কিছু নেই। ওটার জন্যে খুলবে না ম্যাকি। ভেতরে ঢুকে দরজা টেনে দিল সে, তবে সামান্য ফাঁক রাখল বাতাস চলাচলের জন্যে। এখন শুধু অপেক্ষা।

খানিক পরে মুসার কথা থেকেই বোঝা গেল ফুল কিনে, দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। দরজার ছিটকানি আটকানোর শব্দ কানে এল। তারমানে বন্ধ হয়ে গেল দোকান। দরজা লাগিয়ে ভেতরের ঘরে এসে ঢুকল ম্যাকি। দরজার ফাঁক দিয়ে কিশোর দেখল, আলমারির কাছে গেল লোকটা, খুলল, একটা বড় খাতা বের করল।

ওটা ওর অ্যাকাউন্ট বুক, বুঝতে পারল কিশোর।

আলমারির খোলা ফেলে রেখেই দোকানে গিয়ে ঢুকল আবার ম্যাকি। পরপর তিনদিন তার দোকানের ওপর চোখ রেখেছে গোয়েন্দারা, লোকটা এখন কি করছে বুঝতে অসুবিধে হল না কিশোরের। দোকানের ডেস্কে বসে দিনের বেচা-কেনার হিসেব করছে ম্যাকি। বাইরে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেই এখন যে কেউ তার কাজ দেখতে পাবে। দোকান বন্ধ করে যখন একবারে বেরিয়ে যায়, তখন লাগায় পুরানো ধাঁচের জানালার ধাতব পাল্লা।

'লোকটা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে খোঁজা আরম্ভ করব,' ভাবল কিশোর। আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আরেকটা কথা জাগল মনে। যদি তালা লাগিয়ে দিয়ে যায় ম্যাকি? ওটার ভেতরে আর তখন দেখতে পারবে না সে। তবে কি এখনই···

ঝুঁকিটা নিল কিশোর। হাতুড়ি পিটতে শুরু করল যেন বুকের ভেতর। আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওয়ারড্রোব থেকে। কান খাড়া রেখে পা টিপে টিপে এগোল আলমারির দিকে। কাছে এসে ভেতরে তাকাল। ছোট-বড় নানারকম বাক্স, গাদা গাদা খাম···আর কোণের দিকে ফ্যাকাসে নীল একটা বাক্স, হারটা যেটায় ছিল ওরকমই দেখতে। হাত বাড়াল কিশোর···

ঠিক এই সময় মচমচ করে উঠল চেয়ার। নিশ্চয় ম্যাকির। বোধহয় উঠে দাঁড়িয়েছে সে, ফিরে আসছে। তিন লাফে আবার ওয়ারড্রোবের কাছে চলে এল কিশোর। সে ঢুকে পড়ার সাথে সাথে ম্যাকিও ঢুকল ঘরে। আলমারিতে খাতাটা রেখে, ওটার দরজা খোলা রেখেই আবার চলে গেল দোকানে। জানালা লাগানোর শব্দ কানে এল।

লাগাতে বেশিক্ষণ লাগবে না। আবার আলমারির ভেতরটা দেখার সুযোগ চলে গেল। বেরোনোর সাহস করল না আর সে।

বেরোলে ভুলই করত, বুঝল খানিক পরেই। জানালা লাগিয়ে ফিরে এল ম্যাকি। ওয়ারড্রোবের দরজার ফাঁক দিয়ে কিশোর দেখল, আবার আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা।

এইবার নিশ্চয় বন্ধ করে ফেলবে, ভাবল কিশোর।

না, বন্ধ করল না। বরং ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল নীল বাক্সটা।

হাতে নিয়ে তাকিয়ে রইল একমুহূর্ত। তারপর খুলে বের করল গোলাপী মুক্তোটা। আঙুল বুলিয়ে দেখতে লাগল। যেন কিছুতেই চোখ সরাতে পারছে না ওটার ওপর থেকে।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। ঝট করে সেদিকে ফিরল ম্যাকি। তারপর তাড়াতাড়ি আবার হারটা বাক্সে ভরে আলমারিতে রেখে লাগিয়ে দিল দরজা। কিট করে তালা লেগে গেল।

'গেল!' ভাবল কিশোর। হারটা দেখলাম। জানি এখন কোথায় আছে, কিন্তু চেষ্টা করেও হাত লাগাতে পারব না!'

শুনতে পেল ম্যাকির কণ্ঠ, টেলিফোনে কথা বলছে, 'হ্যালো, হেইকি? কি ব্যাপার? এই অসময়ে?...হ্যাঁ হ্যাঁ, বন্ধ করে দিয়েছি।...উচিত হল না। দোকানে কাস্টোমার থাকতে পারত এখন। তাহলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হত না? যাকগে, ভবিষ্যতে আর এভাবে ফোন করবেন না। যখন করতে বলব তখন করবেন। চালে সামান্য ভুল হলেই সব শেষ...কি বললেন?...না না, নিশ্চয়ই না। তবে সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।...আরে বাবা, এত দামি একটা জিনিস, পেয়েছি কিনা জানার জন্যে উদ্বিগ্ন তো হবেনই। সবাই হবে। তাই বলে হুঁশিয়ার থাকতে হবে না? যা-ই হোক, এভাবে আর ফোন করবেন না। আপনার বন্ধুদেরকেও মানা করে দেবেন।'

নীরবে কিছুক্ষণ ওপাশের কথা শুনল ম্যাকি, তারপর আবার বলল, 'শুনুন, আগেও বলেছি, আবার বলছি, মুক্তার নতুন চালান এল কিনা জানতে চাইলে সোজা চলে আসবেন। জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বললেই তো হয়ে যায়। ফোন করাটা সব সময়ই বিপজ্জনক। আপনিও তা বোঝেন, বার বার বলে দিতে হয় কেন? তো রাখি এখন। গুডবাই।'

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হল।

ওয়ারড্রোবের ভেতর দম বন্ধ করে বসে রইল কিশোর। বুঝতে পেরেছে, কতটা ভয়ঙ্কর লোকের ঘরে এসে ঢুকেছে। লোকটা শুধু ওই একটাই নয়, আরও অনেক মুক্তা চুরি করেছে। চোরাই মুক্তার ব্যবসা করে। ওরকম পেশাদার একজন লোক অবশ্যই বিপজ্জনক।

ফিরে এল ম্যাকি। আবার খুলল আলমারি। আরেকবার বাক্স খুলে মুক্তাটা বের করে দেখল। তারপর রেখে দিয়ে দরজা লাগাল। এলোমেলো করে দিল তালার কম্বিনেশন নাম্বারগুলো।

ফাঁক দিয়ে দেখছে কিশোর, ওভারকোট পরল লোকটা। যাক, বেরোলে বাঁচা যায়। সে-ও বেরোতে পারবে। বাইরে নিশ্চয় অস্থির হয়ে উঠেছে তার বন্ধুরা।

বেরিয়ে গেল ম্যাকি। দোকানের সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে এল কিশোর। এগোল ডিভানটার দিকে। তার জানা আছে, ওটার পেছনে নিচে নামার সিঁড়ি আছে, ওই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া যাবে মাটির নিচের ঘরে। ওখানে দোকানের স্টোররুম, মাল জমিয়ে রাখা হয়। বেশ কায়দা করে এই খবরটা জেনে নিয়েছে রবিন।

ঢুকেছে যখন সবকিছুই দেখে নিতে চায় কিশোর। সুযোগ সব সময় আসে না। বলা যায় না কখন কোন তথ্যটা কাজে লেগে যাবে। সেলারের দেয়ালের ওপরে একটা ছোট জানালা, আলো আসছে ওটা দিয়ে। ওখানে পৌঁছতে পারলে ওটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে সে। জিনিসপত্রগুলো দেখল সে। সাধারণ জিনিস, দোকানে যা বেচাকেনা হয়। বিশেষ কিছু দেখার নেই। একটা পুরানো টেবিল টেনে এনে জানালার নিচে রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না। বেরোতে খুব একটা কষ্ট হল না।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে বন্ধুরা।

'এসেছ!' বলে উঠল মুসা। 'আমরা তো ভাবছিলাম আটকাই পড়লে নাকি। তা কি দেখলে?'

'চল, হাঁটতে হাঁটতে বলছি। ট্রেন ধরতে হবে,' কিশোর বলল।

'বলেছিলাম না!' সব শুনে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিনা, 'ব্যাটা একটা আস্ত শয়তান! আর কোন্ বেআইনী ব্যবসা করে কে জানে!'

'বন্ধ করতে হবে এসব,' রবিন বলল।

'সহজ হবে না,' মুসা বলল।

'না, তা হবে না,' একমত হল কিশোর। 'তবে অসম্ভবও নয়। ভাগ্যিস আমি থাকতে থাকতেই ফোনটা বেজেছিল। নইলে কিছু জানতেই পারতাম না। মূল্যবান একটা সূত্র পেয়েছি।'

'কী?' জানতে চাইল মুসা।

'মাল এল কিনা জানার জন্যে দোকানের জানালায় এসে দাঁড়াবে হেইকি বা তার কোন সহকারী। চোখ রাখব আমরা। কে আসে দেখতে পারব। দলবলসুদ্ধ ম্যাকিকে ধরার ব্যবস্থা করা যাবে তখন।'

'গুড আইডিয়া,' তুড়ি বাজাল জিনা।

'হুফ!' করে রাফিয়ানও যেন একমত হল।

পরদিন সকালে আবার বেরোল ওরা। এলাকাটায় সেদিন লোকের বেশ ভিড়। ব্যস্ত হয়ে লোকজন বড়দিনের উপহার কিনছে। এতে সুবিধে হল গোয়েন্দাদের। ওদের ওপর চোখ পড়বে না সহজে ম্যাকির। দোকানের ওপর চোখ রাখল ওরা।

তার পরদিন রোববার। সম্মেলন বন্ধ। কিন্তু ঘরে বসে রইলেন না মিস্টার পারকার, স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন এক বন্ধুর বাড়িতে। সুবিধেই হল গোয়েন্দা-দের। দুপুরে খাবার পর বেরিয়ে পড়ল ওরাও।

'চল, চিড়িয়াখানা দেখতে যাই,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'শুনেছি, এখানকার চিড়িয়াখানাটা নাকি বেশ বড়।'

সুতরাং চিড়িয়াখানায় চলল ওরা। আর যা ভাবতেও পারেনি তা-ই ঘটে গেল। জন্তুজানোয়ার দেখছে আর ঘুরছে ওরা, হঠাৎ মুসার চোখে পড়ল খোয়া বিছানো একটা পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট ম্যাকি। জাপানী একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। খানিক পরে পকেট থেকে একটা বাক্স বের করে লোকটার হাতে দিল সে।

'হারের বাক্সটাই দিল মনে হয়,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর।

'এক কাজ করলে হয়,' রবিন বলল। 'আলাদা আলাদা হয়ে দু'জনেরই পিছু নিতে পারি আমরা। কোথায় যায় দেখতে পারি।'

কিন্তু কাছেই যে একটা শিম্পাঞ্জী রয়েছে, গোল বাধাবে ওটা, ভাবতে পারেনি সে। রাফি চলে গেছে ওটার খাঁচার কাছে। বেশ কিছুক্ষণ থেকেই তক্কে তক্কে ছিল বানরটা, পেয়ে গেল সুযোগ। চোখের পলকে দোলনা থেকে নেমে এসে শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে চেপে ধরল রাফিয়ানের লেজ। মারল হ্যাঁচকা টান। ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কুকুরটা।

বেশ কিছু ছেলেমেয়ে কাণ্ড দেখে দৌড়ে এল। হাসতে শুরু করল অনেকে। তাদের ওপর ভীষণ রেগে গেল জিনা। দৌড়ে এল চিড়িয়াখানার একজন লোক, অনেক চেষ্টা করে শিম্পাঞ্জীর হাত থেকে রাফির লেজ ছাড়াল।

এই গোলমালের মাঝে ম্যাকি আর তার সঙ্গীর কথা ভুলেই গেল গোয়েন্দারা। আবার যখন মনে পড়ল, ফিরে তাকিয়ে দেখে দু'জনেই চলে গেছে।

'গেল সর্বনাশ হয়ে!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'আবার নতুন কোন বুদ্ধি বের করতে হবে আমাদের।'

'কি মনে হয়?' রবিন বলল কিশোরকে, 'ওই বাক্সে হারটা ছিল?'

'কি জানি! ভালমত দেখিনি বাক্সটা,' জবাব দিল কিশোর। 'বোধহয় রোববারেই মাল ডেলিভারি দেয় ম্যাকি।'

জিনা কোন কথা বলছে না। গম্ভীর হয়ে বসে রাফিয়ানের লেজের পরিচর্যা করছে, আর মাঝেমাঝে জ্বলন্ত চোখে তাকাচ্ছে শিম্পাঞ্জীটার দিকে।

পরদিন আবার ম্যাকির দোকানে চোখ রাখার জন্যে গেল ওরা।

জানালার কাছে চলে গেল কিশোর। একটু পরেই ফিরে এল উত্তেজিত হয়ে।

'কি দেখলাম জানো?'

'কী!' প্রায় একসাথে জানতে চাইল অন্য তিনজন।

'নতুন বাক্স এসেছে অনেকগুলো, দেখে এলাম,' কিশোর জানাল। 'অদ্ভুত বাক্সের ওপরে আস্ত ঝিনুক বসানো।'

'তাই নাকি!' বুঝে ফেলেছে রবিন।

'খাইছে! কিছুই তো বুঝলাম না,' মুসা বলল। 'ঝিনুকের বাক্স দেখে এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'ওরকম স্যুভনির আজকাল আর লোকে তেমন কেনে না। তাহলে এত মাল এনেছে কেন ম্যাকি?'

'হয়ত কম দামে পেয়েছে কোথাও,' রবিন বলল। 'নিলামে-টিলামে এনেছে। এই দেখ, দেখ!'

সবাই দেখল, হালকা-পাতলা ছোটখাট একজন মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ম্যাকির দোকানের দিকে।

'জাপানী!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। বিনকিউলার নিয়ে এসেছে আজ সাথে করে। সেটা চোখে লাগিয়ে তাকাল জানালার দিকে। লোকটা দোকানে ঢুকল। কয়েক মিনিট পরেই বলে উঠল মুসা, 'এই, ঝিনুকের একটা বাক্স নিয়ে যাচ্ছে ম্যাকি!'

আরও কয়েক মিনিট পর দোকান থেকে বেরিয়ে এল জাপানী। হাতে সেই বাক্স।

ভ্রূকুটি করল কিশোর। আনমনে বলল, 'ভালই চালাচ্ছে ম্যাকি।'

'কি করব?' অধৈর্য হয়ে বলল মুসা। 'পিছু নেব লোকটার? বাক্সটা কেড়ে নেব? যদি সত্যি সত্যি ও অপরাধী না হয়ে থাকে?'

'দোকানের ওপর চোখ রাখব আমরা,' কিশোর বলল, 'যেমন রাখছি।'

সুতরাং চোখ রাখল ওরা। অনেককে দোকানে ঢুকতে দেখল। বেরিয়ে এল হাতে কোন না কোন জিনিস নিয়ে। নিশ্চয় বড়দিনের উপহার। ওদের মধ্যে তিনজনের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হল। দু'জন জাপানী, একজন ইউরোপিয়ান। তিনজনেই ঝিনুকের বাক্স কিনেছে।

'এতে কিন্তু কিছু প্রমাণ হয় না,' জিনা বলল।

'না, তা হয় না,' স্বীকার করল কিশোর।

'তাহলে প্রমাণ জোগাড় করি, চল।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন রাখল রবিন।

তিনজনেই তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের মুখের দিকে।

বার কয়েক ঘনঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর বলল, 'রবিন, এবার তুমি যাবে।'

'আমি?'

'হ্যাঁ আমার বিশ্বাস, তোমার ওপরই নজর কম দিয়েছে ম্যাকি।' বলতে বলতে সাথে করে আনা ঝোলায় হাত ঢোকাল কিশোর। বের করল একটা কালো পরচুলা। 'এটা পরে নাও, ভাল হবে। আমাদের শোবার ঘরের তাকে পেয়েছি। আরও আছে কয়েকটা। আর এই সানগ্লাসটা পরে নাও,' বলে নিজের চোখেরটা খুলে দিল সে। 'অন্য চেহারা হয়ে যাবে তোমার। চিনতে পারবে না ম্যাকি।'

'বেশ,' উইগ পরতে পরতে রবিন বলল, 'গেলাম। কি করতে হবে আমাকে?'

'সাধারণ কাস্টোমারের মত গিয়ে ঢুকে ঝিনুকের বাক্স দেখিয়ে বলবে, ওরকম একটা কিনতে চাও।'

'তাতে কি হবে?'

'ম্যাকির প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারবে। হয়ত খুশি হয়েই বিক্রি করবে...'

'তাহলে সেটা খুশির ব্যাপার হবে না আমাদের জন্যে,' হেসে বলল রবিন।

'বিক্রি করতে রাজি না-ও হতে পারে। তাহলে আমরা বুঝব ঠিক পথেই এগোচ্ছি। যাও, আর দেরি কোরো না। বিক্রি করুক আর না করুক, বিপদে পড়বে বলে মনে হয় না।'

পরচুলা আর সানগ্লাস পরে অন্য মানুষ হয়ে গেল রবিন। এগিয়ে চলল দোকানের দিকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করল এক মুহূর্ত, তারপর আস্তে ঠেলে ফাঁক করল পাল্লা। ম্যাকি একা। খরিদ্দার ঢুকছে দেখে বিগলিত উজ্জ্বল হাসি হাসল। 'এসো এসো। তা, কি চাই?'

রবিন বুঝল, তাকে চেনেনি ম্যাকি। বলল, 'একটা স্যুভনির চাই।' জানালার দিকে তাকাল। বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে পছন্দ করার ভান করল। 'বাহ্, দারুণ তো! নিশ্চয় ওগুলোতে কড়ি আছে? খুব ভাল হবে।'

'সরি, ওগুলো বিক্রির জন্যে নয়,' দ্রুত বলল ম্যাকি। 'এমনি সাজিয়ে রেখেছি, দোকানের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যে।...এই যে দেখ, চমৎকার সব জিনিস আছে...'

'কিন্তু আমি তো এসব চাই না,' হতাশ হয়েছে যেন রবিন। 'কড়িগুলো কি সত্যি বেচবেন না?'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ম্যাকি।

নিরাশ ভঙ্গিতে অন্যান্য জিনিসের দিকে তাকাতে লাগল রবিন। শেষে, আর কিছুই পছন্দ হয়নি বলে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। পেছন পেছন এল ম্যাকি। যত তাড়াতাড়ি পারে রবিনকে বের করে দিয়ে হাঁপ ছাড়তে চায় যেন।

সরাসরি সাইনবোর্ডের দিকে না এগোনোর মত বুদ্ধি আছে রবিনের। বলা যায় না, পেছন থেকে তাকিয়ে থাকতে পারে ম্যাকি। উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল সে। গোটা দুই ব্লক ঘুরে আরেক দিক দিয়ে ফিরে এল সাইনবোর্ডের কাছে।

'সত্যিই বেচল না তাহলে!' সব শুনে বলে উঠল মুসা।

'ঠিকই সন্দেহ করেছি,' কিশোর বলল। 'চল, জলদি বাড়ি চল। সময় নষ্ট করা যাবে না। আরেকটা উইংগ দরকার। ফিরে আসতে আসতে বাকি বাক্সগুলো বিক্রি না করে ফেললেই হয়।'

ফেরার পথে তার পরিকল্পনার কথা জানাল কিশোর। 'ছদ্মবেশ নিয়ে আমিও যাব ঝিনুকের বাক্স কিনতে। দেখি কি বলে!'

নয়

'আমার বোনের জন্যে, বুঝেছেন,' বলল আমেরিকান কিশোরের ছদ্মবেশধারী কিশোর। 'ছোট বোনের জন্যে কিনতে চাই। ভাল কি আছে আপনার দোকানে?' জানালার দিকে তাকাল সে। আর মাত্র দুটো বাক্স অবশিষ্ট রয়েছে।

'অনেক কিছুই আছে, ইয়াং ম্যান,' হেসে বলল ম্যাকি। কিশোরের লম্বা লালচে চুলের দিকে তাকাল। 'এই যে দেখ, কত জিনিস···'

'আমি ওই কড়ি কিনতে চাই,' হাত তুলে বাক্স দেখাল কিশোর।

'সরি,' মাথা নাড়ল ম্যাকি, 'ওগুলো বিক্রির জন্যে নয়।'

হতাশ হল কিশোর। 'তাই নাকি? আহ্-হা···'

তার কথায় বাধা পড়ল। দোকানে ঢুকল একজন লোক। পকেট থেকে বের করল একটা খাম, বেশ পুরু। অনুমান করতে পারল কিশোর, কি আছে ওর মধ্যে। টাকা! নোটের বাণ্ডিল।

খাম দেখে চমকে গেল ম্যাকি, কিশোরের চোখ এড়াল না সেটা। বলল, 'আমি ওই কড়ির বাক্সই চাই, অন্য কিছু না।' চোখের কোণ দিয়ে দেখল, ভুরু কুঁচকে গেছে আগন্তুকের।

বিশেষ ধরনের খামে টাকা নিয়ে যারা ঢোকে, তাদেরকে ঝিনুকের বাক্স দিয়ে দেয় ম্যাকি, বুঝতে পারল কিশোর। ওই খামই হল সঙ্কেত।

অনেক চাপাচাপি করল কিশোর, কিন্তু কিছুতেই তার কাছে বাক্স বিক্রি করতে রাজি হল না ম্যাকি।

অবশেষে পুরানো আমলের ছোট একটা পেপারওয়েইট কিনে বেরিয়ে এল কিশোর। কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকাল। দেখল, জানালার কাছের দুটো বাক্সের

একটা নেই। মুচকি হাসল সে। চলার গতি বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে সেই লোকটা, হাতে বাক্স। আর কোন সন্দেহ রইল না, চোরাই মুক্তোর ব্যবসা করে ম্যাকি।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে বন্ধুরা। তাদেরকে সব জানাল কিশোর।

আবার বাড়ি ফিরল ওরা। রাফিয়ানকে নিয়ে চলাফেরা বড় মুশকিল, বাসে ট্রেনে যেখানেই উঠুক, ঝুড়িতে ভরে নিতে হয়। এই বয়ে নেয়া আর ভাল লাগছে না তিন গোয়েন্দার। জিনাকে বোঝাতে অবশ্য কষ্ট হল, তবে শেষ পর্যন্ত বুঝল সে।

বাড়িতে আটকে থাকতে মোটেও ভাল লাগল না কুকুরটার। ঘাউ ঘাউ করে, আরও নানারকম বিচিত্র শব্দ করে সেটা জানান দিল রাফি, কিন্তু তার অনুনয় কানে তুলল না কিশোর।

বাড়ির কাছেই একটা বাজার। সেখানে পুরানো মাল বিক্রি হয় এরকম কয়েকটা দোকান দেখে গেছে কিশোর। তারই একটাতে ঢুকল ওরা।

'ওই দেখ,' হাত তুলে দেখাল রবিন, ম্যাকির দোকানে যেরকম দেখে এসেছে ওরকম বাক্স। 'ওরকম জিনিসই তো চাও?'

'হ্যাঁ।'

বাক্সটা কিনে নিল কিশোর। তারপর ট্যাক্সিতে করে চলে এল আবার মিমোসা অ্যাভেন্যুতে। ম্যাকির দোকানের জানালায় দেখা গেল, আরেকটা বাক্স তখনও রয়েছে।

রবিন, মুসা আর জিনাকে সাইনবোর্ডের কাছে থাকতে বলে, বাক্সটা ঝোলায় ভরে দোকানের দিকে এগোল কিশোর। যেভাবেই হোক, দেখতেই হবে, ঝিনুকের বাক্সের ভেতরে সত্যি সত্যি মুক্তো আছে কিনা।

কিশোর দোকানে ঢুকে দেখল, দু'জন মহিলা জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ম্যাকি ওদের নিয়ে ব্যস্ত। 'আমেরিকান ছেলেটাকে' দোকানে ঢুকতে দেখল সে, কিন্তু একবার চেয়েই আবার ফিরল মহিলাদের দিকে। ছেলেটাকে বিশেষ পাত্তা দিল না।

কিশোরও এটাই চায়। কয়েকটা পুতুল দেখতে দেখতে সরে যেতে লাগল জানালার কাছে। সুযোগের অপেক্ষায় রইল। কয়েকটা স্যুভনির পছন্দ করল দুই মহিলা। টাকা বের করে দিল। দাম রেখে বাকি টাকা ফেরত দেয়ার জন্যে ক্যাশবাক্সের ওপর ঝুঁকেছে ম্যাকি, এই সময় চট করে ঝোলা থেকে বাক্স বের করে ঝিনুকের বাক্সের সঙ্গে বদল করে ফেলল কিশোর। দ্রুত সরে এল জানালার কাছ থেকে। একটা পুতুল তুলে নিয়ে এগিয়ে এল কাউন্টারের দিকে। দাম মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

'সেরে ফেলেছি!' তুড়ি বাজিয়ে হেসে বন্ধুদেরকে জানাল কিশোর।
'চল, ভাগি,' মুসা বলল।
'না। শেষ বাক্সটা কার কাছে বিক্রি করে দেখব। দোকানে বাক্স খোলে না ক্রেতা। কারণ, জানাই আছে ভেতরে কি আছে।'
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না ওদেরকে। একটা লোক ঢুকল দোকানে। বেরিয়ে এল ঝিনুকের শেষ বাক্সটা অর্থাৎ কিশোর যেটা রেখে এসেছে সেটা নিয়ে।
'এক কাজ করলে তো পারি,' হঠাৎ বলল রবিন, 'ওর পিছু নিই না কেন? দেখি না কোথায় যায়? একটা চোরের বাসা তো অন্তত চেনা থাকবে। পুলিশকে বলতে পারব।'
'ঠিক বলেছ,' সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'চল।'
বেশ দূরে থেকে লোকটাকে অনুসরণ করে চলল ওরা। কিছুক্ষণ পর মোড় নিয়ে কতগুলো দোকানের দিকে এগোল লোকটা। শহরের সব চেয়ে বড় অলঙ্কারের দোকানগুলো রয়েছে ওখানে। তারই একটাতে গিয়ে ঢুকল সে।
তাড়াতাড়ি দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। লোকটা কোন কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায়নি, সোজা ঢুকে গেল একটা দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরে। ভাবসাবে মনে হল এই দোকানের মালিকই সে।
'হুঁ, বুঝলাম!' মাথা দোলাল কিশোর। 'বেআইনী ভাবে মুক্তা আমদানি করে ম্যাকি। সেগুলো বিক্রি করে তারই মত ব্যবসায়ীর কাছে। এভাবে দেদার টাকা কামায় ওরা।'
'শয়তানটার মুখোশ খোলার সময় হয়েছে, নাকি?' মুসা বলল। 'পুলিশকে এখন বলা যায়। প্রমাণ তো আমাদের সাথেই আছে, তোমার ঝোলায়।'
'চল, আগে বাড়ি যাই,' কিশোর বলল। 'বাড়ি গিয়েই খুলব বাক্সটা।'
বন্ধুদের ফিরতে দেখে খুব খুশি হল রাফিয়ান। আনন্দে চেঁচাতে শুরু করল। তিড়িং তিড়িং করে লাফ দিল কয়েকটা। ছুটে আসতে চাইল ওদের কাছে, কিন্তু শেকল ছিঁড়তে পারল না। তাড়াতাড়ি গিয়ে খুলে দিল জিনা।
কেরিআন্টি ফিরে এসেছেন। রান্নাঘরে ব্যস্ত। খাবারের ডাক পড়তে দেরি আছে।
কিশোররা যে ঘরে থাকে, সেঘরে চলে এল সবাই, রাফি সহ। বাক্সটা ঝোলা থেকে বের করে টেবিলে রাখল কিশোর। সবাই তাকিয়ে আছে ওটার দিকে। ডালা খুলতে এগোল না কেউ, অথচ ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে প্রত্যেকে।

'আল্লাহই জানে কি আছে!' মুসা বলল।
'আছে হয়ত সাত রাজার ধন!' বলল রবিন।
'জিনা, খোল,' কিশোর বলল।
এগিয়ে গেল জিনা। কাঁপা কাঁপা হাতে তুলল বাক্সটা। ঝাঁকুনি দিল। ঝনঝন করে উঠল ভেতরে।
'খোল! খুলে দেখ।'
ডালা তুলেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল জিনা। সবাই ঘিরে এল তাকে। 'হুফ!' করে উঠল রাফিয়ান, এতক্ষণ পর এসেও তার দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না, এটা পছন্দ হচ্ছে না তার।
অনেকগুলো ঝিনুক রয়েছে বাক্সে। তাড়াতাড়ি ওগুলো খুলে দেখতে শুরু করল ওরা। শেষ ঝিনুকটাও খোলা হল। কিন্তু একটা মুক্তাও পাওয়া গেল না কোনটার ভেতরে।
তাহলে কি ভুল করলাম?—ভাবছে কিশোর। বিশ্বাস করতে পারছে না। 'না,' মনের কথাটাই মুখে বলল সে, 'ভুল করতে পারি না! নিশ্চয় মুক্তা আছে!'
জিনার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে নিল রবিন। ভেতরে আঙুল বুলিয়ে দেখল। কাগজের আচ্ছাদন, শক্ত কোন কিছু আঙুলে লাগল না।
'ফলস বটম নেই তো?' মুসা বলল।
এত জোরে গুঁতো দিল রবিন, বাক্সের তলা ফুটো হয়ে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল আঙুল।
'না, ফলস বটম নেই,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'ভুলই করলাম বোধহয় আমরা।'
'হুফ!' করে যেন সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল রাফিয়ান।
রবিনের হাত থেকে বাক্সটা নিল কিশোর। তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল ভেতরটা। বিড়বিড় করে বলল, 'ফলস বটম নেই! দেয়ালের লাইনিঙের নিচেও কিছু নেই। ডালাটায় নেই তো?'
'না, পাতলা,' মুসা বলল। 'ওর ভেতরে লুকানোর জায়গাই নেই।'
ডালার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ওপরে বসানো ছোট ঝিনুকটার ওপর দৃষ্টি স্থির। জ্বলজ্বল করছে চোখ। পকেট থেকে ছুরি বের করে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিল ডালাটা। ঝিনুকের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল চোখা ফলা। চাড় দিয়ে খুলে ফেলল ডালা দুটো।
উত্তেজিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সবাই।
বেশ কায়দা করে আঠা দিয়ে আটকানো ছিল ঝিনুকের ডালাদুটো। ভেতরে

তুলো ঠাসা। সাবধানে তুলোর দলাটা বের করে টেনে টেনে ছিঁড়ল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল চমৎকার মুক্তোটা।

হাতের তালুতে ওটা রেখে তাকিয়ে রইল কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে অন্য তিনজনও।

'খাইছে!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মুসা। 'এই তাহলে ব্যাপার! এভাবেই মুক্তা চোরাচালান করে!'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে।

জিনা আর রবিনের মুখেও হাসি।

কলরব শুরু করে দিল ওরা। পাল্লা দিয়ে ঘেউ ঘেউ জুড়ল রাফিয়ান। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হৈ-চৈ শুনে কি হয়েছে দেখতে এসেছেন জিনার বাবা। 'কি ব্যাপার? এত গোলমাল কিসের? রাস্তা থেকে চেঁচানি শোনা যাচ্ছে।'

'বাবা, বললে বিশ্বাস করবে না,' জিনা চেঁচিয়ে বলল। 'দেখ কি পেয়েছি!'

'মুক্তা!' ভুরু কুঁচকে গেল মিস্টার পারকারের। 'কোথায় পেলে?'

'অনেক লম্বা কাহিনী, বাবা।'

'বেশ, তাহলে খেতে খেতে শুনব। চল, গিয়ে দেখি, তোমার মায়ের হল কিনা।'

খেতে খেতে সমস্ত কথা শুনলেন মিস্টার এবং মিসেস পারকার। মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য করলেন কেরিআন্টি, কিন্তু জিনার বাবা একেবারে চুপচাপ রইলেন।

'কাজেই, বুঝতেই পারছ, বাবা, মুক্তা চোরের ঘাঁটি আবিষ্কার করে ফেলেছি আমরা,' জিনা বলল।

'আর মিসেস আরনিকা মেয়ারবালের হারটাও খুঁজে পেয়েছি,' মুসা বলল।

'পুলিশকে বলা যায় এবার,' বলল কিশোর।

তা-ই করা হল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাছের থানায় চললেন মিস্টার পারকার। ডিউটি অফিসারকে সব খুলে বললেন। মুহূর্ত দেরি না করে পুলিশ সুপারের বাসায় ফোন করল অফিসার। ছুটে এলেন সুপারিনটেনডেন্ট। গোড়া থেকে আরেক দফা মুক্তা-চোরের গল্প শোনানো হল তাঁকে।

'কাল থেকেই শুরু করব কাজ,' বললেন তিনি। 'ওয়ারেন্ট নিয়ে গিয়ে ম্যাকিকে অ্যারেস্ট করব। তারপর চাপ দিলেই সুড়সুড় করে দলের সমস্ত লোকজনের নাম বলতে দিশে পাবে না।'

ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে আবার বাড়ি ফিরে এলেন মিস্টার পারকার। সারাদিন অনেক খাটুনি গেছে, ক্লান্ত লাগছে এখন। তবু ঘুমোতে গেল না জিনা। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল পুলিশ আমাদেরকে সঙ্গে নেবে, বাবা?'

'কি জানি। মনে হয় না। পুলিশের কাজের সময় তোমাদেরকে নেবে কেন?'

'বা-রে, আমরাই করে দিলাম সব। আর আমাদেরকে নেবে না?'

'না।'

আর কিছু বলল না জিনা। ঘুমোতে চলল নিজের ঘরে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আগামী দিন যখন ম্যাকিকে গ্রেফতার করতে যাবে পুলিশ, ওরাও থাকবে তখন ওখানে। পুলিশের সঙ্গে যাবার দরকার নেই, ওরা আলাদাই যাবে।

পরদিন সকালে উঠে এ-নিয়ে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে আলোচনা হল জিনার। সবাই রাজি।

'দেখ,' জিনা বলল, 'লোকটা মহা শয়তান। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, যাবে।'

'ভাবছি, টনিকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়?' কিশোর বলল।

সবাই একমত হল এ-ব্যাপারে।

টনিকে ফোন করা হল। সংক্ষেপে জানানো হল সব কথা। সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। বলল, বাবার গাড়ি নিয়ে চলে আসবে। গোয়েন্দাদের নিয়ে যাবে মিমোসা অ্যাভেন্যুতে।

একেবারে সময়মত পৌঁছল ওরা। রাস্তার পাশের দোকানগুলো সবে খুলতে আরম্ভ করেছে। সাইনবোর্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। এল পুলিশের কালো গাড়ি। গাড়ি থেকে নামল সাদা পোশাক পরা দু'জন পুলিশ। দোকানের দিকে এগোল। পুলিশের আরেকটা গাড়ি এসে দাঁড়াল প্রথম গাড়িটার কাছে।

বিড়বিড় করে বলল টনি, 'দোকান সার্চ করবে। ধরে বের করে আনবে ম্যাকিকে।'

'এখান থেকে কিছু দেখতে পাব না আমরা,' মুসা বলল। 'ভেতরে কি ঘটে দেখা দরকার।'

'কিন্তু আমাদেরকে কি কাছে যেতে দেবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'এসো আমার সঙ্গে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

গাড়ির দরজায় তালা লাগাল টনি। তারপর দ্রুত রওনা হল কিশোরদের পেছনে।

'দোকানের পেছনের ওই যে গলিটা,' চলতে চলতে বলল কিশোর, 'প্রায় নির্জন থাকে, দেখেছি। ওখানে গিয়ে জানালা দিয়ে দোকানের সেলারে নামা যাবে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে পেছনের ঘরে ঢুকে আরামসে দেখতে পারব দোকানের ভেতরে কি হচ্ছে।'

এক এক করে জানালা দিয়ে সেলারে নেমে পড়ল ওরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবে, এই সময় কানে এল কড়া পুলিশী কণ্ঠ, 'জলদি আলমারি খোল! ভেতরে কি আছে দেখব!'

মিনমিন করে কি বলতে যেয়ে আবার ধমক খেল ম্যাকি।

আলমারি খোলার শব্দ হল। মিনিটখানেক পর বলে উঠল আরেকজন পুলিশ, 'এই তো! মিসেস মেয়ারবালের নেকলেস!'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। তাকাল সঙ্গীদের মুখের দিকে। প্রমাণ পেয়ে গেছে পুলিশ। বমাল ধরেছে ম্যাকিকে।

'ব্যাটার খেল খতম,' হাসতে হাসতে মুসা বলল। 'আর শয়তানী করতে পারবে না।'

যেপথে ঢুকেছিল সেপথেই আবার বেরিয়ে এল ওরা। ভাবতেই পারেনি, বাইরে কি চমক অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

গলি থেকে মিমোসা অ্যাভেন্যুতে বেরিয়েই দেখল, দোকানের দরজা দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসছে ম্যাকি। দৌড় দিল একদিকে। হাতে হাতকড়া নেই। পুলিশ নেই পেছনে। হাতে সেই নীল বাক্সটা। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, খুব একচোট ধস্তাধস্তি করে এসেছে।

'পালাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠেই পিছু নিতে গেল মুসা।

তার হাত টেনে ধরল কিশোর। 'না। ওই দেখ।'

বেরিয়ে এসেছে পুলিশ দু'জন। একজনের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। আরেকজন হাত নাড়তে নাড়তে বলল, 'ধর, ধর ব্যাটাকে!' দৌড় দিল ম্যাকির পেছনে।

ইতিমধ্যেই ক্রেতার ভিড় বেড়ে গেছে রাস্তায়। বড়দিনের উপহার কিনতে এসেছে লোকে। সেদিকে দৌড়াচ্ছে ম্যাকি, লোকের ভিড়ে মিশে যাওয়ার ইচ্ছে।

হুড়াহুড়ি করে পুলিশের গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে ইউনিফর্ম পরা পুলিশেরা।

'পালাল তো! ধর, ধর ব্যাটাকে!' চেঁচিয়ে উঠল আবার সাদা পোশাকধারী পুলিশ।

'পিস্তল ধরছে না কেন?' মুসা বলল।

'নেই হয়ত। এখানে পিস্তল-বন্দুক কমই ব্যবহার করে পুলিশ, আমেরিকার মত সব সময় পিস্তল বয়ে নিয়ে বেড়ায় না,' টনি বলল।

'রাফি!' চেঁচিয়ে বলল জিনা। 'ধর ব্যাটাকে!'

আদেশ পেয়ে মুহূর্ত দেরি করল না রাফিয়ান। ছুটল ম্যাকির পেছনে। তার পেছনে দৌড় দিল কিশোর গোয়েন্দারা।

তারপর খুব দ্রুত ঘটে গেল সমস্ত ঘটনা। লোকের কোলাহল আর পুলিশের হুইসেলে কান ঝালাপালা। বাঘের মত গিয়ে ম্যাকির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশাল কুকুরটা। কোট কামড়ে ধরে ঝুলে রইল বিচিত্র ভঙ্গিতে।

ঝাড়া দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করল ম্যাকি। পারল না। দৌড়াতেও পারল না আর। চোখের পলকে এসে তাকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। দু'দিক থেকে চেপে ধরল হাত।

হাতকড়া পড়ল রবার্ট ম্যাকির হাতে।

সেদিন বিকেলের কাগজেই একেবারে সামনের পৃষ্ঠায় ছাপা হল খবরটা। তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ানের ছবি ছাপা হল তাতে। মিসেস এরিনা কলিনস, তার মেয়ে মলি আর হারটার ছবিও ছাপা হয়েছে।

এরিনা আর মলিকে বড়দিনের দাওয়াত দিলেন কেরিআন্টি। টনিকেও। আর মাত্র একদিন দেরি আছে বড়দিনের। কয়েকদিনের জন্যে ছুটি, বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বন্ধ। কাজেই বাড়িতেই থাকছেন মিস্টার পারকার। ছেলেমেয়েরা খুব খুশি। উৎসব ভালই জমবে মনে হচ্ছে।

সত্যিই ভাল জমল।

সারাদিন জিনাদের ওখানে কাটিয়ে বিকেলে বাসায় ফিরে গেল এরিনা। তার ওখানে পরদিন বিকেলে চায়ের দাওয়াত করে গেল সবাইকে।

পরদিন বিকেলে বিশেষ কাজ পড়ে যাওয়ায় এরিনার বাসায় যেতে পারলেন না কেরিআন্টি আর জিনার বাবা। ছেলেমেয়েদেরকে পাঠিয়ে দিলেন। টনির বাড়িতে কাজ থাকায় সে-ও আসতে পারল না।

হার ফেরত পেয়ে খুব খুশি এরিনা। গতদিন থেকে কয়েকবার ধন্যবাদ দিয়ে ফেলেছে ওদেরকে। চা খেতে খেতে আবারও বলল, 'কি বলে যে তোমাদের ধন্যবাদ দেব, বুঝতে পারছি না। আমার জন্যে অনেক করেছ তোমরা, ঝুঁকি নিয়েছ। অনেক ধন্যবাদ। হারটা বিক্রি করলে অনেক টাকা পাব। টাকার জন্যে আর ভাবতে হবে না কখনও আমাকে। কি বাঁচা যে বেঁচেছি বলে বোঝাতে পারব না তোমাদেরকে।'

ম্যাকির সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছে এরিনা, তবু আরও কিছু জানা বাকি। পুলিশের কাছে যা যা শুনে এসেছে ছেলেময়েরা, চা আর চমৎকার নাস্তা খেতে খেতে সেগুলোই বলল।

'সব স্বীকার করেছে ম্যাকি,' কিশোর বলল। 'যারা যারা জড়িত আছে এই মুক্তা চোরাচালানের সঙ্গে, বলে দিয়েছে। ওদের বেশির ভাগই এখন হাজতে।

জাপান থেকে বেআইনী ভাবে ওই মুক্তা আমদানি করা হত। এতে মধ্যস্থতা করত ম্যাকি।'

'লোক খারাপ,' জিনা বলল। 'কাজেই হারটার কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারেনি। চুরি করতে উঠেপড়ে লেগেছিল।'

'জানল কিভাবে হারটার কথা?' কাপে আরও চা ঢেলে দিল এরিনা। চকোলেট কেকের প্লেটটা ঠেলে দিল। সবাইকে সাধাসাধি করল আরও নেয়ার জন্যে।

'ম্যাকির দাদী ছিলেন মিসেস মেয়ারবালের বান্ধবী,' রবিন জানাল। 'দাদীর মৃত্যুর পর তাঁর ডেস্কের ড্রয়ার ঘাঁটতে গিয়ে কতগুলো চিঠি পেয়ে যায় সে। ওগুলো পড়েই জানতে পারে গোলাপী মুক্তোর কথা। কোথায় লুকিয়ে রাখেন জিনিসটা কথায় কথায় একদিন ম্যাকির দাদীকে বলেছিলেন মিসেস মেয়ারবাল। সেটা ম্যাকির দাদীর ডায়েরীতে লেখা ছিল। চোরের ভয় বরাবরই ছিল মিসেস মেয়ারবালের, সে-কারণেই ওরকম একটা জায়গায় হারটা লুকাতেন। প্রায় সারাদিনই ওটার ওপর বসে থাকতেন তিনি, রাতে টাব চেয়ারটা থাকত তাঁর বেডরুমে।'

'কিন্তু আমার কথা জানল কিভাবে ম্যাকি?' এরিনা জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের পিছু নিয়েছিল,' বলল মুসা। কেকের গোটা চারেক টুকরো শেষ করে আরও চারটে তুলে নিল নিজের প্লেটে। 'আরও হুঁশিয়ার থাকা উচিত ছিল আমাদের।'

'হুফ!' করে মাথা দোলাল রাফিয়ান, যেন মুসার সঙ্গে একমত। আসলে কেক চাইছে সে।

দুটো টুকরো তাকে দিল এরিনা। হেসে মাথা চাপড়ে দিয়ে বলল, 'আসল কাজটা তুইই করেছিস, রাফি। চোরটাকে পাকড়েছিস।'

'তোমার কুকুরটা খুব ভাল, জিনা,' রাফিয়ানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল মলি। 'এরকম একটা কুকুর যদি আমার থাকত! মা, দেবে কিনে একটা?'

'দেব।'

'হুফ! হুফ!' বলল রাফিয়ান। যেন বোঝাতে চাইল, খুব ভাল হবে তাহলে মেয়েটাকে আর একা থাকতে হবে না।

তার মাথা দোলানোর ধরন দেখে না হেসে পারল না কেউ।

—০—